শোণিত উপাখ্যান

সৈয়দ অনির্বাণ

শোণিত উপাখ্যান

সৈয়দ অনির্বাণ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং

সত্ত্ব

লেখক

প্রকাশক

নাফিসা বেগম

আদী প্রকাশন

৩৫ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

ফোনঃ ০১৭১১ ৮৪৮৫৮৩

www.adeeprokashon.org
nafisa@adeeprokashon.org

অনলাইন পরিবেশকঃ www.rokomari.com/adee

প্রচ্ছদঃ নাজিম উদ দৌলা

প্রিন্টার্স

অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস

৩০/১/ক, হেমন্ত দাশ রোড, ঢাকা।

মূল্যঃ ২০০ টাকা

ISBN13: 9789849132882

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই গল্পের মাঝে বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। এটি একটি ফ্যান্টাসি কাহিনী। এখানে ব্যবহৃত সকল চরিত্র এবং ঘটনা কাল্পনিক। যেসব ঐতিহাসিক রেফারেন্স টানা হয়েছে তার কিয়দংশ সত্যি হলেও বেশির ভাগই কল্পনা প্রসূত। পাঠকের প্রতি আমার অনুরোধ, এই বইয়ের ঘটনাবলিকে ফ্যান্টাসি হিসেবেই দেখবেন, ইতিহাসের যে পরিবর্তিত রূপ এখানে লেখা হয়েছে তা কাউকে হেও প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নয়, বরং সম্পূর্ণ ভাবে কাহিনী তৈরির স্বার্থে – বিনোদনের জন্য। তবে যেসব জায়গায় ফ্যান্টাসি আসেনি সেখানে আমি চেষ্টা করেছি তথ্যের নির্ভুল ব্যবহার নিশ্চিত করতে। তবু যদি কোন ভুল পান, ধরিয়ে দিলে খুশি হবো।

"আরবান ফ্যান্টাসি" বেশ নতুন একটি ঘরনা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সাহিত্যে বেশ সাড়া জাগাচ্ছে এই ঘরনার বই পুস্তক। আমার কাছে বেশ লাগে আরবান ফ্যান্টাসি। তাই ভেবেছিলাম বাংলায় লেখার চেষ্টা নেব। কিন্তু শুরু করার পর বুঝতে পারলাম কত কঠিন একটা কাজে হাত দিয়েছি।

যেহেতু বাংলায় আগে এই ঘরনার সাহিত্য চর্চা হয়নি (আমার জানামতে) তাই হার্ডকোর থাকা সম্ভব হলো না। অনেক পট পরিবর্তন করে অবশেষে একটা কাঠামো দাঁড়া করালাম যেটা হয়ত বা গ্রহণযোগ্য হবে। শুরুতে ছিল শুধুই আরবান ফ্যান্টাসি কিন্তু পরে তার সাথে যোগ হলো ঐতিহাসিক ফ্যান্টাসি। এবং স্বাভাবিক ভাবেই থ্রিল ও হরর। এই খণ্ডে অবশ্য ঐতিহাসিক তেমন কিছু নেই। কিন্তু পুরো কাহিনীটা উপরোক্ত চার ঘরানায় পড়বে।

"শোণিত উপাখ্যান – বর্তমান"। নামটা একটু গুরুগম্ভীর হয়ে গেল কি? যাই হোক – এই উপন্যাসে যে কাহিনী বর্ণনা করে হয়েছে তার পটভূমি বর্তমান কাল, তাই এমন নাম। পরবর্তী খণ্ডে অতীতের কাহিনী উঠে আসবে।

বইটা লিখে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি, পাঠক পড়ে যদি তার ভগ্নাংশও পান তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক ধরে নেব।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এটি আমার প্রথম বই। প্রায় খেয়ালের বসে যে লেখা শুরু করেছিলাম তা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, বড়ই আনন্দদায়ক ব্যাপার।

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ'কে ধন্যবাদ আদী প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্য।

সাজিদ রহমান'কে জানাই কৃতজ্ঞতা, বইটা ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছেন বলে।

প্রচ্ছদ করার ব্যাপারে আমার কোনই দক্ষতা নেই। এই কাজটা নিজ থেকে এগিয়ে এসে করে দিয়েছেন নাজিম উদ দৌলা – তাঁর কাছে আমি ঋণী।

লেখার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে দুইজনকে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি, অনিবার্য কারণ বসত নাম উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া, প্রুফ দেখতে সাহায্য করেছেন সৌরভ রায়। তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গল্পের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সাহায্য করেছেন খন্দকার এ.এ. নোমান শুভ্র, মোঃ তানভীর মৌসুম, মাহজাবিন ফারহানা মুনা, ফরহাদ আহমেদ নিলয়, তায়িবা তাবাস্সুম সেঁজুতি এবং আরও অনেকে। যাদের নাম বাদ পড়েছে, প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আসলে সবার নাম দেয়া তো আর সম্ভব না তাই হয়ত যাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বেশি তাদের কথাই চলে এসেছে। ত্রুটিটা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন আশা করি।

উৎসর্গঃ

আমার চরম খামখেয়ালীপনায় আহত হয়েও
যারা সর্বদা আমাকে মমতা দিয়ে আগলে রেখেছে,
সেই বাবা ও মাকে।

এক

কাঁদছে প্রকৃতি। সারাটা দিন ধরে অঝোরে ঝরছে তো ঝরেই চলেছে বৃষ্টি, কখনো মুষলধারায় আবার কখনো বা টিপ টিপ করে – কিন্তু থামা থামি নেই। অবশ্য কাঠফাটা গরমের পর আষাঢ়ের শুরুতে এই বৃষ্টি বেশ কাঙ্ক্ষিতই ছিল। একে উপভোগও করা যেত, যদি জলাবদ্ধতার ফলে রাস্তাগুলো কাঁদার সমুদ্রে পরিণত না হতো।

স্বাভাবিক হিসেবে রাস্তা মেরামতের জন্যে উপযুক্ত সময় হচ্ছে শীতকাল – কারণ তখন আবহাওয়া থাকে শুষ্ক, কাদাপানির ঝক্কি নেই আর শীতের সময় পরিশ্রমের কাজ করতেও সুবিধে হবার কথা, গ্রীষ্মের তাপদাহের মাঝে বা বর্ষায় ভিজতে ভিজতে কেই বা খাটতে চায়? কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে প্রতি বছরই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির জন্যে এই অনুপযোগী সময়টাই বেছে নেয়া হয়। কে জানে, হয়ত তাতে করে সরকারের বড় কর্তাদের পকেট ভারী করতে সুবিধা হয়ে থাকে!

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, রাত এগারোটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট। একে বৃষ্টি তায় এত রাত হয়ে যাওয়াতে রাস্তায় ভিড় তেমন নেই, অবশ্য কিছুক্ষন পর আবার ট্রাক চলাচল শুরু হলে ভিড় বাড়বে। গাড়িটা পুরানো হলেও দামী, ১৯৯২ মডেলের টয়োটা মার্ক টু। অলস ভঙ্গিতে ড্রাইভিং হুইলের পিছনে বসে আছে রাশেদুন। কাদাপানির মাঝে জোরে চালানোর উপায় নেই, কোথায় ম্যানহোল আছে, কোনখানে ভাঙ্গা - কে বলতে পারে? তাই ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে সে। এখন যে রাস্তায় আছে সেটার অবস্থা তাও ভাল, কিন্তু এরপর যেটাতে উঠতে হবে ওটার কথা চিন্তা করেই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেলো তার।

ওর গন্তব্য মোহাম্মদপুরের একটি আবাসিক এলাকা – তবে প্রকল্পের ঠিক ভেতরে নয়, বরং পেছনে। ওই দিকের রাস্তাগুলোতে এখনো পিচ ঢালাই করা হয়নি, মাটির ওপর ইট বিছানো পথে এই বৃষ্টির মাঝে গাড়ি চালানোর ঝক্কি যে পোহিয়েছে সেই জানে।

হাই তুলতে তুলতে আনমনে একবার রিয়ার ভিউ মিররের দিকে চাইলো রাশেদুন। পর মুহূর্তে ভীষণ ভাবে চমকে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল, হাতের ধাক্কায় পই করে ঘুরে গেলো স্টিয়ারিং – আর একটু হলেই ফুটপাথে উঠে যেত গাড়িটা। ভাগ্যিস রাস্তায় ভিড় নেই, নাহলে নির্ঘাত একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেত। নিজের উপর প্রচন্ড জোর খাটিয়ে সামলে নিল রাশেদুন, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কশে দাঁড় করাল গাড়িটা। কোমর সোজা করে বসল, বার দুই চোখের পাতা খুলে আর বন্ধ করে নিল, নিচের দিকে নজর রেখে। তারপর বড় করে দম নিয়ে শ্বাস আটকে আবার তাকাল আয়নাটার দিকে।

নাহ! এখন আর দেখা যাচ্ছে না ওটা! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, কয়েক মুহূর্ত আগে ওখানে কি দেখেছে মনে পড়তেই আবার থরথর করে কেঁপে উঠল ওর সর্বাঙ্গ। এই নিয়ে তৃতীয় বার দেখলো সে ওটাকে, এবং প্রত্যেকবারই আগের থেকে আরও বেশি জান্তব, আরও বেশি ভীতিকর রূপে দেখা দিয়েছে জিনিষটা।

চেষ্টা করেও গায়ের কাঁপুনি পুরোপুরি থামাতে পারলো না সে। এই অবস্থায় যে গাড়ি চালানো চলে না তা বেশ বুঝতে পারছে। ভয়টা কাটছে না মন থেকে, বরং উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কাঁপুনি। যা থাকে কপালে ভেবে গ্যাস পেডাল জোরে চেপে ধরল ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসায় পৌঁছতে পারাটাই এখন একমাত্র লক্ষ্য।

মনে মনে দোয়া-দুরুদ যা জানে পড়তে পড়তে কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে ছোটাল ও গাড়িটাকে। কপাল গুনেই বলতে হবে, কোন গর্তে পড়ল না চাকা। কয়েক মিনিটের মাঝে মেইন রাস্তা এবং হাউজিং প্রকল্পের সরু গলি উপগলি পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলো সে। ততক্ষণে ভয়টা তো কমেনিই বরং অনেক বেড়েছে।

আসলে এর ধরনটাই এমন, প্রথমবার যখন দেখেছিল জিনিসটাকে, তাৎক্ষনিক ভাবে ভয় পাওয়ার থেকে অবাক বেশি হয়েছিল রাশেদুন। কয়েক বার চোখ পিট পিট করার পর যখন দেখেছিল আয়না আবার স্বাভাবিক তখন ভেবেছিল হয়ত চোখের ভুল। আমল দেয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সুস্থির হয়ে বসার কয়েক মিনিটের মাথায় হঠাৎ একটা সর্বগ্রাসী ভয় ধাক্কা মারে ওকে। প্রচন্ড ছিল তার তীব্রতা, এতটাই যে হড়হড় করে বমি করে ফেলেছিল সেবার। পরে পুরো চারদিন ভুগেছিল জ্বরে।

দ্বিতীয়বার যখন দেখে তখন প্রথমবারের থেকে অনেক বেশি রোমহর্ষক ছিল দৃশ্যটা; রিয়ার ভিউ মিররের বুকে সে যেন এক জান্তব বিভীষিকা! আগের বারের অভিজ্ঞতা থাকায় প্রাথমিক ধাক্কাটা অবশ্য কম খেয়েছিল, কিন্তু তবু ওইদিন গাড়ির নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটা লেগুনার সাথে সঙ্ঘর্ষ ঘটে যায়। মাথায় চোট পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও। তিনদিন অজ্ঞান ছিল, যমে মানুষে টানাটানি চলেছে। তবে একদিক থেকে বেঁচে গিয়েছিল – বোধ না থাকায়, ভয়ের পরবর্তী রেশটা সেবার তেমন অনুভব করেনি।

কিন্তু আজকে? রাশেদুন ভীতু নয়, বরং সাহসী বলে বেশ নাম ডাক আছে ওর। কিন্তু যত বড় বুকের পাটাই হোক না কেন, ওই দৃশ্য দেখার পর নিজেকে কোনমতেই ধরে রাখা সম্বব হচ্ছে না ওর পক্ষে।

অপ্রকৃতিস্থের মত কোনরকমে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাশেদুন। মাথা কাজ করছে না ওর, চোখ লাল হয়ে গেছে, কশ বেয়ে গড়াচ্ছে লালা, প্রচন্ড ভয়ে দিশেহারা অবস্থা। একটা চিন্তাই ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে – ওকে বাসায় ঢুকতে হবে। বাসায় ওর ভাই শাহেদুন আছে, তার কাছে গেলে পর আর ভয় নেই। আসলে যেকোন ধরণের ভীতি প্রকট আকার ধারন করে একা থাকলে। কারো সান্যিধ্যে এলে সাহস পাওয়া যায়।

এতই তাড়াহুড়ো করছে যে ইগনিশন থেকে চাবি খুলতে বা দরজা লক করতেও ভুলে গেলো রাশেদুন। হাচড়ে পাচড়ে কোনমতে গেটের সামনে গিয়ে পাল্লায় ঠেলা দিলো ও। বন্ধ!

নিশ্চই দেরী দেখে শাহেদুন ভেবেছে যে আজ আর ফিরবে না ও; আর তাই গেট লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে রাশেদুনের জন্যে এর চেয়ে খারাপ কিছু আর হতে পারত না। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে ওর, বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ভয়টা যেন আরও জেঁকে বসেছে।

ফোন করে যে গেট খুলতে বলবে সে উপায়ও নেই, চার্জ শেষ হয়ে গেছে মোবাইলের। ডাকাডাকি করে শাহেদুনকে জাগিয়ে গেট খোলানো সময় সাপেক্ষ কাজ, এখন সেই অবস্থা নেই রাশেদুনের। মরিয়া হয়ে গেট টপকানোর সিদ্ধান্ত নিলো সে, গেটের মাথায় কাঁটাতার আছে কিন্তু অতো কিছু ভাবতে গেলো না। হাচড়ে পাচড়ে উঠে গেলো গেট বেয়ে, অনুভবই করল না যে বেশ কিছু কাপড় আর ছাল চামড়া হারিয়েছে। লাফ দিয়ে অন্য পাশে নেমেই দে দৌড়!

কিভাবে যে তিনতলায় ওদের দু'ভাইয়ের ঘরে এসে ঢুকেছে বলতে পারবে না রাশেদুন। পেছনে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। ঘর অন্ধকার, স্বাভাবিক ভাবে তাই হবার কথা – শাহেদুন নিশ্চই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ওর উত্তেজিত এবং ভীত মস্তিষ্ক একটা বড় অস্বাভাবিকত্ব ধরতে পারল না। ঘরের দরজাটা খোলা ছিল!

"শাহেদ!" কাঁপা গলায় ডাকলো রাশেদুন। উত্তর নেই। "এই শাহেদ, ওঠ!" কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ বোর্ডের দিকে এগোল রাশেদুন। ওর সর্বাঙ্গ ঝরা পাতার মত কাঁপছে, প্রচন্ড মানসিক চাপ আর নিতে পারছে না। খুঁজে পেতে লাইটের সুইচ টিপে দিল ও, কিন্তু আলো জ্বলল না – লোড শেডিং!

চাপা স্বরে একটা গাল বকলো সে, আরও একবার ডাকলো শাহেদুনের নাম ধরে – উত্তর নেই। হাত বাড়ালো ওয়ার্ড্রোবের ওপর, ওখানে দিয়াশলাই থাকে। হাতে ঠেকল প্যাকেট, ত্রস্ত হাতে একটা কাঠি বের করে নিল সে। ধরানোর ঠিক আগ মুহূর্তে কেমন একটা ক্ষীণ হুটোপুটির মত শুনতে পেল। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি যেন বলতে চাইল ওকে, সাবধান করতে চাইল কি? আমল দিল না রাশেদুন, ওর মন জুড়ে এখনো গাড়িতে রিয়ার ভিউ মিররে দেখা সেই বিভীষিকা!

ম্যাচটা জ্বালল ও, ক্ষীণ আলোয় আঁধার কেটে গিয়ে একটা আবছায়া তৈরি হলো; আর তারপরই ওর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! ভয়ঙ্কর একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন, যেন ভীষণ রাগে ফুসছে কোন হিংস্র শ্বাপদ! তারপর ঝুপ করে কিছু একটা পতনের শব্দ। তারপর শুধুই অন্ধকার!

দুই

শুক্রবার, সকাল আটটা। আজ ডিউটি হবার কথা ছিল সন্ধ্যা ছ'টা থেকে, পাক্কা দশ ঘন্টা আগে জরুরী তলব পড়ায় যারপরনাই বিরক্ত বোধ করছে কায়েস। সন্ধ্যায় ডিউটি বলে আগের রাতে অনেক দেরীতে বিছানায় গিয়েছিল ও, প্রায় ভোর হয় হয় তখন। খাটে পিঠ লাগানোর পর খুব বেশি হলে আড়াই কি তিন ঘন্টা কেটেছে, তার পরই ফোন। ইচ্ছা করছিল লাইন কেটে সেট বন্ধ করে আবার ঘুমে তলিয়ে যেতে, কিন্তু এটা বিশেষ নাম্বার – অফিসের জরুরী তলব, চব্বিশ ঘন্টার যেকোন সময় ডাক পড়তে পারে, যেতেই হবে। পুলিশে চাকরি করা এই এক ঝকমারি! আর কায়েসের মত স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের ঝামেলা বোধহয় একটু বেশি, নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নয় বরং এক এক দিন এক এক জায়গায় হাজির থাকতে হয়।

মোহাম্মদপুর থানার ওসির সামনে বসে বিরস বদনে এই সব সাত পাঁচই ভাবছিল কায়েস। ওসি সাহেবের ডাকে চটকা ভাঙ্গল ওর, "কি হে কায়েস মিয়া! মুখটাকে বাংলার পাঁচের মত করে রেখেছ কেন শুনি? দেখে তো মনে হচ্ছে সকালে বাথরুম হয়নি ঠিক মত!" নিজের সস্তা রসিকতায় নিজেই ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠলেন ওসি রবিউল আলম।

"আসলেই হয়নি!" কায়েসের কাটা জবাব। "কি করে হবে? হবার সময় দিলে তো হবে? আমি থাকি মগবাজার, সাড়ে সাতটার সময় ফোন করে বললেন আটটার মধ্যে রিপোর্ট কর, এক মিনিট যেন লেট না হয়।"

"সাতটা পঞ্চাশ!"

মুখ বাকাল কায়েস, "ওই হলো! আমি তখন ছিলাম বিছানায় – উঠে, রেডি হয়ে, তারপর এতটা পথ আসা। বাথরুমে যাবার সময় পেয়েছি মনে করেন?"

"তার মানে মুখ টুখ না ধুয়েই?"

"বাজে কথা রাখুন, কি জন্য ডেকেছেন তাই বলুন – আশা করি আপনার ফালতু ভাঁড়ামি জাতিয় কোন ব্যাপারে ডাকেননি, কারণ যদি তাই করে থাকেন তাহলে আমি কায়েসও শোধ তুলব বলে রাখছি।" সুপেরিয়র অফিসারের মুখের উপর ঘোষণা করে দিল কায়েস।

"আরে রোসো, মেজাজটা এত চড়া থাকলে উপায় আছে?" বললেন রবিউল। তাঁর আর কায়েসের সম্পর্কটা বেশ কাছের, তাই নিজেদের ভেতর কথা বলার সময় ফর্মালিটি তেমন মানা হয়না। "আসলে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।" হাত বাড়িয়ে একটা বেল বাজালেন তিনি। প্রায় সাথে সাথেই পাশের ঘর থেকে এসে হাজির হলো বেয়ারা গোছের একজন কন্সটেবল।

"এই নুরুদ্দিন, দেখত রিপোর্টটা রেডি হয়েছে কিনা? আর আমাদের কফি দাও – কায়েসেরটা দুধ চিনি ছাড়া।"

"তা ব্যাপারটা কি?" প্রশ্ন করল কায়েস।

“রিপোর্টে বিস্তারিত পাবে, তবে ওটা আসতে আসতে আমি সংক্ষেপে বলছি।” সামনে ঝুঁকে এলেন রবিউল, তাঁর চেহারা থেকে আমুদে ভঙ্গিটা বিদায় নিয়েছে। “ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে একলোক একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে, ১৯৯২ মডেলের ঝরঝরে একটা টয়োটা মার্ক টু।” গাল চুলকালেন ওসি সাহেব, গলা খাঁকারি দিলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, “তার দাবি অনুযায়ী গাড়িটাকে সে বাশবাড়ির চাঁন মিয়া হাউজিং এর পেছনে একটা পুরানো ধাঁচের বাড়ির সামনে পেয়েছে। দরজা খোলা অবস্থাতে, চাবি নাকি ইগনিশনেই ছিল।”

“স্ট্রেঞ্জ!” মৃদু গলায় বলল কায়েস।

“তবে আর বলছি কি!” সায় দিলেন রবিউল, “তা গাড়িটা সে থানায়, মানে এখানে নিয়ে আসে এই ভেবে যে না হলে চুরি হয়ে যেতে পারে। নিজেই ড্রাইভ করে এনেছে।”

“ঠিকই করেছে, লোকটা সৎ বলতে হবে, সাধারণ কেউ হলে থানায় না এসে সোজা ধোলাই খালে বা জিঞ্জিরায় চলে যেত!” মন্তব্য করল কায়েস।

“তা তো বটেই, তবে ঘটনা হল, আমি তখন ডিউটিতে ছিলাম না। যে এসআই ছিল ওর মাথাটা একটু মোটা, ব্যাটা ওই লোককে কিছু জিজ্ঞেস করেনি, এমনকি ঠিকানাও রাখেনি, শুধু নাম এন্ট্রি করে গাড়ি জমা নিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।”

“বুঝলাম, কিন্তু তার সাথে আমাকে তলব করার যোগাযোগটা কোথায়?” হাই তুলতে তুলতে প্রশ্ন করল কায়েস।

“আরে পুরোটা শুনবে তো আগে!” মৃদু তিরস্কার করলেন ওসি সাহেব, “আমি ডিউটিতে আসি ছ’টার সময়, এসেই এই কাহিনী শুনে ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখতে লোক পাঠালাম। জায়গাটা মনে হয় কিছুদিন আগেও শহরের বাইরে ছিল, কাঁচা রাস্তা। যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল ওটা খুঁজে পেতে অবশ্য সমস্যা হয়নি, ওইদিকে পুরানো বাড়ি ওই একটাই আছে।”

“তারপর?”

“হুম, যা বলছিলাম। বাড়িটার কাছে একটা চায়ের টং দোকান আছে, গেট থেকে গজ পঞ্চাশেক সামনে। ওইখানে জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে ওই বাড়িটার মালিক একজন ডাক্তার – ডাক্তার সোবাহান। তবে কয়েক মাস হলো ডাক্তার সাহেব ওখানে আর থাকেন না, ভাড়াও দেননি। শুধু গাড়িটা রাখেন আর তাঁর ড্রাইভার ও ড্রাইভারের ভাই থাকে।”

“ছোট বাড়ি নাকি?”

“না সেটাই তো আজব, বিশাল বাড়ি – হিউজ!” বললেন রবিউল। “বাড়িটার সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। শেষে যেই এসআইকে পাঠিয়েছিলাম সে ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয়। কাজটা অবশ্য মোটেও সহজ হয়নি, কারণ বাড়িটা ঘিরে আছে ছ’ফুটি একটা পাঁচিল, ওপরে আবার কাঁটাতার দেয়া।”

আগ্রহ বোধকরে সামনে ঝুঁকে এল কায়েস, দেখে ঠোঁটের কোনে হাসলেন ওসি সাহেব।
"গেটটাও কাঁটাতার দ্বারা সুরক্ষিত। অনেক ঝক্কি ঝামেলা করে এক কন্সটেবল কে ওপাশে পাঠানো যায়। সে গিয়ে গেট খুলে দেয়ার পর ভেতরে ঢুকে এসআই।"
"ভেতরে বেশ কিছুটা খালি জায়গা, তারপর তিনতলা একটা বিল্ডিং। অবাক ব্যাপার হলো বিল্ডিঙয়ের গেট খোলাই ছিল। ওরা ভেতরে তো ঢোকে, কিন্তু ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। সবগুলো ঘরই তালা বদ্ধ। যা হোক, খুঁজতে খুঁজতে তিন তলায় উঠে একটা ঘরের দরজা পায় ওরা, যেটাতে তালা নেই।"
চুপ করে গেলেন ওসি সাহেব।
"কি ব্যাপার?" বিরক্ত হয়ে কর্কশ গলায় আপত্তি জানাল কায়েস, "আপনি পুলিশ অফিসার না নাটকের বিবেক? খালি ঝুলিয়ে রাখেন কেন?"
"আরে একটানা এত কথা বলা সহজ ব্যাপার নাকি?" সামনে রাখা কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন রবিউল (এর মাঝে এক ফাঁকে বেয়ারা গোছের কন্সটেবলটি কফি দিয়ে গেছে আর বলেছে রিপোর্ট তৈরি হতে আরও খানিকক্ষণ লাগবে)।
অধৈর্য ভঙ্গিতে শ্রাগ করে নিজের কাপটা টেনে নিল কায়েস।
"তিন তলার ঘরটায় তালা না থাকলেও, ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।" কথার খেই ধরলেন ওসি সাহেব, "তবে দরজাটা ঘুনে খাওয়া ছিল বলে বুটের দুই লাথিতেই ভেঙ্গে পড়ে।" কফিতে চুমুক দিতে থামলেন তিনি।
"ভেতরে কি ছিল?" অসহিষ্ণু কণ্ঠ কায়েসের।
"ভেতরে যা ছিল তার জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি বাছা!" হঠাৎ করে গম্ভির হয়ে গেলো ওসি সাহেবের গলা। "ভেতরে দু'টো দেহ পাওয়া গেছে – প্রথমে মনে হয়েছিল দু'টোই মৃত কিন্তু পরে দেখা যায় একটা মৃত অন্যটা অজ্ঞান!"
"একটা মৃত আর অন্যটা অজ্ঞান?" পুনরাবৃত্তি করল কায়েস, "তা যেটা অজ্ঞান ছিল তার জ্ঞান কি ফিরেছে?"
"না," একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রবিউল, "হাসপাতালে নেয়া হয়েছে, খুব সম্ভব কোমায় চলে গেছে বেচারা।"
"তাহলে আর আমাকে ডাকার কি দরকার ছিল?" নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কায়েস, "আমার যে কাজ তার জন্যে তো জ্ঞান থাকা লাগবে।"
বাস্তবিকই তাই, ইন্সপেক্টর কায়েস হায়দারের যে কারণে নাম ডাক তা প্রয়োগ করার জন্যে জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়। কায়েস জেরা করার ব্যাপারে দক্ষ, এই কাজে ওর খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তি তুল্য। বস্তুত এই বিশেষ দক্ষতার বলেই আজও চাকরিতে টিকে আছে ও, নয়ত ওভার অল তার রেকর্ড খুব একটা সুবিধের নয়। কিন্তু ইন্টেরোগেশনের বেলায় কায়েসের ধারে কাছে লাগে এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার।

রিমান্ডে নিয়েও যে সব কেস মচকানো যায় না, কায়েসের হাতে পড়লে আধ ঘন্টার ভেতর তাদের পেট থেকেও সুড়সুড় করে সব কথা বের হয়ে আসে। অথচ সহজে গায়ে হাত দেয় না বলে সুনাম আছে কায়েসের। কিন্তু অজ্ঞান লোককে কথা বলানোর বিদ্যা এমনকি কায়েসেরও জানা নেই।

একটু কাচুমাচু মার্কা একটা চেহারা করলেন ওসি রবিউল আলম, "না ঠিক তা না।" বললেন তিনি।

"তা না মানে?" ভ্রু কুঁচকালো কায়েস, "তাহলে কাকে জেরা করতে বলেন? যে লোক গাড়িটা নিয়ে এসেছে তাকে? কিন্তু আপনিই না বললেন ওর ঠিকানা রাখা হয়নি। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত একটা চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আমাকে দরকার পড়ল? কারণ আর কারো কথা তো বললেন না।"

"না আসলে জিজ্ঞাসাবাদ আপাতত না," মিন মিন করে বললেন রবিউল, "ইয়ে মানে আমি আসলে পুরো কেসটা তোমার এক্তিয়ারে দিতে চাচ্ছি!"

"কী!" চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল কায়েস, "রবিউল ভাই! আপনার মাথা ঠিক আছে তো? এমনিতেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের কাজ আর চারদিন ডেস্ক ডিউটি দিতে গিয়ে দম ফেলবার সময় পাচ্ছি না, তার উপর আপনি এই রকম প্যাঁচালো একটা কেস – ভাব দেখে যেটা হোমিসাইড বলে মনে হচ্ছে, সেটা আমার কাঁধে চাপানোর তাল করছেন?"

"আচ্ছা যাও," হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে শরীরের দু'পাশে দু'হাত ঝুলিয়ে দিলেন রবিউল, "তুমি যদি কেসটা নাও তাহলে যতদিন এই কেস নিয়ে থাকবে ততদিন ডেস্কে বসা লাগবে না, মানে আমার এইখানে আর কি।"

এবার সত্যিই অবাক হলো কায়েস, "আপনার এখানে আমি সপ্তাহে দু'দিন বসি, সেটা বাদ দিয়ে দিতে পারব শুধু কেসটা নিলে?" বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল ও, "এর মধ্যে আরও কোন ঘটনা আছে রবিউল ভাই, ঝেড়ে কাশুন তো দেখি!"

"কাশাকাশির কিছু নাইরে ভাই," ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন রবিউল, "আসলে ব্যাপার হলো, রুমের দরজা ভাঙ্গার পর ভিতরের দৃশ্য দেখে এসআই আর কন্সটেবলের যে অবস্থা হয়েছে তা শুনেই আমার আর ওই সিনটায় যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

"কেন?"

"অত্যন্ত ভায়োলেন্ট সিন, কন্সটেবল তো দেখে মুর্ছাই গেছিল আর এসআই বেচারা বমি করতে করতে শেষ! আমি পারতপক্ষে এই সিন নিয়ে তদন্ত করতে চাই না, আর আমার আন্ডারে তুমি ছাড়া যোগ্য অন্য কেউ নেই এই মুহূর্তে। নিজের এলাকায় অন্য কোন ব্র্যাঞ্চ বা র‍্যাবের থেকে হেল্প নিতেও চাচ্ছি না। ব্যাপারটা রাজনৈতিক মনে হবার এখনো কোন কারণ নেই, তাই আমাদের হাতেই সম্ভবত ইনভেস্টিগেশনের চার্জ থাকবে। আমাদের এখানে এক মাত্র তুমিই আছ যার নার্ভ ওই রকম একটা ক্রাইম সিন নিয়ে তদন্ত করার মত শক্ত।"

“হাহ!” মুখ ভেংচাল কায়েস, “আপনার আসলে পুলিশ না হয়ে কোন ভন্ড পিরের খাদেম হওয়া উচিৎ ছিল, রবিউল ভাই! কি সুন্দর ধানাইপানাই করে আমাকে বলির পাঠা বানালেন! তা কি এমন ভায়োলেন্ট সিন, বলেন দেখি?”

এই সময় পর্দা সরিয়ে এক জুনিয়র অফিসার রুমে প্রবেশ করল, “স্যার, এই নিন রিপোর্ট।” টেবিলে ওসি সাহেবের সামনে একটা লাল ফাইল রাখল সে। কায়েস লক্ষ্য করল যে তরুণটির মুখটা বেশ ফ্যাকাশে এবং অসুস্থ দেখাচ্ছে।

ওসি সাহেব ফাইলটা খুললেন না, ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন কায়েসের দিকে, “নাও পড়ে দেখ – ফোটো সহ ডিটেইলস আছে এখানে। তারপর সিনটা সরেজমিনেও একটু দেখে এস, কিছুক্ষণ পর ফরেনসিক টীম যাবে ওদের সাথেও যেতে পার।”

ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কায়েস, “ঠিক আছে, রবিউল ভাই। তবে আমি কিন্তু তাহলে সন্ধ্যায় আর ডিউটিতে আসছি না, কেমন?” ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে রুম থেকে বের হয়ে গেল ও; পেছনে সাবধানে একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন ওসি রবিউল আলম।

তিন

ওসি রবিউল আলমের রুম থেকে বের হয়ে পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট একটা কামরায় গেল কায়েস। বাসা থেকে ইউনিফর্ম পরে বের হলেও দরকারি টুকিটাকি কিছু জিনিষ যেমন নেম-ট্যাগ, অফিসিয়াল নোটবুক, ইত্যাদি ওর অফিসের লকারেই রাখা অভ্যাস। তাছাড়া মার্ডারের ক্রাইম সিনে যেতে হলে সাথে একটা সার্ভিস ফায়ার আর্ম রাখা জরুরি মনে করে সে। অবশ্য ডিউটিতে থাকাকালীন পারতপক্ষে অস্ত্র হাত ছাড়া করে না কায়েস। অনেক সময় ওপরঅলার কাছে ধরনা পর্যন্ত দিয়ে থাকে অনুমতির জন্যে, আপাত শীতল চরিত্রের অধিকারী কায়েসের এই একটা বিষয়ে রয়েছে বিশেষ দুর্বলতা। ব্যাপারটা প্রায় অবসেশনের পর্যায়ে পড়ে। সত্যি বলতে কি, ওর পুলিশে চাকরি নেয়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ, অস্ত্র নাড়াচাড়া করার বেলায় কিছুটা স্বাধীনতা আছে এ পেশায়।

ওর জন্যে ইস্যু করা ব্রাউনিং হাই পাওয়ার নাইন মিলিমিটারটাকে কোমরের ডান পাশে হোলস্টারে ঢুকিয়ে নিলো কায়েস, বাটটা রইলো সামনের দিকে। পিস্তল রাখার এই কায়দাটি ক্যাভালরি ড্র বা টুইস্ট ড্র পজিশন নামে পরিচিত। আপাত দৃষ্টিতে কিছুটা অদ্ভুত মনে হলেও অনুশীলন করে এই পজিশন থেকে অতি ক্ষিপ্রগতিতে পিস্তল বের করা সম্ভব।

এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটে গাদা পিস্তলের যুগে, তখনকার দিনে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান অস্ত্র ছিল সেবার (এক জাতীয় তলোয়ার); পিস্তল ছিল একটা সেকেন্ডারী হাতিয়ার। পিস্তলটা এমন ভাবে ঝোলানো হতো যাতে করে ডান হাতের পাশাপাশি প্রয়োজনে বাম হাতেও পিস্তলটা বের করা যায়, কেননা প্রায় সময়ই ডান হাত ব্যস্ত থাকত তলোয়ার নিয়ে। অশ্বারোহী বাহিনীকে ইংরেজিতে ক্যাভালরি বলা হয়, তার থেকেই এসেছে ক্যাভালরি ড্র নামটা। অন্যদিকে এই ভঙ্গিতে পিস্তল বের করতে গেলে হাতকে ঘোরাতে বা টুইস্ট করতে হয় বলে এটা টুইস্ট ড্র নামেও পরিচিত।

পরবর্তীতে পিস্তলবাজির স্বর্ণযুগে পশ্চিমের অনেক নাম করা গানম্যান এই কায়দায় পিস্তল বহন করেছে, যাদের মধ্যে রয়েছে কিংবদন্তীর পিস্তলবাজ জেমস বাটলার হিকক ওরফে ওয়াইল্ড বিল হিকক।

বর্তমান যুগে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা বেশিরভাগ সময় পিস্তল বহনের জন্যে বহুল প্রচলিত ক্রস ড্র (কিছুটা তির্যক ভঙ্গিতে কোমরের সামনের দিকে হোলস্টার রাখা, যাতে করে পিস্তল বের করার সময় শরীরের যে পাশে অস্ত্রটি রয়েছে তার অপর হাত ব্যবহার করে বের করতে হয়) পজিশনটাই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কায়েসের মতে নাজুক পরিস্থিতিতে যেকোনো হাতেই অস্ত্র বের করার জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিৎ; আর তাই স্পাই বা কমান্ডোদের মাঝে জনপ্রিয় এই ক্যাভালরি ড্রয়ের কায়দাতেই সব সময় পিস্তল ঝোলায় ও।

পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে ফাইলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো কায়েস, গেটে সেন্ট্রিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলো ফরেনসিক টীমের গাড়িটা কোথায় আছে। তারপর এগিয়ে গিয়ে যোগ দিল তাদের সাথে।

ফরেনসিক টীমের দায়িত্বে রয়েছে আসাদ নামের নতুন একজন তরুণ অফিসার, কায়েসের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই – দু'এক বার হাই হ্যালোর বেশি কখনো কথা হয়নি। তার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল কায়েস, তারপর গিয়ে উঠল গাড়ির ড্রাইভারের পাশের সিটে। রবিউল আলমের মত হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে কায়েসের সঙ্গে সহকর্মিদের সম্পর্ক বেশ শীতল। মোটেই মিশুক লোক নয় কায়েস - সাধারণত কথা বলে কর্কশ স্বরে, বেশীরভাগ সময়ই গম্ভীর থাকে, হাসে না বললেই চলে। তারওপর ওর দৃষ্টি বড় ঠান্ডা। কলিগরা ওকে তেমন পছন্দও করে না।

সবাই জানে যে কায়েস তার নিজের কাজে পারদর্শী, ইন্টেরোগেশনে ওর মত দক্ষতা খুব কম মানুষেরই আছে। মাথাও খুবই শার্প কায়েসের, সেই সঙ্গে রয়ছে অসাধারণ শক্ত নার্ভ আর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষনী ক্ষমতা; কিন্তু এত সব গুন থাকার পরও ওর ক্যারিয়ার রেকর্ড ভালো নয়। বরং বলা চলে বেশ খারাপ, সত্যি বলতে কি, বিশেষ কিছু কাজ ওকে ছাড়া আদায় হয় না বলে আর কিছু উঁচু স্তরের অফিসারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে বলেই এখনো একটিভ ডিউটিতে আছে ও, নাহলে অনেক আগেই সাসপেন্ড হয়ে যেত।

কাজ কর্মের ব্যাপারে কায়েস উদাসীন, নিজের পছন্দের কেস ছাড়া কাজ করতে চায় না – কোন দলবদ্ধ কাজ করার বেলায় একেবারেই যাচ্ছেতাই, পারস্পরিক সহযোগিতা যে কি জিনিষ তা বোধহয় জানেই না সে। আর ওর ব্যবহার একবারে চাঁছাছোলা, সামাজিকতার মোটেও ধার ধারে না কায়েস। অবশ্য হাতে গোনা কয়েকজন, যাদের সাথে ওর সম্পর্ক ভালো, তাদের বেলায় আবার বেশ অমায়িক, কিন্তু ব্যবহারের এই বৈষম্য গোপন করারও কোন চেষ্টা করে না সে। সব মিলে সহকর্মী মহলে কায়েসের বেশ দুর্নাম আছে, নতুন কেউ এলে তাই শুরুতেই কায়েসের ব্যাপারে নানা কথা শুনে সাবধান হয়ে যায় – ওর সাথে মেশার ব্যাপারে হিসেব করে আগায়।

আসাদও এর ব্যাতিক্রম হলো না, কায়েসের নডের জবাবে নিজেও হালকা করে মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনের সিটে উঠে পড়ল সে, তার টিমের আর দুই সদস্যও যোগ দিল তার সঙ্গে।

আপাতত ফাইলটা না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কায়েস, অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে কোন সিনের ব্যাপারে আগে থেকে খুব ডিটেইল ধারণা পেয়ে গেলে সরেজমিনে অনেক সময় খুঁটিনাটি বিষয়গুলি চোখ এড়িয়ে যায়, অবশ্য সবার বেলায় এটা ঘটে কিনা জানেনা ও, তবে ওর নিজের বেলায় যে ঘটে সে ব্যাপারে নিশ্চিত। তাই আগে সিন দেখে তারপর রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে দেখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ও।

একে শুক্রবার, তায় বৃষ্টি পড়ছে, তাই রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। থানা থেকে ঘটনাস্থল মানে বাঁশবাড়ির চাঁন মিয়া হাউজিংয়ের পেছনে পৌঁছতে তাই মিনিট কয়েকের বেশি লাগলো না, আরও কম লাগত কিন্তু রাস্তার কন্ডিশন খারাপ হওয়াতে শেষের বেশ খানিকটা পথ গাড়ি অতিশয় ধীরে চালাতে হয়েছে।

ইট বিছানো কাঁচা রাস্তার শেষ মাথায় বিশাল বাড়িটা ছাড়া আর রয়েছে একটা চায়ের দোকান, যেমনটা ওসি সাহেব বলেছিলেন। এছাড়া গলিটা শেষ হয়ে গেছে, মানে একটা অন্ধগলি আরকি।

গাড়ি থেকে নেমে বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাল কায়েস, রবিউল আলম বলেছিলেন বটে যে বিশাল বাড়ি, কিন্তু সেই বিশাল মানে যে এতটা বিশাল তা কায়েস ভাবতে পারেনি; সীমানা দেখে আন্দাজ করল দু'বিঘার মত হবে আয়তনে। ঢাকা শহরে জমির যে দাম তাতে এত বড় একটা বাড়ি এভাবে পড়ে থাকাটা মোটেও স্বাভাবিক নয়, হোক না সে যতই বেখাপ্পা লোকেশনে।

গেটের সামন দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে একবার পর্যবেক্ষন করার চেষ্টা করল কায়েস। বাড়িটা পুরানো ধাঁচের এবং বিশাল। ছ'ফুটি পাঁচিল ঘেরা, তারওপর আবার আধহাত উঁচু করে কাঁটাতার বসানো। একটাই গেট আছে ঢোকার জন্যে, এবং সেটাও ছ'ফুট উঁচু এবং কাঁটাতার দ্বারা সুরক্ষিত। ভেতরে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে অর্ধশতাব্দি পুরানো বড় একটা তিনতলা দালান। দেখে মনে হয় এটা আগে শহরের বাইরে ছিল, এখন এই হাউজিং প্রকল্পের কল্যাণে ভেতরে পড়ে গেছে। খুব সম্ভব পাকিস্তান আমলে কোন বিহারীর সম্পত্তি ছিল, স্বাধীনতার পর এরকম অনেক বাড়িরই মালিকানা বদল হয়েছে।

কায়েসের তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ল যে গেটের উপরে কাঁটাতারে আটকে আছে ছেঁড়া জিন্সের একটি টুকরো। এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বুঝল, কেউ গেট টপকাতে গিয়ে আহত হয়েছিল। তবে রক্তের কোন দাগ নেই – বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে তবে বেগ কম, ভিজতে ভিজতেই আশপাশটা ভালো করে দেখে নিল কায়েস, তবে বিশেষ কিছু ওর নজরে পড়ল না; তারপর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে।

এককালে বোধহয় সুন্দর একটা বাগান ছিল কিন্তু এখন আগাছার জঙ্গলে ভর্তি পুরো আঙিনা, তার মাঝে দিয়ে একটা পাকা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে দালানের দরজা পর্যন্ত – তারপর বামে মোড় নিয়ে একটা ছাউনিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে না পড়ায় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ভারি কাঠের সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল কায়েস।

পুরানো ধাঁচের ঘোরানো সিঁড়ি, মাঝে বড় ফাঁকা জায়গা, ওপরে ছাদ নেই - আগের দিনের বিহারীদের বাড়িগুলো এভাবেই তৈরি হতো। সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে কায়েস দেখল ফ্যাকাশে মুখ করে একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে এক সাব ইন্সপেক্টর। লোকটাকে কায়েস আগে থেকে চেনে, নাম জহিরুল হক – অল্প যে কয়েকজনের সঙ্গে কায়েসের সম্পর্ক ভালো তাদের একজন।

"কি খবর জহির?" নিচু গলায় প্রশ্ন করল কায়েস।

ম্লান হাসল জহির, "কায়েস ভাই, ভেতরে ঢুকতে সাবধান, ভয়াবহ অবস্থা দেখে সহ্য করা কঠিন।"

“বুঝতে পারছি,” সহানুভুতির ভঙ্গিতে ওর কাঁধে চাপড় দিল কায়েস, “এই জন্যেই রবিউল ভাই আমাকে পাঠিয়েছে!”

“ঠিকই করেছেন, রবি স্যার দেখলে নির্ঘাত ভিরমি খেতেন।” বলে ভেতরের দৃশ্যটা আবার কল্পনা করেই বোধহয় শিউরে উঠল জহির।

ওকে ওখানেই থাকতে বলে এগিয়ে গেলো কায়েস, কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মত পাল্টালো, বলল, “আমি ঢুকছি, তুমি নিচে গিয়ে ফরেনসিক টিমের আসাদ সাহেবকে বলো চলে আসতে। সে গাড়িতে আছে।”

জহির রওনা হয়ে যাবার পর আস্তে করে ভেজানো পাল্লা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিল কায়েস। অদ্ভুত একটা অনুভুতি, বলে ঠিক বোঝানো যাবে না, স্থিতি-বিদ্যুতের হালকা শক খেলে যেরকম লাগে অনেকটা সেরকম। কিন্তু এর মাঝে কোথায় যেন আরও গুঢ় একটা ব্যাপার আছে, অবশ করা একটা আরামদায়ক প্রবাহ, কিন্তু কি এক অদ্ভুত কারণে ঠিক সুখকর নয়। কায়েসের কাছে অনুভুতিটা নতুন না, প্রায় চার বছর আগে একবার এই একই রকম অনুভুতি হয়েছিল ওর – তবে সেবারের থেকে এবার ব্যাপারটা আরও অনেক তীব্র ভাবে অনুভব করতে পারলো ও।

চকিতে বিহ্বলের মত চারপাশে তাকালো কায়েস। স্বপ্নেও ভাবেনি এইখানে এরকম কিছু থাকবে। এই অনুভুতিটার মানে কি তার ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত নয় ও, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে যে বড় রকমের কোন কিন্তুর মুখোমুখি হয়ে পড়েছে সে।

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাড়া দিয়ে হতভম্ব ভাবটা আংশিকভাবে দূর করতে সক্ষম হলো সে, তারপর নজর দিলো ঘরটার দিকে।

রুমটা বেশ বড়। পুরানো ধাঁচের বাড়িতে যেমন হয়, উঁচু ছাদ। আসবাবপত্রগুলোও পুরানো – ভারি কাঠের তৈরি। ঘরটা বেশ অগোছালো, অবশ্য যা শুনেছে - দুইজন ব্যাচেলর থাকত এইখানে, তাতে করে গোছানো থাকার কথাও না।

আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই ঘরে। তবে একধারে একটা আধুনিক ওয়ার্ডরোব আছে, তার পাশে মাটিতে কালচে লাল দাগ - রক্ত! শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে, বেশ ভালো পরিমানেই রক্ত ঝরেছিল বোঝা যায়।

এছাড়া আর যে অস্বাভাবিক জিনিষটা রয়েছে, ওটা দেখেই পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠলো কায়েসের। শক্ত লোক বলে ওর নাম আছে, তারপরও জিনিষটার বীভৎসতা সহ্য করতে রীতিমত জোর খাটাতে হলো ওর নিজের ওপর।

খাট বা বলা ভালো পালঙ্কের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে ওটা। একটা মৃতদেহ! তবে ঠিক স্বাভাবিক নয় – বিকৃত!

চার

মানুষ চিরকালই তার দৈনন্দিন জীবনে যা অদেখা সেসব ব্যাপারে সন্দিহান। যেমন একজন মহিলার মুখে যদি দাঁড়ি থাকে তাহলে তাকে দেখে আঁতকে উঠবে না এমন লোক নেই বললেই চলে – বিষয়টি দৃশ্য হিসেবে কতটা ভয়ঙ্কর তা আপেক্ষিক, কিন্তু এর প্রকট অস্বাভাবিকতা প্রশ্নাতীত এবং যেকারো পিলে চমকে দেবার জন্যে সেটাই যথেষ্ট।

পুলিশে চাকরি করলে নিয়মিত খুন জখম নিয়ে কারবার করতে হয় – এটা পেশারই অঙ্গ। সাধারণ একটি লাশ তাই একজন পুলিশ অফিসারের কাছে বিশেষ কোন তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনা হবার কথা না। যখন একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তখন পুলিশেরই ডাক পড়ে সবার আগে। সড়ক দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, খুন এরকম নানা কেস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাই বহুবার বিভিন্ন ধরনের ডেড বডি দেখেছে কায়েস।

শক্ত নার্ভের লোক বলে খ্যাতি আছে ওর, একারণেই রবিউল নিজে না এসে ওকে দায়িত্ব দিয়েছেন কেসটা সামলানোর। এত কিছুর পরও, চোখের সামনে যা দেখলো তাতে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল ওর জন্যে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো, মনে হলো বমি হয়ে যাবে।

ঘন ঘন ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল কায়েস, প্রায় মিনিট খানেক লাগল ওর সুস্থির হতে। তারপর খানিক ইতস্তত করে এগিয়ে গেলো ও বিছানাটার কাছে।

লাশটা উপুড় হয়ে আছে – লোকটার শারীরিক গঠন জীবিত অবস্থাতে কেমন ছিল বোঝার কোন উপায় নেই। এখন যা অবশিষ্ট আছে ভাষায় সেটা বর্ণনা করা শক্ত - দুই ফুটের মত চওড়া, ছয়-সাত ইঞ্চি পুরু একটা মাংস পিন্ডের গায়ে জড়িয়ে রয়েছে কিছু ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়। মাংসের রঙ হয়ে গেছে কালচে নীল, কেমন যেন ল্যাগব্যাগে, থকথকে একটা ভাব, যেন এটা কোন মানুষের শরীর নয় বরং বিশাল আকৃতির একটা পুডিং!

হাত, পা, বুক, পিঠ আলাদা করে বোঝার কোন উপায় নেই, সব যেন একটা চামড়ার খোলসের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে! অথচ এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি, অন্তত ধড় থেকে নয়।

মাথাটা শরীরের সঙ্গেই আছে, একদিকে সামান্য কাত হয়ে এবং সম্পুর্ন অক্ষত অবস্থাতে। শুধু নাক, মুখ আর কানের ফুটো দিয়ে বের হয়ে এসেছে বেশ অনেকটা রক্ত – ওখানে কয়েকটা মাছি ভনভন করছে।

নাক মুখ কুঁচকে, ভয়ে ভয়ে, অতি সাবধানে শরীরটা ছুঁয়ে দেখল কায়েস, রিগর মর্টিসের প্রভাব পড়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না ও, কারণ যেরকম থেতলে গেছে তাতে করে শক্ত হওয়ার যো নেই। অবস্থা দেখে কায়েসের মনে হলো লোকটির শরীরের একটি হাড়ও বোধহয় আস্ত নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কায়েস। নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে মৃত্যু একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার, বিভীষিকাময় হলেও যেহেতু অবশ্যম্ভাবী তাই একে মেনে নেয়া ছাড়া গতি নেই; কিন্তু তাই বলে এই রকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু! শিউরে উঠল সে।

পিছনে শব্দ পেয়ে ঘুরলো কায়েস –ভাগ্যিসঘুরেছিল, ফরেনসিক টীমের এক তরুণ সহকারী দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। দাঁড়িয়ে আছে বটে তবে টলছে ছেলেটা – সামনের জান্তব দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না। তাড়াতড়ি ওর কাঁধ ধরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে রুমের একমাত্র টেবিলটার ওপর এক রকম জোর করেই ওকে বসিয়ে দিল কায়েস। তারপর দরজার দিকে তাকাতে দেখতে পেলো যে আসাদুর রহমান ঘরে প্রবেশ করেছে।

মৃত দেহটা দেখে ফরেনসিক অফিসার আসাদের প্রতিক্রিয়াও খুব একটা ভালো হল না। তবে নিজের অধস্তন তরুণটির মত টলে উঠল না সে। ফ্যাকাসে মুখে তাকাল কায়েসের দিকে। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "কি বুঝলেন কায়েস সাহেব?"

গাল চুলকাল কায়েস, ততক্ষণে সামলে নিয়েছে তরুণ ফরেনসিক কর্মি, ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার লাশটার কাছে এগিয়ে এলো সে। জবাব দেবার আগে আর একবার দেখে নিতে চায়। মিনিট খানেক লাশ এবং তার আশপাশ দেখে রীতিমত অবাক হলো ও, কারণ লাশ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অত্যন্ত ভারী কোন ভোঁতা অস্ত্র ব্যবহার করে করা হয়েছে খুনটা – অবশ্য আদৌ যদি ওটা খুন হয়ে থাকে। আসলে মৃতদেহটার অবস্থা এতটাই অস্বাভাবিক যে এটাকে খুন ভাবাও কিছুটা কষ্টসাধ্য। কিন্তু সে কারণে অবাক হয়নি কায়েস। ওর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষনে যা ধরা পড়েছে তা হলো, ভারি কিছু দিয়ে বার বার আঘাত করে একটা মানুষকে এই রকম থেতলানো মাংসপিন্ড বানিয়ে ফেলার তুলনায় সিনটা বড় বেশি ক্লিন।

শরীরের একটা জায়গাতেও চামড়া ফুড়ে হাড় বেরিয়ে আসেনি, এমনকি রক্ত পর্যন্ত ঝরেনি। এটা কেমন করে সম্ভব তা বলতে পারবে না কায়েস। তবে এই ব্যাপারে এখনই আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করল না ও – পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট দেখার পরেও যদি বোঝা না যায় তাহলে তখন আলাপ করে জানা যাবে আসাদের কি মত। বরং অন্য একটা ব্যাপার যা ওকে বিচলিত করে তুলেছে সেটা বলার জন্যে মুখ খুলল কায়েস, "লক্ষ্য করেছেন, এই রকম একটা অবস্থা করেছে বেচারার," তর্জনি দিয়ে মৃতদেহটাকে নির্দেশ করল সে, "কিন্তু যে করেছে সে এমনকি ঘরে ছিল কিনা তারও কোন আলামত নেই, আছে কি? আমার তো চোখে পড়ছে না।" বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আসাদের দিকে তাকাল ও।

মাথা ঝাঁকাল আসাদ, "আসলেই তাই, ওয়ার্ডরোবের কাছে মেঝেতে রক্ত আর খাটের ওপর এই জিনিষ," আড়চোখে একবার তাকিয়ে শিউরে উঠে বলল আসাদ, "তাছাড়া তো ঘরে আর কোন অস্বাভাবিকতা নেই।" একটু থেমে যোগ করল, "টেবিলের ম্যাচিং চেয়ারটা অবশ্য মিসিং কিন্তু ওটা তো জহির নিয়ে গেছে বাইরে বসে ডিউটি দেবার জন্যে।"

প্রশংসার দৃষ্টিতে আসাদের দিকে তাকাল কায়েস, লোকটার অবজার্ভেশন ভালো – নাহলে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে একটা চেয়ারের দিকে কেউ খেয়াল দেয় না। "ঠিকই ধরেছেন, এই

রকম বীভৎস একটা সিন যতটা মেসি হবার কথা এখানে পরিস্থিতি তার ধারেকাছেও যায়নি। বরং বলতে পারি বডিটার কথা বাদ দিলে এত ক্লিন মার্ডার সিন আমি আর দেখিনি।"

"আমিও না" একমত হলো আসাদ, "যদি অন্য লোকটা যে কিনা কোমায় আছে ওই ফ্লোরের রক্তের কাছে পড়ে না থাকত, তাহলে আমি মনে করতাম যে খুনটা ওখানে করে লাশটা পরে বিছানায় এনে ফেলা হয়েছে।"

"তাই?" কৌতুক মেশান তির্যক দৃষ্টিতে আসাদের দিকে তাকাল কায়েস।

মুহূর্তের জন্য থমকাল আসাদ, তারপর মাথা নাড়ল "উঁহু! সেটা অসম্ভব, কারণ এই রকম থেতলানো লাশ নাড়াচাড়া করা হয়ে থাকলে দেখেই বোঝা যেত।"

"ঠিক!" সায় দিল কায়েস, "ওই লোকটা যদি কোমা থেকে বের হয়ে আসে তাহলে হয়ত আরও কিছু জানা যাবে।" পকেট থেকে একটা ক্যামেরা বের করতে করতে বলল ও, "আচ্ছা আপনারা তাহলে কাজ সেরে ফেলুন, লাশটার যা অবস্থা খুবই দ্রুত পচন ধরবে – বৃষ্টির জন্যে আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা না হলে এতক্ষণে গন্ধ ছুটে যেত।"

"হ্যাঁ!" একমত হলো আসাদ, "তাছাড়া প্রেসের কাছে একবার খবর চলে গেলে – যা আমার মনে হয় এতক্ষণে গেছে – আর শান্তিতে কাজ করা যাবে না।"

ক্যামেরাটা দিয়ে দ্রুত মৃতদেহ, মেঝের রক্ত আর গোটা ঘরটার কয়েকটা স্ন্যাপ তুলে পিছিয়ে এলো কায়েস। মাথা ঝাকিয়ে ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে আসাদকে বুঝিয়ে দিল যে ওর কাজ শেষ। তারপর গোড়ালির ওপর ঘুরে বেরিয়ে এলো ঘরটা ছেড়ে।

ওর পেছনে বিড়বিড় করল আসাদ, "যেমন শুনেছি লোকটাকে ঠিক তেমন তো মনে হলো না!"

###

ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছাড়ল কায়েস, ওপরে ওপরে যতই শক্ত ভাব ধরে থাকুক না কেন, ওই ভয়ঙ্কর বিকৃত লাশটার সান্যিধ্য মোটেও পছন্দ হয়নি ওর – তবে শুধু সে কারণেই অস্বস্তি বোধ করছিল তা নয়।

ঘরে ঢোকার সময় যে অদ্ভুত অনুভুতিটা হয়েছিল ওটাতে কিছুক্ষণ পর অভ্যস্ত হয়ে গেলেও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রেশার থেকে গিয়েছিল। আচ্ছা অন্য দু'জনও কি ব্যাপারটা টের পেয়েছে? না মনে হয়, কারণ চার বছর আগে জিনিষটাকে প্রথমবার অনুভব করার পর সে জেনেছে যে এই বিশেষ ব্যাপারটা সবাই এক লেভেলে অনুভব করে না।

গেট দিয়ে বের হয়ে আসার সময় গেটেরও একটা ছবি তুললো ও, তারপর ক্যামেরাটা রেখে দিল পকেটে। গেটের বাইরে পুলিশের যে ভ্যানটাতে করে ওরা এসেছে তাতে বসে আছে জহির। ভ্যানের ড্রাইভার আর আসাদের অন্য সঙ্গি কে দেখা গেল না।

জহির সিগারেট খাচ্ছিল, ওর দিকে এগিয়ে গেলো কায়েস। "তুমি না বলেছিলে এই বাজে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছ?" বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশ্ন করল ও।

"ছেড়ে দিয়েছিলাম কায়েস ভাই," লজ্জিত গলায় বলল জহির, "কিন্তু আজকে এই ব্যাপার দেখে সহ্য করতে পারছি না।"

"হুম, আসলেই ভয়ঙ্কর অবস্থা! তা অন্যরা কোথায়?"

“চা খেতে গেছে, ওই সামনের দোকানটায়!”
“আচ্ছা যাই আমিও এক কাপ খেয়ে আসি আর দোকানি কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করে দেখি। তুমি খাবে?”
“আমি আগে খেয়ে এসেছি, কায়েস ভাই।” বলল জহির, “আপনি যান।”
“ঠিক আছে, থাকো তাহলে।”
দোকানটা কাছেই, যেতে এক মিনিটও লাগল না। আর দশটা টং দোকান যেমন হয় এটাও তেমনি, তবে দীনহীন হাল, দেখে মনে হয় না বেচা কেনা তেমন হয়। অবশ্য এরকম একটা অন্ধগলিতে বেশি কাস্টমার আসার কথাও না। এই চিপায় দোকানটা দিতে গিয়েছে কেন কে জানে?
ফরেনসিক টীমের অন্য সদস্যটি একটু বয়স্ক একজন লোক, কায়েসের সাথে পরিচয় নেই, তবে পদমর্যাদার কারণে কায়েসকে সালাম জানাল সে, ড্রাইভার লোকটিও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল – জনপ্রিয় না হলেও কায়েসের একটা বিশেষ ধরণের পরিচিতি আছে – অধস্তনরা তাকে একটু বেশিই সমীহ করে চলে। খুব সম্ভব ওর ঠান্ডা আচরণ আর কাজে দক্ষতাই এর কারণ।
এক কাপ দুধ চিনি ছাড়া চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানির দিকে মনোযোগ দিল কায়েস। লোকটা মাঝ বয়েসি, শুকনো হাড়গিলে স্বাস্থ্য– কাঁচা-পাকা চুল তবে পাকার পরিমাণই বেশি। পরনে আধ ময়লা একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি – কাঁধে গামছা, সব মিলে একটা টিপিক্যাল চেহারা, বিশেষত্ব কিছু নেই।
“নেন ছার।” চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল লোকটা।
“ধন্যবাদ!” মোলায়েম গলায় বলল কায়েস। এমনিতে ওর কণ্ঠস্বর বেশ কর্কশ কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নরম গলায় কথা বলে ও, বিশেষ করে যখন কাউকে জেরা করে তখন ওর গলায় যেন মধু ঝরে। “তা ব্যাবসা পাতি কেমন চলে?” যেন এমনি কথার কথা বলছে অনেকটা এই ভঙ্গিতে করল সে প্রশ্নটা।
“আর ব্যাবসা ছার!” আফসোস করে বলল দোকানি, “এই মরার জায়গায় কেউ আসে নাকি? সকালে বাবুরা ‘মোনিং অয়াক’ না কি জানি করে তখন একটু যা চলে, অ্যামনে হারাদিনে আষ্ট কাপ চাও বেচবার পারি না!”
“তাহলে চলে কি করে আপনার?”

“চলে নাতো ছার, তয় ওই মোড়ের ওইপাশে কয়ডা দোকান, টেইলার, ছেলুন এইসব আছে, হেইগুলাত ফিলাক্সে ভইরা চা আর বিস্কুট দিয়া আসি আর কি!”
“মোড়টা তো বেশ দূরে। তা এত দূরে এইখানে দোকান দিলেন যে?” কৌতুহল দেখাল কায়েস।
“আসলে ছার, ডাক্তার সাব আমারে এইখানে বিনি পয়সায় থাকতে দিছে তো, এইরলাগি স্যার!” বিনিত ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

"ডাক্তার সাহেব মানে ডক্টর সোবাহান? ওই বাড়িটার মালিক?" তাহলে এ কারণেই এই অন্ধগলিতে জায়গা নিয়ছে দোকানি – বিনা ভাড়ায় থাকার সুবিধা পাওয়া কম কথা নয়।
"জ্বে ছার, এই জায়গাটাও ওনার।"
"তা কেমন লোক উনি?" জানতে চাইল কায়েস, "আর এই দেখেন, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি আপনার নামটাই তো জানলাম না।"
"হে হে, গরিব মানুষের আর নাম কি ছার?" হাত কচলাতে কচলাতে বলল দোকারি, "তয় আমি আলি হোসেন, ডাক নাম দুলু। আর ডাক্তার সাব ফিরেস্তার মত মানুষ ছার। এই দেখেন না, আমার মত নাদান লোকেরে একটা মাথা গোঁজার ঠাই করে দিছেন উনি।" বলে এক গাল হাসল সে, "আর ছার আমারে তুমি কইরে বইলেন। আপনেদের মত বড় মানুষেরা আমারে আপনে বললে সরম লাগে!"
"হুম, বুঝলাম। তো উনি আর এখানে থাকেন না কেন?"
"হেইটা আমি কি করে বলব ছার? আমি তো আর অত কিছু জানি না, উনি বিরাট মানুষ, উনার যেমন মর্জি।"
"এখন তো বাড়িটাতে শুধু ওনার ড্রাইভার থাকে?"
"জ্বে ওনার ডেরাইবার আর হের ভাই।"
"তো ওরা কি তোমার এইখানে আসে না কি?"
"জ্বে, হেরা দুই ভাইই তো আমার বান্দা কাস্টমার, তাগো জন্যে তাও কিছু বিক্রি বাট্টা হয়!"
"বুঝলাম, তা কালকে কি ঘটেছে তা কি জানো?"
"না তা সঠিক তো বলবার পারি না ছার। কিন্তু কিছু একটা হইসে নিসচিত, নাইলে আপনারা সকাল থেইকা আসা যাওয়া করতাসেন কেন?"
"কেন, সকালে তোমার ডাক্তার সাহেবের গাড়িটা যে বাইরে পড়ে ছিল, দেখনি?"
"না স্যার, বৃষ্টির জইন্য কেউ 'মোনিং ওয়াক' করতে আইব না বুইঝে দোকান আইজ দেরীতে খুলছি – তয় আপনার আগে যে স্যার আসছিল উনি কইল ওইটা নাকি থানায় নিয়া গেছেন?"
ওর কথার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কায়েস, "আর একজনকে যে হাসপাতালে নেয়া হলো, তাকে চেন?"
"না ছার, আমি আসলে দেখিই নাই – আমি এই সব জখমী লোকজন খুবই ভয় পাই। দেখতে মনে চায় নাই।"
"আচ্ছা! তা এই বাড়িতে কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার চোখে পড়েছে নাকি কখনো?"
"জ্বে না ছার!" এক কথায় জবাব দিল দুলু।
"হুম, তা তোমার ডাক্তার সাহেব নাকি আর মাত্র একটা প্রশ্ন – ডাক্তার সাহেব এখন কোথায় থাকে জানো? ওনার সাথে একটু দেখা করা দরকার।"
একটু যেন চমকে উঠল দুলু, "না ছার আমি সেইটা বলতে পারি না। ওনার কই পাওয়া যাইব জানি না।"

হাসল কায়েস, ক্রূর একটা বাঁকা হাসি। এতক্ষণের বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবটা নিমিষে বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে, "দেখো দুলু, তুমি একটু আগে বলেছ তোমার এই জায়গার মালিক ডক্টর সোবাহান, ওনার জায়গায় দোকান দিয়ে বসে আছ আর উনি কোথায় থাকেন বা কি করে যোগাযোগ করা যায় তা জান না, যেখানে তোমার দোকানের ধারে কাছে মানুষ বলতে থাকে ওনার ড্রাইভার আর তার ভাই – যারা আবার তোমার নিয়মিত খদ্দের। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ঘোলাটে লাগছে।"

হঠাৎ ওর ব্যবহারের এই আমূল পরিবর্তন দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলো দুলু। তারপর মিনমিনে স্বরে বলল, "না মানে ডাক্তার সাবের বাসা চিনি না আরকি। ওনার চিম্বার আছে টাউনহলে। তয় আমি ঠিকানা জানি না ছার, খালি জায়গা চিনি – লাগলে আপনারে নিয়া যাইতে পারুম।"

"না তার দরকার নেই, আমরা বের করে নিতে পারব।" উঠে দাঁড়িয়ে চায়ের দাম মিটিয়ে দিল কায়েস, তারপর বলল, "দোকান ছেড়ে যেও না তোমাকে দরকার পড়তে পারে।" তারপর ওর সঙ্গিদের উদ্দেশে বলল, "চল তাহলে যাওয়া যাক।"

গাড়ির কাছে ফিরে জহিরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল কায়েস – কয়েকটি নির্দেশ দিল ওকে। তারপর বিদায় জানিয়ে, গাড়ি থেকে কেসের ফাইলটা তুলে নিয়ে, হেঁটে বেরিয়ে এলো গলি থেকে – একটা সিএনজি ডেকে ওর বাসার ঠিকানা বলল।

সিএনজির সিটে হেলান দিয়ে ফাইলটা খুলল সে, ডুবে গেলো চিন্তায়। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। বেশ কয়েকটা খটকা আছে, একটার থেকে আর একটা বড়। পরবর্তী কর্মপন্থা কি হতে পারে সেই ভাবতে লাগল কায়েস।

পাঁচ

আপাতদৃষ্টিতে একটা বিষয়কে দেখে যা বোঝা যায় বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বোঝায় ফাঁক থাকে। ছোটখাট অনেক ব্যাপার প্রাথমিক তদন্তে চোখ এড়িয়ে যায়, বা হয়ত নজরে পড়লেও মনে সে ভাবে দাগ কাটে না বলে আর তলিয়ে দেখা হয় না।

এসব কারণেই কায়েস ফাইলটা আগে পড়েনি – এখন ফাইলে লেখা বিশদ বিবরণ পড়তে পড়তে মনে মনে ঘটনাগুলো ওর নিজের অবজার্ভেশনের সাথে মেলাতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু যতই ভাবছে ততই মাথা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে – অনেকগুলো প্রশ্ন এসে জমা হচ্ছে মনে, কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছে না।

ও নিজে যতটুকু দেখেছে ফাইলে তার থেকে বেশি তেমন কিছুর উল্লেখ নেই। তবে অন্য যে ভিকটিমকে পাওয়া গেছে তার ব্যাপারে বর্ণনা আছে। মনোযোগ দিয়ে দু'বার বর্ণনাটা পড়ল কায়েস। কিন্তু এমন কোন কিছু পেলো না যা ধরে তদন্তে আগানো যায়।

ফাইলের লেখা অনুযায়ী আহত লোকটির অবস্থা খারাপ হলেও তার ইমেডিয়েট লাইফ রিস্ক নেই, সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি আছে আপাতত – জ্ঞান নেই, শ্বাস প্রশ্বাসে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে তাই অক্সিজেন দেয়া আছে। তবে ধারণা করা যাচ্ছে দুপুরের ভেতরে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা যাবে। লোকটির বয়েস আনুমানিক পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে – পকেট থেকে পাওয়া কাগজ পত্র অনুযায়ী নাম রাশেদুন করিম। উচ্চতা এবং শরীরের গড়ন মাঝারি, গায়ের রঙ শ্যামলা – সবমিলিয়ে সাদামাটা চেহারা।

আঘাতের বিবরণটাই গোল বাঁধিয়েছে – ফাইলে লেখা আছে যে চিহ্ন দেখে মনে হয় লোকটার শরীরে ভোঁতা এবং ভারী কোনকিছু দিয়ে বারবার উপরযুপুরি আঘাত করা হয়েছে। অবশ্য আঘাতের অস্ত্রটা ভোঁতা হলেও তার অগ্রভাগে খুব স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছোট ছোট কয়েকটি ধারালো জিনিষ লাগানো ছিল বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ জায়গায় জায়গায় লোকটির চামড়াতে ক্ষত তৈরি হয়েছে। সবথেকে গুরুতর আঘাত দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে মাথার বাম পাশে এবং পাঁজরের ডান পাশে – মাথার আঘাতটাই সংজ্ঞা নাশের কারণ বলে ধারণা করা যাচ্ছে আর বুকের আঘাতের ফলে পাঁজরের তিনটি হাড় ভেঙ্গে গেছে বেচারার।

ঠিক কি ধরণের আক্রমণকারী এই রকম অদ্ভুত কায়দায় আঘাত করতে পারে, অনেক ভেবেও তার কোন কুল পেল না কায়েস। ফাইলটা বন্ধ করল সে, গন্তব্যে পৌঁছে গেছে; সিএনজি চালককে থামতে নির্দেশ দিলো।

আপাতত বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে – গত রাতে বলতে গেলে ঘুমায়নি, এখন উত্তেজিত মস্তিষ্কে চিন্তা ভাবনা ঠিক জমছে না। কিছুক্ষণ আগে দেখা ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা মনে করে নিজের অজান্তেই আবার শিউরে উঠল সে। সত্যি, ওইরকম একটা ব্যাপার ভোলা কঠিন। কায়েস বেশি লোকের সাথে না মিশলেও প্রচুর শক্ত চরিত্রের লোককে জেরা করেছে, তাছাড়া জেরা করার জন্যে প্রচুর সাইকোলজির বই পত্র পড়তে হয়েছে ওকে – মানুষের মন কি ভাবে কাজ করে তার ব্যাপারে বেশ ভালো ধারণা আছে ওর।

যে কোন জিনিসকে ভুলে যাবার চেষ্টা করলে তা বারবার আরও প্রকট ভাবে মনে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। আর নার্ভ যতই দৃঢ় হোক না কেন, ওরকম বীভৎস একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হবার পর কয়েকদিন দুঃস্বপ্ন দেখবে না এমন লোক বিরল - অবশ্য একজনকে চেনে কায়েস যে হয়ত একবার মুখ বাঁকানোর বেশি কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে না, কিন্তু সে নিজে এখনো অতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারেনি।

সিএনজি বিদায় করে বাড়িতে প্রবেশ করল কায়েস, একটা বহুতল ভবনের আটতলায় ছোট একটা ফ্ল্যাটে একা থাকে ও – বিয়ে থা করেনি, চাকরি থেকে পাওয়া কোয়ার্টার নেয়নি ইচ্ছা করেই – কোয়ার্টারে থাকা মানেই অনেক সহকর্মীর সাথে সহাবস্থান, যেটা ওর পছন্দ নয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে দু'টা ফোন করল ও – একটার জবাব পেল না, অবশ্য আশাও করেনি। অন্য একটাতে ওসি রবিউল আলমকে অনুরোধ করল আইসিইউ থেকে রিলিজ পেলে আহত লোকটাকে যেন একটা কেবিনে আলাদা ভাবে রাখা হয়। কারণ রাশেদুন নামের ওই যুবকের জ্ঞান ফিরলে সে হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সূত্র দিতে পারবে, তাই একটু বাড়তি নিরাপত্তার ব্যাবস্থা। আরও বলল যে ও সাব ইন্সপেক্টর জহিরকে ওর সাহায্যকারী হিসেবে চাচ্ছে এই কেসের জন্যে। রবিউল রাজি হওয়ায় সন্তুষ্ট হয়ে ফোন রাখল কায়েস। এরপর সামান্য কিছু নাস্তা সেরে ঘুম!

###

ঘন্টা কয়েক ঘুমিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে বোধ করল কায়েস। হাল্কা ব্যায়াম করে, শাওয়ার আর লাঞ্চ সেরে, তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো। নিজের একটা মোটরসাইকেল আছে কিন্তু বেশিরভাগ সময় অফিসেরটাই ব্যবহার করে থাকে ও, আজ কি মনে করে নিজেরটাতে চড়ে বসল। ঘড়িতে দেখাচ্ছে দুপুর তিনটা বেজে কুড়ি – কিন্তু আকাশে এতো মেঘ যে বোঝার যো নেই, বরং মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয় হয়। বৃষ্টি হচ্ছে না বটে, তবে কেমন যেন থম ধরে আছে প্রকৃতি – ঝড়ের পূর্বাভাস। শার্টের উপরে বর্ষাতিটা চাপিয়ে নিলো কায়েস, হঠাৎ বৃষ্টি নামলে মটরসাইকেল চালানো থামিয়ে পড়াটা ঝামেলা হবে। ওর গন্তব্য – মোহাম্মদপুর টাউন হল, ডক্টর সোবাহানের সাঙ্গে কথা বলতে হবে।

ঘুম থেকে উঠে মোবাইল চেক করে দু'টো এসএমএস পেয়েছে কায়েস। তার একটা বেশ দীর্ঘ, যেটাতে জহির জানিয়েছে ডক্টর সোবাহানের চেম্বারের ঠিকানা এবং আরও কয়েকটি টুকিটাকি তথ্য। সেই ঠিকানার লক্ষ্যে বাইক চালালো কায়েস।

দ্বিতীয় এসএমএসটা সংক্ষিপ্ত, ওতে লেখা রয়েছে, "Number two, one hour after midnight." অদ্ভুত বাক্যটার কথা মনে করে নিজের মনেই একবার হাসল কায়েস। দেখে যদিও অতি নাটকীয়তা মনে হবে, কিন্তু প্রেরককে চেনা থাকায় কায়েস জানে এর মাঝে আসলে কোন ভনিতা নেই।

মোটরবাইক চালানোর একটা সুবিধা আছে – ঢাকার ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায় – অবশ্য একই সাথে এটাও সত্য যে ঢাকার রাস্তায় বাইক চালানো মানে জীবন হাতে নিয়ে চলা ফেরা করা।

বিভিন্ন চিপাচাপা আর শর্টকাট ব্যবহার করে মোহাম্মদপুর পৌছাতে বেশিক্ষণ লাগলো না কায়েসের। ঠিকানাটাও সহজ – চেম্বারটি মেইন রোডের ধারে, ডেকোরেশন দেখে মনে হলো সোবাহান নামক ডাক্তারটির ভালোই প্রসার আছে।

চেম্বার শুরু হবার কথা চারটার সময়, দশ মিনিট আগেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করল কায়েস। তরুণী নার্স কাম রিসিপশনিস্টের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে নিজের একটা কার্ড ঠেলে দিল ও, তারপর নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার সাহেব আছেন কিনা।

মেয়েটা জানালো যে ডাক্তার তার কামরায় আছেন, ধন্যবাদ জানিয়ে কায়েস অল্প কথায় বলল যে একটা বিশেষ পুলিশি প্রয়োজনে ওকে তখনই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। অতপর মেয়েটি ওকে অপেক্ষা করতে বলে কম্পাউন্ডার গোছের মাঝবয়েসি একজনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল ডাক্তার সাহেবকে ওর আগমন সম্পর্কে জানাতে।

মিনিট খানেক পরেই ফিরে এলো লোকটা – এবং কায়েসের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল তার সঙ্গে যেতে।

লোকটার গলার স্বরটা কেমন যেন ফেঁসফেঁসে এবং বেখাপ্পা শোনাল কায়েসর কানে – ভালো করে তার দিকে তাকালো আবার ও। মাঝারি উচ্চতা এবং গাট্টাগোট্টা শরীর লোকটার, গায়ের রঙ কালো, পরনে সাধারণ শার্ট প্যান্ট, চোখে একটা ঘোলা ফ্রেমের চশমা পরে আছে বলে চোখ দেখা যাচ্ছে না। আর তেমন কোন বিশেষত্ব নেই লোকটার চেহারায়, তবে হাত দুটো তার স্বাভাবিকের থেকে খানিকটা বেশি লম্বা – ব্যাপারটা নজর এড়াল না কায়েসের।

যাই হোক, লোকটার পিছু পিছু ডাক্তারের কামরায় ঢুকল ও, আর দশটা প্রাইভেট প্র্যাক্টিশনারের চেম্বারের মতই ঘরটা, তবে বেশ বড়সড়; একধারে একটা বেড রয়েছে, খুব সম্ভব রোগীকে শোয়া অবস্থাতে চেকাপ করার জন্যে। দেয়ালের একধারে ফাইল ক্যাবিনেট – কয়েকটি ছোটখাট ডাক্তারি যন্ত্রপাতি, একটা মাঝারি আকৃতির সেফ এবং একটা সেলফে বেশ কিছু বই রয়েছে। কোনে ছোট একটা কম্পিউটার টেবিলও আছে।

ডাক্তারের নিজের ডেক্সটাও স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বড়, এমনিতে হয়ত এতসব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করত না কায়েস কিন্তু এখানে তদন্ত করতে এসেছে ও, তাই প্রত্যেকটা ছোট্ট নগন্য জিনিসের দিকেও মনোযোগ দিলো।

সকালে জহিরকে নির্দেশ দেবার সময়ে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে বলেছিল ও, তার মধ্যে একটা ছিল ডাক্তার সোবাহানের ব্যাপারে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক – সকালে ক্রাইম সিনটা দেখতে যাওয়ার পর থেকেই ডাক্তারের ব্যাপারে কৌতহল বোধ করছে ও, হয়ত ব্যাপারটা নিছক বাড়াবাড়ি কিন্তু নিজের ইন্সটিঙ্কটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে কায়েস।

ওর নির্দেশের মধ্যে আরও একটা বিষয় ছিল – তা হলো ও নিজে না আসা পর্যন্ত যেন ট্র্যাজেডিটার ব্যাপারে ডাক্তার সাহেবকে কোন খবর দেয়া না হয় – যা জানাবার ও নিজে জানাবে।

রুমটায় নজর বুলানো শেষ করে ডেস্কের পেছনে আর্ম চেয়ারে পিঠ খাড়া করে বসে থাকা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলো কায়েস। সোবাহান সাহেবের বয়েস ও যতটা হবে বলে ভেবেছিল তার থেকে অনেক কম – চল্লিশের কোঠার শেষের দিকে হবে বেশি হলে। ফর্সা, সুন্দর ছিমছাম চেহারা – ক্লিন সেভড, মাথার ঝাঁকড়া চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ভদ্রলোকের পাতলা সাতলা দেহ, বসে থাকার কারণে উচ্চতা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু লম্বা লোক তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। কায়েস নিজে পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু ও নিশ্চিত সোবাহানের উচ্চতা ওর থেকে বেশি বই কম হবে না।

ডাক্তারের পরনে দামী পোশাক, অবশ্য ওপরে একটা ওভারঅল আছে। লোকটার দু'হাতেই আকাধিক একাধিক আংটি দেখতে পেলো কায়েস – একজন চিকিৎসকের বেলায় ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত মনে হলো ওর কাছে।

"কায়েস হায়দার, ইন্সপেক্টর – স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ!" ভরাট গলায়, অমায়িক ভঙ্গিতে কথা বলে উঠলেন ডক্টর সোবাহান, ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন, "প্লিজ, বসুন! তা আপনার কি সাহায্যে আসতে পারি?" মাথা ঝাঁকিয়ে কায়েসের সঙ্গে আসা কম্পাউন্ডার গোছের লোকটিকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল কায়েস, কোন ভনিতা করল না, সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো, "ডক্টর সোবাহান, আপনার বাঁশবাড়ি এলাকার চাঁন মিয়া হাউজিংয়ের পেছনের বাড়িতে গত কাল রাতে একটা অস্বাভাবিক এবং ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। একজন খুন হয়েছে এবং আরও একজন কোমায় আছে!" কোন বিরতি না দিয়ে একনিশ্বাসে কথা গুলো বলে গেলো ও; তারপর থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালো সোবাহানের মুখের দিকে।

ডক্টর সোবাহানের মুখটা বোয়াল মাছের মত হা হাঁ হয়ে গেছে – ঝুলে পড়েছে চোয়াল। প্রায় আধ মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি, তারপর অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলেন, "হোয়াট?!?"

###

রাত সাড়ে দশটার দিকে থানা থেকে বের হলো কায়েস। ক্লান্ত বোধ করছে – সোবাহানের ওখানে গিয়ে কাজের কাজ কিছুই আগায়নি, কায়েস ধারণা করেছিল খুনের সঙ্গে সোবাহানের যোগসাজশ আছে, সন্দেহটা একেবারে ভিত্তিহীনও ছিল না। সেজন্যেই বিকালে ওরকম নাটুকে ভঙ্গিতে খবরটা দিতে গিয়েছিল, সোবাহানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে ওকে, অস্বাভাবিক কোন আচরণ করেননি ডক্টর সোবাহান, নির্ভেজাল বিস্ময় আর উদ্বেগের সাথেই খবরটা গ্রহণ করেছেন তিনি। ওখানে সব কিছু বুঝিয়ে বলে বের হতে হতে ছ'টা বেজে গিয়েছিল।

সোবাহানের কথা থেকে জানা গেছে বেঁচে যাওয়া রাশেদুন তাঁর ড্রাইভার। রাশেদুন আর তার ভাই শাহেদুনকে তাঁর বাঁশবাড়ির বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন সোবাহান। রাশেদুন মাস ছ'য়েক ধরে তাঁর চাকরি করছে আর শাহেদুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, হলে সিট পায়নি, আর গরিব বলে নিজের পক্ষে বাসা ভাড়া করে থাকা কঠিন – এজন্যে ভাইয়ের সাথে থাকত। সোবাহান আপত্তি করেননি, বাড়িটা তো খালিই পড়ে আছে।

তিনি আরও জানান যে প্রতিদিন গাড়ি দরকার হয়না বলে আজ রাশেদুনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি তিনি। রাশেদুন আর শাহেদুনের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তেমন কিছু অবশ্য বলতে পারেননি – শুধু এইটুকু জানিয়েছেন যে রাশেদুন শিক্ষিত ছেলে, বিএসসি পড়ত - ল্যাস্ট ইয়ারে ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে পড়া শেষ করতে পারেনি। ঠেকায় পড়ে ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছে – তাই তিনি দয়া পরবশ করে একটু বেশিই বেতন আর সুযোগ সুবিধা দিতেন। নিহত শাহেদুন ছিলো রাশেদুনের পিঠাপিঠি ছোট ভাই – এছাড়া আর তেমন কিছু জানেন না তিনি ওর ব্যাপারে।

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অনেক্ষণ প্রশ্ন করেও কোন অসামঞ্জস্য ধরতে পারেনি কায়েস – যদি অভিনয় করে থাকে তাহলে বলতে হবে ডক্টর সোবাহান বড় রকমের অভিনেতা। তবে হাল ছাড়েনি কায়েস – অপরাধীরা অপরাধ গোপন করতে অনেক কিছুই করে থাকে আর অভিনয়তো খুবই কমন ব্যাপার। বিদায় নেয়ার আগে সোবাহানের গাড়ির হদিস দিয়ে এসেছে ও আর ডক্টর নিজেই জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েছেন রাশেদুন কোথায় আছেন, পরদিন দেখতে যেতে চান তিনি। কায়েসকে তিনি অনুরোধ করেছেন যেন যেকোন মূল্যে রহস্যটা উদঘাটন করা হয় এবং অপরাধীরা শাস্তি পায়।

ওখান থেকে বেরিয়ে সরাসরি থানায় চলে আসে কায়েস – ওর বদলে ডিউটি যার পড়েছে তার নাম শৌমিক ভট্টাচার্য্য – বেশিরভাগ সহকর্মী মত এর সাথেও কায়েসের সদ্ভাব নেই; তবে শৌমিক এফিসিয়েন্ট অফিসার – কায়েসের কথা মত কয়েকটা খোঁজ খবরের ব্যাবস্থা করে দিয়েছে সে। তার কাছে জহির একটা রিপোর্ট রেখে গিয়েছিল, সকালে কায়েসের দেয়া ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী খোঁজ নিয়ে যা জেনেছে তাঁর বিশদ বিবরণ।

ওটা পড়ার পর জট বিন্দু মাত্র খুলে তো নেইই – বরং আরও প্যাঁচালো হয়েছে – তবে একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে কায়েস – একজনকে পাওয়া গেছে যে যতটুকু দেখাচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি জানে। যে ব্যাপারটা সকালেই কায়েসের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছিল, তা হচ্ছে দুলুর স্পিচ প্যাটার্ন – অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেছে লোকটা, যা একজন চা দোকানির পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু কায়েস লক্ষ্য করেছে যে তার কথায় নির্দিষ্ট কোন আঞ্চলিক টান ছিলো না, বরং শুধু কিছু শব্দকে বিকৃত করে উচ্চারণ করে গেছে দুলু।

এরকমটা এমনি এমনি হবার কথা না, তবে ইচ্ছা করে নিজের বাচন ভঙ্গিকে লুকাতে চাইলে হতে পারে। তাছাড়া ওর ব্যাবসার যে বর্ণনা দুলু দিয়েছিল – যে, সে দোকান, সেলুন, টেইলার্সে চা সাপ্লাই দেয় – সেকথাটাও যুক্তি সঙ্গত মনে হয়নি কায়েসের। কারণ গলির বাইরে যেখানে ওই সেলুন, দোকান ইত্যাদি অবস্থিত ওখানে আরও দু'টো চায়ের দোকানও রয়েছে – নিজের পাশে দোকান রেখে গলির ভেতরের দুলুর দোকান থেকে চা কেনার মত এত আহামরি চা যে দুলু বানায় না তা ওর চা খেয়ে বোঝা হয়ে গেছে কায়েসের। পরে জহিরের রিপোর্টে ওর সন্দেহ যে ঠিক তা জানতে পেরেছে কায়েস – জহিরের প্রশ্নের জবাবে ওই সব দোকান, সেলুন ইত্যাদির মালিকেরা দুলুর থেকে নিয়মিত চা কেনার কথা অস্বীকার করে।

দুলুর কথার জের ধরেই সোবাহানের ওপর সন্দেহটা গিয়ে পড়ে – এখনো কায়েসের ধারণা ডাক্তারকে ঘিরে একটা ঘাপলা আছে – যদিও কোন প্রমান পায়নি তবু ব্যাপারটাকে আরও ঘাঁটিয়ে দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও – এবং এই জন্যেই আজ চেম্বারে দুলু প্রসঙ্গে একটা কথাও বলেনি; এবং সোবাহানও কিছু জিজ্ঞেসা করেননি। বিষয়টা কায়েসের চোখ এড়ায়নি – পুরো এলাকায় লোক বলতে একমাত্র দুলু, যাকে কিনা সোবাহানই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন অথচ এত বড় একটা ঘটনার পর ওর কি হলো সে ব্যাপারে কোনই মাথা ব্যাথা নেই ডাক্তারের। যেন ওর অস্তিত্বের ব্যাপারেও তিনি অবগত নন।

গোটা কেসে এখন পর্যন্ত এই একটা সুত্রই আছে কায়েসের হাতে। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আগা গোড়া ভেবে লম্বা সময় নিয়ে একটা খসড়া রিপোর্ট রেডী করল ও, এর মাঝে এক ফাঁকে রাতের খাওয়া সেরে এল কাছের এক রেস্তোরা থেকে। কায়েস খুব বেশি খায় না বটে কিন্তু এমনিতে খাওয়ার ব্যাপারে ও খুবই খুঁতখুঁতে, ক্যান্টিনের খাবার পারতপক্ষে ছুঁয়ে দেখে না। কালকের আগে আর দুলুর ব্যাপারে খোঁজ নেবার সময় নেই, কিন্তু এসএমএস-এ মিটিঙের যে সময় লেখা হয়েছে তাতে করে হাতে আরও ঘন্টা দুয়েক আছে। এই সুযোগে রাশেদুনকে একবার দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে। সন্ধ্যায় খবর নিয়ে জেনেছে যে রোগীর অবস্থা এখন অনেক ভালো, কেবিন স্থানান্তর করা হয়েছে – তবে জ্ঞান এখনো ফেরেনি। তবে জ্ঞান না থাকায় কথা বলা না গেলেও তদন্তের সার্থে ভিক্টিমকে একবার সরেজমিনে দেখে আসা ওর কর্তব্য। থানা থেকে বেরিয়ে তাই মোটর সাইকেলে চেপে বসল কায়েস।

রাত হয়ে গেছে বেশ, তার ওপর সন্ধ্যা থেকে আবার শুরু হয়েছিল বৃষ্টি কিছুক্ষণ আগে যদিও থেমেছে কিন্তু আকাশে এখনো মেঘের ঘনঘটা, মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ঝলকে চরাচর রাঙিয়ে বিকট শব্দে বাজ পড়ছে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালের যে অংশে রাশেদুন আছে তা কিছুটা ভেতরের দিকে।ওর পরিচয় জেনে গেট থেকে গার্ডরা বলে দিলো কিভাবে যেতে হবে – এটাও জানালো যে ডিউটিরত নার্স পথ দেখিয়ে দিবে, আর কেবিন নম্বর তো কায়েসের জানাই আছে।

কেবিনটা তিন তলায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাম দিকে মোড় নিতে হলো – কিন্তু কোন নার্সকে চোখে পড়ল না কায়েসের। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ খুঁজে পরে বিরক্ত হয়ে নম্বর দেখে দেখে

নিজেই কেবিনটার খোঁজে এগিয়ে গেলো ও। দু'তিনটি করিডোর পেরিয়ে শেষমেষ কাঙ্খিত কেবিনের দেখা পেল সে।

দরজাটা বন্ধ নয়! সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা পাল্লার দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালো কায়েস – কোথায় বলেছিল নিরাপত্তার দিকে একটু ভালো মত খেয়াল রাখতে, তা না, দরজাটা ঠিক মত লাগাতেও ভুলে গেছে! পর মুহুর্তে ভাবল এমনও হতে পারে যে নার্স হয়ত ওই রুমের ভেতরেই আছে, রোগীর দেখভাল করছে।

যাই হোক না কেন, ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যাবে, ভেবে এগিয়ে গেলো ও দরজার দিকে। নক করার জন্যে হাত তুলল।

কেমন যেন অদ্ভুত, খচমচ একটা শব্দ – খুবই ক্ষীণ, বিছানা গোছানো বা বালিশ নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় এরকম শব্দ পাওয়া যায়। মূহুর্তের জন্যে কায়েস ভাবল হয়ত নার্স রোগীর বিছানা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে – কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। রাতের এই রকম একটা সময়ে একজন অজ্ঞান রোগীর আর যাই প্রয়োজন পড়ুক, বালিশ ঠিক করার দরকার হবে না। কোন একটা ঘাপলা আছে!

নক করার বদলে সাবধানে দরজা ঠেলে উকি দিল কায়েস – এবং চমকে উঠল!

কামরার ভেতর আদপেই একজন নার্স রয়েছে – তবে কায়েস হলফ করে বলতে পারবে যে সে একজন ভুয়া নার্স। কারণ এই মূহুর্তে বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে শুয়ে থাকা জ্ঞানহীন দেহটার মুখে একটা বালিশ চেপে ধরেছে নার্সের পোশাক পড়া পরা গাট্টাগোট্টা লোকটা, একটু দূরে মাটিতে লুটাচ্ছে রোগীর মুখ থেকে খুলে ফেলা অক্সিজেন মাস্ক।

ছদ্মবেশী নার্সের মুখটা দেখতে পেলো না কায়েস কারণ সে একটা সারজিক্যাল মাস্ক পরে আছে – কিন্তু তার চোখ দু'টো ওর নজর এড়ালো না। টকটকে লাল দুটো চোখ, তাতে কেমন একটা উন্মাদনাময় দৃষ্টি, কেমন এক জান্তব বন্যতা! শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেলো কায়েসের। কিন্তু তাই বলে দাঁড়িয়ে রইল না - নিমিষে সক্রিয় হলো সে।

লাথি মেরে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল রুমের ভেতরে – একই সঙ্গে ঝটকা দিয়ে বের করে এনেছে ওর ব্রাউনিং অটোমেটিক। পিস্তলটা ভুয়া নার্সের বুকে তাক করে নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে নির্দেশ দিলো কায়েস, "বালিশ ফেলে সরে দাঁড়াও! এক্ষুনি – নাইলে নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো!"

ভুয়া নার্সের মুখ থেকে চাপা একটা গর্জন বেরিয়ে এলো – কোন মানুষের মুখে এই রকম শব্দ আগে কখনো শুনেনি কায়েস। সরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না লোকটার মাঝে, স্থির হাতে জায়গায় ধরে আছে বালিশটা – ওইভাবে মিনিট তিনেক থাকলে সুস্থ মানুষও মারা যাবে, আর রাশেদুন তো আগে থেকেই কোমায় আছে।

যদিও হুমকি দিয়েছে গুলি করার – নিতান্ত বাধ্য না হলে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে শুট করার ইচ্ছা নেই কায়েসের। লম্বা পা ফেলে লোকটার দিকে এগিয়ে গেলো ও, পিস্তলের নল দিয়ে বাড়ি মেরে ঘায়েল করার ইচ্ছা।

লোকটা বোধহয় এই রকম কোন সুযোগেরই আশা করছিল, কায়েস কিছুটা কাছে আসতেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় হাতের বালিশটা ছুড়ে ছুঁড়ে দিলো সে - কায়েসের মুখ লক্ষ্য করে। একই সাথে প্রকান্ড এক লাফে বিছানা টপকে ছুটে এলো কায়েসের দিকে।

দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট, আর লোকটার নড়াচড়ায় রয়েছে চিতার ক্ষিপ্রতা; তারওপর বালিশটা ছুঁড়ে দেয়ায় একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে – সাধারণ কেউ হলে যে বিচলিত হয়ে পড়ত তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কায়েস অন্য ধাতুতে গড়া – দীর্ঘদিনের অনুশীলন আর সহজাত দক্ষতার গুনে অস্ত্র চালানোর ব্যাপারে ও একটা বিরল প্রতিভা হয়ে উঠেছে।

ইন্টেরোগেশন ছাড়া এই আর একটা বিষয়ে খ্যাতি আছে কায়েসের – পুলিশের মধ্যে তো বটেই, এমনকি সেনাবাহিনীর সাথে যৌথ ভাবে অনুষ্ঠিত বহু শুটিং প্রতিযোগিতাতে অংশ নিয়েছে সে; এবং কখনও দ্বিতীয় হয়নি।

রবিউল আলম মনে করেন কায়েস অলিম্পিকে গেলে গোল্ড মেডাল আনতে পারবে – এবং এ ধারণায় খুব একটা অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না।

ভুয়া নার্স নড়ে ওঠার সাথে সাথেই অ্যাকশনে গেছে কায়েস – দু'বার গর্জন ছাড়ল ওর ব্রাউনিং। প্রথম গুলিটা উড়ন্ত বালিশটাকে এক কোনে ছিটকে ফেলল – একরাশ মিহি তুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। মসৃণ ভাবে নল ঘুরিয়ে করা দ্বিতীয় গুলিটা লাগলো ভুয়া নার্সের বাম হাটুতে।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে নাইন এমএম-এর গুলি খেয়েও থামল না উন্মত্ত লোকটা। একপায়ে ভর দিয়েই বিদ্যুতবেগে এগিয়ে এলো, একই সঙ্গে ঢিলেঢোলা পোশাকের ভেতর থেকে বের করে আনলো ভয়ঙ্কর দর্শন একটা অস্ত্র।

জিনিসটা দেড় ফুটের কিছু বেশি হবে দৈর্ঘ্যে, কাস্তের মত বাঁকা, কিন্তু ধার বাইরের দিকে – পাঁঠা বলি দেবার সময় হিন্দু পুরোহিতরা এরই আরও বড় একটা সংস্করণ ব্যবহার করে থাকে – সেগুলোকে বলা হয় খড়গ।

ছোট্ট খড়গটা বের করেই কোপ চালিয়েছিল নকল নার্স – কিন্তু গুলি ছুড়েই রিফলেক্স অ্যাকশনে পিছিয়ে গেছে বলে এযাত্রা বেঁচে গেলো কায়েস – নাহলে যে বেগে আঘাতটা এসেছিল লাগলে নির্ঘাত ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যেত।

এই রকম পরিস্থিতিতে হত্যা করার জন্যে গুলি করাই বুদ্ধিমানের কাজ – নইলে নিজের জীবন দিয়ে মাশুল গুনতে হতে পারে। কিন্তু দুর্বৃত্তটাকে জীবিত ধরতে কায়েস বদ্ধপরিকর – মেরে ফেললে তথ্য আদায়ের কোন উপায় থাকবে না।

দ্বিতীয়বার কোপ চালানোর আগেই ভুয়া নার্সের খড়গ ধরা হাতের কনুই গুঁড়িয়ে দিলো কায়েসের গুলি। তারপর নির্দয় ভাবে লোকটার অন্য হাটুতেও গুলি করল কায়েস।

দুটো পা'ই অকেজো হয়ে যাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলো নকল নার্স। হাত থেকে আগেই খড়গটা ছিটকে পড়েছে। মুখ থেকে চাপা একটা ঘোঁত জাতীয় আওয়াজ বের হলো তার, তিনটি গুলি খেয়েও একটা আর্তনাদ করেনি সে!

সতর্ক ভঙ্গিতে আরও এক পা পিছালো কায়েস, ওর পিঠ ঠেকলো দেয়ালে। উত্তেজনায় হাফাচ্ছে কিন্তু পিস্তলটা স্থির, নিষ্কম্প হাতে ভুয়া নার্সের বুকের দিকে তাক করা। বুঝে গেছে যে তার সামনের ওই লোকটা যেই হোক বা যাই হোক, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

এই সময় খোলা দরজায় হুড়মুড় করে উঁকি দিল তিনজন নার্স। দু'জন মহিলা এবং একজন পুরুষ – তাদের চোখে মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ শোনার পর অবশ্য সেজন্যে দোষ দেয়া যায় না।

মেঝেতে বেখাপ্পা অবস্থায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত লোকটাকে দেখে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন মেয়ে নার্স, বিস্ময় মিশ্রিত আওয়াজ বেরুলো অন্য দু'জনের গলা থেকেও।

বিরক্ত চোখে ওদের দেখলো কায়েস – তারপর নজর ফেরালো গুলি খাওয়া লোকটার দিকে – প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, এরকম চলতে থাকলে বাঁচবে না বেশিক্ষন। কিন্তু এই অবস্থাতেও ওঠার প্রয়াস পাচ্ছে সে।

"নড়বে না," পিস্তলের হ্যামার উঠিয়ে কর্কশ গলায় ধমকে উঠল কায়েস, তারপর ওর ওপর থেকে নজর না সরিয়ে পুরুষ নার্সটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ভাই, আপনি পেছন থেকে ঘুরে গিয়ে ওর অবস্থাটা একটু দেখুন – সাবধান আমার পিস্তলের লাইনে আসবেন না, এই লোক ডেঞ্জারাস, খুব সাবধান!"

কয়েক মূহুর্ত বিহ্বল হয়ে রইল নার্সটি, তারপর তৎপর হয়ে উঠল। সাবধানে ঘুরে ভূপতিত লোকটির কাছে গেলো সে। কায়েস পিস্তল ধরে আছে – ও নিশ্চিত যে কোন উল্টো-সিধে করার মত অবস্থা আর নেই ভুয়া নার্সের। দুই হাটুই ভেঙ্গে দিয়েছে ও। কোনমতেই দাঁড়াতে পারবে না লোকটা। একটা হাত অকেজো, আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রাথমিক শক কেটে গিয়ে ব্যাথাও শুরু হয়ে গেছে।

অথচ কায়েসকে অবাক করে দিয়ে অসম্ভব একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসল নকল নার্স। পুরুষ নার্সটি ওর কাছে পৌঁছান মাত্র এক হাতে লোকটার কাপড় খামচে ধরে হ্যাচকা এক টান মারল সে। হুমড়ি খেয়ে তার আর কায়েসের মাঝে চলে এলো পুরুষ নার্স – এবং পর মূহুর্তে কায়েসকে বিমূঢ় করে দিয়ে সম্পুর্ণ সুস্থ মানুষের মত এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল দুই হাটুতে গুলি খাওয়া নকল নার্স।

সামনে চলে আসা পুরুষ নার্সের কারণে গুলি করতে পারল না হতভম্ব কায়েস। জ্যা মুক্ত তিরের মত ছুটে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো লোকটা – দুই পায়ে যে দুটো গুলি খেয়েছে সেরকম কোন ভাবই বোঝা গেলো না তার ছোটার ভঙ্গিতে। তার ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল দরজায় দাঁড়ানো একজন মহিলা নার্স।

একটা খিস্তি করে পিছু নিতে গেলো কায়েস – ও বুঝে উঠতে পারছে না কি করে লোকটার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব, হাটু ভেঙ্গে গেলে মানুষ দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না সেখানে এইরকম খোদাই খেদাই ষাঁড়ের মত ছুট! কিন্তু এই মূহুর্তে ব্যাটা কিভাবে দৌড়াতে পারছে তা নিয়ে ভাবার থেকে লোকটাকে পাকড়াও করা অনেক বেশি জরুরী। তাই উদ্যত পিস্তল হাতে পিছু নিল কায়েস।

কিন্তু কপাল খারাপ, একে ছোট কামরা তায় পথমধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু'জন নার্স; তারওপর রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে মেঝে – এসব কাটিয়ে, দরজা পেরিয়ে, কায়েস যখন করিডোরে পৌছল, ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে ভুয়া নার্স।

তবে হাল ছাড়ল না কায়েস। মেঝেতে রয়ে গেছে রক্তের পুরু দাগ, তা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো ও। শরীরের প্রতিটা পেশী টানটান হয়ে রয়েছে ওর, নিমিষে অ্যাকশনের যেতে প্রস্তুত। কিন্তু একটা করিডোর পেরিয়ে এসে আবারও হতাশ হতে হলো ওকে – ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেছে রক্তের দাগ, যেন ওটার কোন অস্তিত্বেই ছিল না! কোন চিহ্নই নেই, নেই পিছু নেবার কোন উপায় – অথচ এখান থেকে বের হবার এই একটাই পথ আছে। আগা মাথা কোন কিছু বুঝতে না পেরে অবাক বিশ্ময় নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল কায়েস।

ছয়

ধানমন্ডি এলাকায় বেশ বড় এবং বিলাস বহুল একটি বাড়ি; সরকারি ভাবে বাড়িটি বরাদ্দ করা হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে।

দোতলায় মাঝারি আকৃতির একটি আধো অন্ধকার কামরার দরজা ঠেলে প্রবেশ করল লোকটি। অত্যন্ত মন্থর তার গতি, যেন চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। বেশভূষা অবিন্যস্ত, মাঝারি গড়নের শরীর অত্যধিক ঢোলা পোশাকে ঢাকা পড়েছে, পোশাকটির গায়ে জায়গায় জায়গায় লেগে আছে শুকনো রক্তের কালচে লাল দাগ। এক নজর দেখেই বোঝা যায় বেচারার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে – এবং ছোট খাট কাল বৈশাখী নয় – বরং একেবারে সিডড় বা নার্গিস জাতীয় মহা বিপর্যয়!

নিজের তথৈবচ হাল সত্তেও ঘরে ঢুকেই হাটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা, নিচু করে ফেলল মাথা। ঘরে আরও দুজন লোক রয়েছে – একজন মাঝ বয়েসি, বেশ লম্বা এবং হাল্কা পাতলা, সে এক কোণে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যজন দেখার মত এক চরিত্র – অসম্ভব রকমের বেঁটে এবং মোটা, কুচকুচে কালো গাত্রবর্ণের বয়স্ক একজন মানুষ, যার মাথায় একটাও চুল নেই – মসৃণ টাক আবছা আলোতেও চকচক করছে। বিশাল ভুঁড়ি এবং চর্বি সর্বস্ব ধড় হলেও হাত-পা গুলো তার সরু কাঠির মতই চিকন, এই বৈসাদৃশ্য তার অবয়বের অস্বাভাবিকতায় একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

অনেক বয়স লোকটির, দেহের চামড়া ঝুলে পড়েছে, তাতে সৃষ্টি হয়েছে হাজারো ভাঁজের। হাতের নখগুলি একটু বেশিই লম্বা তার, আর কেমন যেন শ্বাপদের নখের মত বাঁকানো। এই মূহুর্তে একটা বড় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে সে। পরনে বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে, কেবল কোমরের কাছে একটা কৌপিন জড়ানো আর গলায় একটা বেঢপ আকৃতির মালা শোভা পাচ্ছে – কালো রঙের কোন কাঠের গোল গোল চাকতির মাঝে ফুটো করে মোটা সুতোয় গেঁথে তৈরি হয়েছে মালাটি।

প্রথম লোকটা রুমে ঢোকার পর পরই আরও একজন এসে দাঁড়ালো দরজার চৌকাঠে – এ আর কেউ নয়, গৃহকর্তা অতিরিক্ত সচিব স্বয়ং, "বাবা কি কিছু খেতে ইচ্ছে করেন?" অত্যন্ত সমীহ মেশানো স্বরে আরাম কেদারায় বসে থাকা অদ্ভুত লোকটিকে প্রশ্ন করল সে।

উত্তর দিল কোণে দাঁড়ানো লম্বা লোকটি, "বাবা যা খেতে ইচ্ছা করেন তাতো এখনও যোগাড় করতে পারো নাই! অন্য কিছু লাগলে বাবা নিজেই জানাবেন – আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে না! যাও, না ডাকলে আর আসবে না!"

"জী ভাই! ভুল হয়ে গেছে!" বলে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলো বেচারা অতিরিক্ত সচিব, ভক্তিভরে চাপিয়ে দিল দরজাটা।

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বসে থাকা বুড়ো, তারপর খনখনে গলায় কথা বলে উঠল, "আবার কি ভজঘট পাকিয়েছিস?" মানুষ তো নয় যেন ব্যাঙ ডাকল – ভীষণ রকমের তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ বুড়োর গলা।

মাথা নিচু করে থাকা লোকটা নিচু এবং জান্তব একটা শব্দ করল – তারপর চাইলো মুখ তুলে। সাধারণ কেউ উপস্থিত থাকলে নিঃসন্দেহে চমকে উঠত – কারণ মুখের ওপর এসে পড়া আবছা আলোতে লোকটার যে চেহারা দেখা গেলো তা আর যাই হোক, কোন মানুষের মুখ হতে পারে না।

আদলটা যদিও মানুষেরই বটে, কিন্তু হনুর হাড় অনেক বেশি উঁচু, নিচের চোয়াল থেকে ওপরের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দু'টো হলদেটে শ্বদন্ত। নাকের জায়গাটা চ্যাপ্টা, প্রায় সমান – নাসিকাগহ্বর দু'টি বিকট ভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু তারথেকেও বেশি নজরে আসে ধক ধক করে জ্বলতে থাকা রক্তলাল দু'টি চোখ আর তাতে বিদ্যমান বুনো জন্তুর হিংস্র দৃষ্টি।

অবশ্য পেট মোটা বুড়োর দিকে তাকানোর সময় তার চোখ থেকে হিংস্রতা বিদায় নিয়ে একটা ম্রিয়মান ভাব ফুটে উঠল – কোণঠাসা জানোয়ার ভয় পেলে যেরকম করে অনেকটা সেরকম।

"তোর চেহারা ঠিক কর!" রাগী স্বরে ধমকে উঠল বুড়ো।

"পারছি না হুজুউর!" ফেঁসফেঁসেগলায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে জবাব এল।

"হুহ!" গর্জে উঠল বুড়ো, "কি হয়েছিল?"

"ওখানে বাইরের লোক চলে আসে, আমাকে অনেকগুলো গুলি করেছে হুজুর, পিছিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না!"

"কী!" ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে গেলো বুড়ো – মাত্র চারফুট লম্বা, বেঢপ দেহটার পক্ষে অসম্ভব দ্রুত গতিতে চলে এল হাঁটু গেড়ে থাকা মানুষ সাদৃশ্য জীবটির কাছে। হাতের বাঁকা নখগুলো ঝলসে উঠল তার, আঘাত হানলো -ছিটকে বেরিয়ে এলো অনেকখানি রক্ত!

###

ক্লান্ত দেহে হাসপাতালের সামনে এক চায়ের স্টলে দাঁড়িয়ে আছে কায়েস। ওর সামনে গম্ভীর মুখে পায়চারী করছেন রবিউল আলম – ওসি মোহাম্মদপুর থানা।

ওসি সাহেবের ডান হাতে চায়ের কাপ – কিন্তু চুমুক দেবার কথা ভুলে গেছেন তিনি। বাম হাতটা শরীরের পিছে নিয়ে রেখে একবার সামনে যাচ্ছেন আবার পিছে আসছেন আর একটু পর পর মাথা নাড়ছেন প্রবল বেগে। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে কায়েসের নাকের সামনে চায়ের কাপটা নাচালেন তিনি – তারপর বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "এত প্রশংসা তোমার শুটিঙয়ের, এত নাম ডাক! আর কিনা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে একটা ক্রিমিনালকে খোড়া করে দিতে পারলে না! ছিহ! ছিহ! ছিহ! লজ্জা লজ্জা – আর আমি এদিকে তোমার ওপর ভরসা করে কেসের পুরো দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলাম!"

"রবিউল ভাই," কায়েসের কণ্ঠ বরফের মত শীতল, "আপনি কি তদন্ত করতে চান, নাকি ভাঁড়ামি? যদি নাটক করাই আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে কাল সকালেই এফডিসিতে চলে যান –

আপনার যা চেহারা, কোন বাংলা সিনেমার ভিলেনের নাটুকে চামচার পার্ট পেলেও পেয়ে যেতে পারেন!"

থতমত খেয়ে থেমে গেলেন ওসি রবিউল আলম, কেশে গলাটা পরিস্কার করতে গিয়েই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেলো হাতের চায়ের কাপের কথা – এক চুমুকে গিলে নিলেন ঠান্ডা হয়ে আসা তরলটুকু। তারপর কুঁচকে ফেললেন নাক মুখ – অবশ্য তা বিস্বাদ চায়ের কারণে নাকি কায়েসের হুল ফোটানো কথার জ্বালায় তা বোঝা গেলো না। "তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে আসলেই তোমার গুলিটা লেগেছিল লোকটার গায়ে?" ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

"আপনার কি মনে হয় – এই মধ্যরাতে আমি আপনার সাথে ইয়ার্কি করার জন্যে গল্প ফেঁদে বসেছি?" পাল্টা প্রশ্ন কায়েসের, একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল, "আর গুলিটা নয়, গুলিগুলো!"

"গুলো?"

"সঠিকভাবে বলতে গেলে তিনটা – আগেও একবার বলেছি আপনাকে!" অসহিষ্ণু গলায় বলল কায়েস, "এবং প্রত্যেকটাই লেগেছে জায়গা মত।"

"কিন্তু হাঁটুতে গুলি খেয়েও একটা লোক ছুটে পালায় কি করে? এতো অসম্ভব ব্যাপার!" মাথা নাড়লেন রবিউল।

"তা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই বটে," সায় দিলো কায়েস, কিন্তু কোন কিছু যদি নিশ্চিত ভাবে ঘটে থাকে তাহলে তাকে যতই অস্বাভাবিক দেখাক – তা ঘটেছে সেটা তো আর অস্বীকার করা যায় না, নাকি?"

"আচ্ছা মানলাম, হয়ত কোন বিশেষ ড্রাগ নিয়ে এসেছিল লোকটা তাই গুলির ট্রমা অগ্রাহ্য করেছে। যদিও বিশ্বাস যোগ্য না কিন্তু এই মূহুর্তে তো আর কিছু মাথায় খেলছে না।"

"ড্রাগের ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি – কিন্তু মনে হয় না ওটা ঘটেছে," বলল কায়েস, "ব্যাথা বা ট্রমা হয়ত ড্রাগ সেবন করে চাপা দেয়া যেতে পারে, কিন্তু হাঁটু ভেঙ্গে গেলে তো দাঁড়ান ফিজিক্যালি ইম্পসিবল। কোন ওষুধই তা করতে পারবে না।"

"বাহ এখন তো খুব বলছ 'ফিজিক্যালি ইম্পসিবল' কিন্তু আমি যখন বললাম তিনটা গুলি খেয়ে দৌড়ে পালানোটা সম্ভব না, তখন তো খুব কচকচানি শোনালে।"

"দেখেন ভাই, আপনি জানেন আমি ফালতু কথার লোক না তারপরও কেন শুধু শুধু তেনা পেচাচ্ছেন?"

"আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝলাম! তা তোমার ব্যাখ্যাটা কি, শুনি?" প্রতিআক্রমণ করলেন রবিউল।

ইতস্তত করল কায়েস, "এই মূহুর্তে কোন ব্যাখ্যা আমি দিতে পারছি না, তবে একটু পরে একজনের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলে দেখি সে কিছু জানাতে পারে কিনা?"

"কার কথা বলছ?" চোখ সরু করে জানতে চাইলেন রবিউল।

"বছর চারেক আগের গাজীপুরের ওই কেসটার কথা আপনার খেয়াল আছে?" পাল্টা প্রশ্ন কায়েসের।

“ওহ মাই গড! তুমি কি ওইরকম কিছু সন্দেহ করছ নাকি?” ভীত স্বরে জানতে চাইলেন রবিউল, গলা কাঁপছে তাঁর।
“সন্দেহ না, আমি মোটামুটি নিশ্চিত – তাই এখন এক্সপার্টের সাথে দেখা করতে যাব।” মোটরবাইক স্টার্ট দিতে দিতে বলল কায়েস, তারপর তাকালো ঘড়ির দিকে, “এহহে দেরী হয়ে যাচ্ছে!”
“দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমাকে একটু বুঝতে দেও ব্যাপারটা – তুমি কি ওইলোককে এই কেসে টেনে আনতে চাচ্ছ নাকি?”
“তাছাড়া আর কোন উপায় কি আছে?”
“কিন্তু,” দ্বিধা করলেন রবিউল, “ওর নামে তো অনেক ক্রিমিনাল রিপোর্ট আছে – বিশেষ কিছু অসুবিধা থাকায় আর তোমার সুপারিশের কারণেই এখনও ওকে অ্যারেস্ট করা হয়নি।”
“পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কপাল ভালো যে সে চেষ্টা নেবার মত বোকামি কেউ করেনি।”
চাঁছাছোলা কণ্ঠে জবাব দিল কায়েস, “আর যতই রেকর্ড থাকুক, সে আসলে কেমন মানুষ তা আমার মত আপনিও জানেন। ভয়ঙ্কর নিঃসন্দেহে কিন্তু লোক খারাপ না; এবং যা ভাবছি ঘটনা যদি আসলেই সেরকম হয়ে থাকে তাহলে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা এর সমাধান করতে পারবে।”
“পরিস্থিতি কি এতটাই খারাপ মনে হচ্ছে?” রবিউলের স্বর এবার প্রায় কাতর শোনালো।
“সত্যি বলতে কি, রবিউল ভাই,” এবার কায়েসের গলাতেও আশংকার ছোঁয়া, “আমার মনে হচ্ছে অবস্থা আমি যতটা ভাবছি তারথেকেও অনেক বেশি ভয়াবহ। যাই হোক সাবধানে থাকবেন, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, চললাম।” বাইকের মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠে গেলো ও, পেছন চিন্তিত ভঙ্গিতে, ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন রবিউল আলম।

###

আসলেই দেরী করে ফেলেছে কায়েস – গন্তব্যে যখন পৌছল তখন ঘড়িতে সময় রাত একটা বেজে চার মিনিট। জায়গাটা বনানীর কাছকাছি একটা গলির মুখের চায়ের দোকান, এই সব দোকানগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমে এল কায়েস, বুড়োমত এক লোক বসে আছে দোকানে – কোন কাস্টমার নেই, এত রাতে সব সময় খদ্দের থাকবে এমনটা অবশ্য আশাও করা যায় না।
“চাচা কেমন চলছে আপনার,” কুশল বিনিময়ের ভঙ্গিতে জানতে চাইলো কায়েস, তারপর সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় চলে এল, “অবলালের আসার কথা ছিল, চলে গেছে নাকি?”
“এই তো আপনাগো দোয়াতে চলতেছে কোনরকম,” ফোকলা দাঁতে হেসে উত্তর দিল বুড়ো, “হ, আবলাল সাব তো আইছিল, কিন্তুক গেছে গা এই দুই তিন মিনিট হইলো!”

“জানতাম!” স্বগতোক্তি করল কায়েস, “কোনদিকে গেছে?”
আঙ্গুল তুলে গলির ভেতরে দেখালো বুড়ো। মাথা ঝাঁকিয়ে তার দেখানো দিকে দৌড় দিলো কায়েস, তাড়াহুড়াতে বুড়োকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে
গেছে। ওর ভালোই জানা আছে এখন ধরতে না পারলে আবার অবলালের দেখা পেতে কমপক্ষে একদিন লাগবে।
ছুটতে ছুটতে অন্ধকার গলির ভেতরে এদিক ওদিক তাকাল কায়েস – আশপাশের বাড়িগুলো থেকে আবছা আলো এসে একটা আলোআঁধারির সৃষ্টি হয়েছে, একজন মানুষ কে খুঁজে পেতে তা যথেষ্ট, কিন্তু কাউকে নজরে পড়ল না ওর। গলিটা প্রায় সোজা, এবং বেশ লম্বা – মাত্র দু’তিন মিনিটে কারো পক্ষে এই গলিতে হারিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, যদি না সে কোন বাড়িতে ঢুকে গিয়ে থাকে। কিন্তু কায়েসের জানামতে এদিকের কোন বাড়িতে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন অবলালের নেই।
হতাশ মনে ছোটার গতি কমিয়ে এনে শেষে থেমে দাঁড়াল কায়েস – রাগ লাগছে রবিউল আলমের ওপর, উনি দেরি করিয়ে না দিলে ও সময় মতই আসতে পারত। অবলাল যে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে চলে সে ব্যাপারে ভালোই জানা আছে কায়েসের, দেরীতে এলে যে তাকে পাওয়া যাবে না তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল ও। তাই ঝড়ের বেগে বাইক চালিয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না! এখন এরকম নাজুক পরিস্থিতিতে একদিন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে – তাও যদি কপাল ভালো হয়।
তিক্তমনে মাটিতে একবার পা দাপিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেল কায়েস। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বামে একটা বাড়ির গেটের কাছে ছায়াটা যেন একটু বেশি গাড়। ও ঘুরতে শুরু করার প্রায় সাথে সাথেই সেই ছায়া থেকে অত্যন্ত ক্ষিপ্র আর একটা ছায়া বেরিয়ে ওর দিকে ছুটে এল।
আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে ঝট করে কায়েসের হাত চলে গেলো হোলস্টারে, চোখ ধাঁধানো বেগে ড্র করল ও, কিন্তু প্রতিপক্ষের গতি আরও বেশি। ওর পিস্তল পুরোপুরি খাপমুক্ত হবার আগেই চকচকে, লম্বা, ইস্পাতের ক্ষুরধার একটা পাত ওর গলা স্পর্শ করল। একই সঙ্গে গম্ভীর একটা চাপা কণ্ঠের সতর্কবাণী শোনা গেল, “নড়বে না!”

সাত

মানুষের শরীরে গলার গুরুত্ব অপরিসীম – ধড় মাথার এই সংযোগ স্থলটি খুব নাজুকও বটে। প্রতিপক্ষের গলা লক্ষ্য করে আক্রমণ শানানো প্রাচীনকাল থেকেই যোদ্ধাদের মাঝে জনপ্রিয় কৌশল, কারণ গলা এমনই একটা জায়গা যেটাকে বর্ম বা আচ্ছাদন দ্বারা সুরক্ষিত করা বেশ কঠিন। কারো গলায় যখন একটা ধারালো অস্ত্র ধরে রাখা হয় তখন ভুক্তভোগীর জীবন আর মৃত্যুর মাঝের দুরত্বটা খুবই কমে আসে। সামান্য একটু চাপ, ব্যাস আর দেখতে হবে না! স্বভাবতই এহেন পরিস্থিতিতে যে বেচারা পড়ে, সে ভয় পেলে দোষ দেয়া যায় না; বরং তার আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কায়েস সাহসী লোক, কিন্তু তাই বলে বোকা নয় – কতটা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে সে ব্যাপারে ওর কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। কিন্তু আপাত ভয়াল এই পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে বরং ঠোঁট মুড়ে হাসল ও। না পাগল হয়ে যায়নি সে, কিন্তু আক্রমণকারীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছে। সাবধানে, মোটেও নড়াচড়া না করে কথা বলে উঠল ও, "অবলাল, আমি! আমি কায়েস! এবার দয়া করে তোলোয়ারটা সরাও, আর একটু হলেই তো মেরে ফেলেছিলে!"

মারাত্মক অস্ত্রটার মালিকের মাঝে ওটা সরানোর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। "সত্যিই তুমি কায়েস হলে ভয়ের কিছু নেই!" আবেগহীন গলায় কথা গুলো উচ্চারণ করল সে।

"কি বলতে চাচ্ছ?" কায়েসের কণ্ঠে রাগের ছোঁয়া, "দেখতে পাচ্ছ না আমাকে?"

"শুধু দেখে সব সময় নিশ্চিত হওয়া যায় না," শীতল জবাব এলো, "যাচাই করে দেখতে হয়।"

"যাচাই করবে?" অস্বস্তি বোধ করছে কায়েস, "কীভাবে?" কোন জবাব এলো না, কিন্তু ওর আরও কাছ ঘেঁসে এলো তলোয়ারধারী। আবছা আলোতেও এখন তার মুখ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে কায়েস – সুদর্শন একটা শ্মশ্রু মন্ডিত মুখ, তবে গম্ভীর - অবলালই বটে!

সরাসরি কায়েসের দিকে তাকালো অবলাল, স্থির এবং পুর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে। ওর সেই চাহনিতে কি যেন একটা আছে – এমন কিছু যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অদৃশ্য, আজনা কোন তীব্র শক্তি যেন প্রবাহিত হচ্ছে ওর চোখ থেকে, ঢুকে যাচ্ছে কায়েসের ভেতরে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টির সামনে নিজেকে বড়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হলো কায়েসের, ও যেন বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া খড়কুটো, সামান্যতম প্রতিরোধ শক্তিও নেই ওর। শরীরটাকে সিসার মত ভারী মনে হতে লাগলো, যেন গভীর জলে তলিয়ে গেছে, হাত পা'গুলো অবশ হয়ে আসছে, কাঁপছে হাঁটু। পড়েই যেত কায়েস কিন্তু যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে উবে গেলো অনুভূতিটা; চোখ সরিয়ে নিয়েছে অবলাল। তলোয়ারটাও আস্তে করে সরিয়ে নিল এবার, তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, "পরের বার সময় মত এসো।"

"তুমি..." হাফাচ্ছে কায়েস, "তুমি... মাত্র ওটা কি করেছ?" ভাঙ্গা গলায় জানতে চাইল ও।

জবাব দিল না অবলাল, কোমরের বেল্ট থেকে একটা অদ্ভুত একটা খাপ বের করে তাতে ভরে ফেলল তলোয়ারটা – ব্যাস, মূহুর্ত আগের ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রটা রুপান্তরিত হলো নিরিহ দর্শন এক ছাতায়!

ইতিমধ্যে কিছুটা সামলে নিয়েছে কায়েস, তবু যখন কথা বলল, ফ্যাসফ্যাসে শোনালো ওর কণ্ঠ, "ঢাকার রাস্তায় দুই এক মিনিট দেরী হতেই পারে, তার জন্যে এত সিরিয়াস হলে কি করে হবে? একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।" বিরক্তি চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না ও।
"শুধু সামান্য দেরীর জন্যে তোমাকে আক্রমণ করিনি আমি," ঠান্ডা গলায় বলল অবলাল, একটু থেকে যোগ করল, "তোমার ওপর যক্ষের প্রাভাব প্রভাব দেখা যাচ্ছে! এবং বেশ বড় ধরনের প্রভাব – এ অবস্থায় অসতর্ক হওয়া আমার পক্ষে অনুচিৎ; ওই ভাবে চললে বহু আগেই মারা যেতাম আমি।"
"কিসের প্রভাব?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল কায়েস।

###

অতিরিক্ত সচিবের বাড়িতে নাটক জমে উঠেছে। আধো অন্ধকার ঘরের মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছে মানুষ সদৃশ্য সেই রক্তাক্ত পোশাক পরা জীবটা। ওটার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে বেঁটে এবং মোটা বুড়ো। বুড়োর বাম হাতের নখ গুলোতে লেগে আছে তাজা রক্ত, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে মেঝেতে লাল কার্পেটের রঙের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে।
"হারামজাদা! – কাজ সমাধা না করে ফিরে এলি কোন সাহসে?" কর্কশ এবং চিকন গলায় গর্জে উঠল বুড়ো। চোখ দু'টো তার ভাটার মত জ্বলছে। হিংস্র চেহারায় ভূপতিত দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।
"বাবা! বাবা! শান্ত হোন," ক্ষীণ গলায় পাশ থেকে প্রতিবাদ করল লম্বা লোকটা, "আর মারলে মরে যাবে বেচারা!"
"চুউপ!" ধমকে উঠল বুড়ো, "খবরদার বেশি কথা বলবি না! তুইই তো যত নস্টের গোড়া! সামান্য একটা কাজ ঠিকমত করতে পারিসনি বলে আমাকে এই ইটের জঙ্গলে ছুটে আসতে হয়েছে! তোর কি কোন ধারণা আছে আমরা যা করছি তার গুরুত্ব সম্পর্কে? জানিস, যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ওই ছোকড়ার জ্ঞান ফিরলে কতবড় সমস্যা তা কি এখন আমাকে গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে? আর এই হারামখোর ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে!" এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফাতে লাগল বুড়ো।
মীনমীনে স্বরে প্রতিবাদ করল লম্বা লোকটা, "আমার ভুল হয়ে গেছে বাবা, এইরকম একটা ব্যাপার যে কাজটায় ব্যাঘাত ঘটাবে তা তো আমি জানতাম না!"
একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল, "আর আপনি চাইলে ওকে এখনই মেরে ফেলতে পারেন কিন্তু তাতে তো আর কাজের কাজ কিছু হবে না। তার থেকে ওর কথা শুনে দেখুন আসলে কি হয়েছে?" বুড়োর মৌনতাকে সম্মতি ভেবে গলায় কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো তার।
এবার আগের থেকে অনেক বেশি দ্রুত নড়ল বুড়ো – আগেরবারের ক্ষিপ্রতা তার বেঢপ দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনক হলেও একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে পাল্লা দেয়া খুব একটা কঠিন হত না। কিন্তু এবার সে যা করল তা এককথায় অবিশ্বাস্য; আবছা ভাবে নড়তে দেখা গেল

তাকে, যেন ফ্যাস্ট ফরোয়ার্ড করা চলচিত্র, তারপরই দেখা গেল লম্বা লোকটার গলায় চেপে বসেছে বুড়োর তীক্ষ্ণ নখর যুক্ত আঙ্গুলগুলো। নিজে বেঁটে বামুন হবার দরুন হাত টান টান করে রাখতে হয়েছে বুড়োকে তারপরও কোনমতে নাগাল পেয়েছে – দৃশ্যটা হাস্যকর হতে পারত কিন্তু ওই ধারাল নখগুলি গলার প্রধান রক্ত বাহী শিরার ওপর চেপে থাকার মাঝে আর যাই থাকুক, হাসির কিছু নেই।

টেনে ছেড়ে দেয়া তারের মত থরথর করে কাঁপতে লাগল লম্বা লোকটা, ভয়ে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কথা বলার জন্যে মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেলল সে, পাছে নড়াচড়ায় কণ্ঠা ফুলে উঠলে যদি নখ গেঁথে যায়!

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বুড়ো, এখন আগের থেকে মোটা শোনাচ্ছে তার কণ্ঠ, "মুখে মুখে কথা বলার অভ্যাস তোর মত সভ্য জগতে চলা বায়রান হয়ত সহ্য করে, কিন্তু আমি বায়রান নই! আমার সাথে এইরকম সুরে কথা একবার বলেছিস, ছেড়ে দিচ্ছি - দ্বিতীয়বার যেন কোন ভুল না হয়।" আস্তে করে পিছিয়ে এলো সে, ফিরে গিয়ে বসে পড়ল আগের জায়গায়। ওদিকে লম্বা লোকটাও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে এখনো। ঘৃণাভরে মুখ বিকৃত করল বুড়ো, "কি যুগ আসল, এই সব আনাড়িকে নিয়ে কাজে নামতে হয়! এর থেকে ভালো কাউকে আর খুঁজে পেলো না বায়রান!" অবজ্ঞা আর বিরক্তি ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে।
"হুজুউর," ভাঙ্গা গলায় বলল মেঝেতে পড়ে থাকা জীবটি, "আমাকে এবারের মত মাফ করে দিন! যে লোক ওখানে ছিল সে বড় শক্ত লোক!"
নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল বুড়ো, বলল, "কি হয়েছিল খুলে বল!"

কোনমতে উঠে বসল রক্তাক্ত বক্তা, এখন আর তাকে দেখতে জন্তুর মত লাগছে না – বরং মানুষের সাথে কোন পার্থক্যই নেই চেহারায়। "পুলিশের লোক," বলল সে, "আজ বিকেলে ওই লোকই এসেছিল চেম্বারে। খুব দ্রুত পিস্তল চালায়, আর গুলি লাগাতে পারে একেবারে জায়গমত – কাছেই ঘেঁষা যায় না হুজুউর!" বিলম্বিত ভঙ্গিতে টেনে টেনে বলল সে।

"পুলিশ! হুহ!" তাচ্ছিল্যের সাথে নাক সিটকালো বুড়ো, কিন্তু পরমূহুর্তে আবার গম্ভীর হয়ে গেল, "এখন নিশ্চয়ই ওই ছেলের ঘরে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেবে ব্যাটারা! এমনিতে পুলিশ কোন সমস্যা না, কিন্তু যদি বেশি আঁট ঘাট বেধে কাজে নামে তাহলে অন্য কথা – বড় ধরনের কোন গোলমাল হলে সবাই জেনে যাবে আমরা কি করতে চাচ্ছি আর তাহলে নরকে গিয়েও পালাতে পারব না!" স্বগতোক্তির ঢঙ্গে বলল সে, "সমস্যাই দেখছি!"
"তুই ওই পুলিশ ব্যাটার ব্যাপারে কিছু জানিস, সোবাহান?" লম্বা লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল এবার বুড়ো।

“তেমন কিছু না, বাবা!” আগের থেকে ভক্তিভাব অনেক বেড়ে গেছে সোবাহানের গলায়, “দুলু আমাকে বলেছিল ব্যাটা জেরা করায় ওস্তাদ, তাই ও আসার আগে নিজেকে সম্মোহন করে নিয়েছিলাম যাতে বেফাঁস কিছু না বলে ফেলি। তাই ওই সময় কি করেছিলাম ভালো মনে নেই – এইটুকু জানি ওর নাম কায়েস আর মোহাম্মদপুর থানায় বসে।
“আরে মুর্খ!” ক্ষ্যাপে ক্ষেপে গেলো আবার বুড়ো, “তোদের মত আনাড়িদের নিয়ে কাজ করাই আমার কাল হবে! হতভাগা! কিছু জানিস মানে কি নাম ঠিকানা জানতে চাইছি নাকি? ওগুলো কি আমাদের কোন কাজে আসবে? আমি জানতে চাইছি এমন কিছু আছে কিনা যা দিয়ে আমি ওকে খুঁজে বের করতে পারব। ওর ব্যবহার্য জিনিষ – যেমন রুমাল বা কলম বা টুপি। আছে সেরকম কিছু?”
একটু ভাবল সোবাহান, “না বাবা, ওর একটা ভিজিটিং কার্ড ছাড়া আর কিছুই নেই।”
“ওতেই হবে! দে এদিকে!”

###

“যক্ষ, হিন্দু পুরাণে ওদের কথা আছে, পড়েছ নাকি? গ্রাম্য ভাষায় অনেকে ‘যক’ বলে!” স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল অবলাল। কথাগুলো এমনভাবে বলছে যেন বাজারের দ্রব্যমুল্যের উর্ধগতি নিয়ে ক্রুদ্ধ এবং তা নিয়ে একটু চড়া মেজাজে আলোচনা করছে, অথচ যে বিষয়ে কথা বলছে তা কতটা অদ্ভুত সে ব্যাপারে ওর নিজেরই ধারণা আছে কিনা সন্দেহ হলো কায়েসের। কয়েক মিনিট আগের সেই ভীষণ দৃষ্টির রেশ এখনো পুরো কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে, ধীর গতিতে অবলালের পেছনে হাঁটছে এখন, আর শুনছে ওর কথা।
“তোমার আসতে দেরী হবার কারণে আমি আমার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে মিটিং লোকেশন থেকে একটু সরে যাই – কারণ আমার লাইনে সতর্কতায় মূহুর্তের জন্যে ঢিল দিলে মৃত্যু ঘটতে পারে।” লম্বা লম্বা পা ফেলে গলির মুখের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল অবলাল। “কিন্তু পরে যখন যক্ষের প্রভাবটা নজরে পড়ল তখন একটু বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা নিতেই হলো, আর কোন উপায় ছিল না।”
কথাগুলো পরিস্কার না বুঝলেও প্রতিবাদ করল না কায়েস। ও জানে এসব ব্যাপারে অবলালের ওপর নির্ভর করা যায়। সামনে হাঁটতে থাকা লোকটাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল ও, কোন মানুষের মাঝে এতটা পৌরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। কায়েসের নিজের থেকে ইঞ্চি দেড়েক খাটই হবে অবলাল উচ্চতায় – তার মানে পাঁচ ফুট নয়ের মত, কিন্তু হঠাৎ দেখলে ঠিক কি কারণে বলে বোঝানো যাবে না, ওকে আরও অনেক বেশি লম্বা মনে হয়। সরু কোমর আর চওড়া কাঁধ, পেশিবহুল, সুগঠিত, দীর্ঘ হাত পা, গভীর প্রশস্ত বুক, এক ছটাক চর্বি নেই কোথাও! সব মিলে দেখেই বোঝা যায় চিতার ক্ষিপ্রতা আর সিংহের শক্তি রয়েছে ওর দেহে। একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস গোপন করল কায়েস, ওর নিজের স্বাস্থ্য খারাপ না – যদিও চিকনের দিকে, কিন্তু সরু কাঠামোতেও যথেষ্ট শক্তি ধরে, তাছাড়া ক্ষিপ্রতা ওর সহজাত গুন আর হালকা

পাতলা হবার দরুন গতির ওপরই নির্ভর করতে বেশি পছন্দ করে ও। কিন্তু একটু আগেই দেখেছে অবলালের কাছে ও একটা বাচ্চার মত অসহায়। যে পেশায় নিয়জিত আছে তাতে কায়েসকে প্রায়শই ভায়োলেন্ট পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় – এবং সেজন্যে শরীরকে ফিট এবং রেডী রাখা খুবই জরুরি। কিন্তু শুধু সে জন্যে নয় – ওর রক্তের একেবারে গভীরে মিশে আছে লড়াই, কৌশল আর অস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, যার ফলেই পুলিশে চাকরি নিয়েছে; এই পেশায় থাকলে এসব চর্চার কিছু বাড়তি সুযোগ পাবে এই আশায়। প্রথমে অবশ্য সেনা বাহিনীর কথা ভেবেছিল, কিন্তু অতিরিক্ত নিয়মানুবর্তিতা সহ্য করতে পারবে না এটা বুঝে মত পরিবর্তন করেছে।

এটা ঠিক যে যতটা ভেবেছিল বাস্তবে পুলিশে চাকরি করে ততটা ফায়দা হয়নি। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মত অতটা আধুনিক প্রশিক্ষন এদেশের পুলিশরা পায় না। অনেক ধরনের ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটিই নেই বা থাকলেও হয়ত যথাযথ ব্যবহার হয় না। কিন্তু তারপরও যা পেয়েছে তাতে কায়েস সন্তুষ্ট। ওর অবস্থান থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু করা কঠিন হত। তাছাড়া পুলিশের চাকরি করার ফলে অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে অতটা ভাবতে হয় না। কায়েস অবশ্য সাধারণ ভাবে পুলিশ বাহিনীর যতটা দুর্নাম, ততটা অসৎ বা ঘুষখোর নয়, কিন্তু নিজেকে সে একেবারে ধোয়া তুলসিপাতাও দাবী করতে পারবে না। সাধারণত নিজের ন্যায্য আয়তেই চলার চেষ্টা করে থাকে, তবে ক্ষেত্র বিশেষে উপরির চিন্তাও করে – বিশেষ করে যখন ওর অস্ত্রের কালেকশনের জন্যে বা দুর্লভ বই কিনতে টাকার দরকার পড়ে তখন।

কায়েসের সাংঘাতিক বই পড়ার ঝোঁক, তবে গল্প উপন্যাস নয়, বরং ওর পছন্দের বিষয় - যেমন অস্ত্র, লড়াই বা রণকৌশল, মার্শাল আর্ট এবং অবশ্যই সাইকোলজির ওপর তথ্যভিত্তিক বই। এসব বইয়ের অনেক গুলোই দেশে দুস্প্রাপ্য বলে বিদেশ থেকে আনাতে হয় – দামও বেশ, সরকারি বেতন যা পায় তাতে কোনমতেই কুলানো সম্ভব না, তাই মাঝেসাঝে বাড়তি টাকার দিকে ঝুঁকে পড়তে হয় ওকে।

একই ভাবে ওর রয়েছে অস্ত্র কালেকশনের নেশা – পুলিশ হবার সুবাদে এবং ওপর মহলে দু'একজনের সাথে দহরম মহরম থাকায় কিছু অনুমতিও যোগাড় করেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। সেসব অস্ত্র কিনতেও মোটা টাকা ব্যয় হয়। তবে একটা বিষয়ের দিকে সব সময় টনটনে নজর রাখে কায়েস, তাহলো ওর উপরি ইনকামের চেস্টার ফলে যেন কোন নিরীহ লোকের ক্ষতি না হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন ঘুষ নিয়ে কোন কাজ করেছে – দেখা গেছে দুই পক্ষের লোকই দোষী এবং গন্ডগোলবাজ – এমন পরিস্থিতিতে টাকা নিয়ে মীমাংসায় সাহায্য করেছে ও। ওর মতে দেশ ও সমাজের বর্তমান অবস্থায় এর থেকে বেশি সততা দেখাতে যাওয়া বোকামি, কারণ গোটা সিস্টেমই যখন অসততা এবং দুর্নীতির কশাঘাতে জর্জরিত তখন একজন ব্যক্তি হঠাৎ র‍্যাডিক্যাল রকমের সৎ হয়ে গেলে তাতে পানি ঘোলা করা ছাড়া আর কোন কাজের কাজ হয় না। এমনিতেই অসামাজিক আচরণের জন্যে সহকর্মীদের কুনজরে আছে – তারওপর যদি আবার কট্টর ভাবে কিছু শুরু করে তাহলে আর দেখতে হবে না!

অবশ্য এই মূহুর্তে এসব নিয়ে ভাবছে না কায়েস। ওর দুতিন কদম সামনে থাকা অবলালের প্রতি সুক্ষ ঈর্ষা বোধ ছাড়া আর যে ব্যাপারগুলো ওর মনে রয়েছে তা হচ্ছে কৌতুহল আর দুশ্চিন্তা। কৌতুহল বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে অবলালের কি মত জানার আর দুশ্চিন্তা হলো অবলালের ভাবমূর্তি স্বাভাবিকের থেকেও বেশি গম্ভীর দেখে।

যদিও সহজ ভঙ্গিতে দৈনন্দিন আলাপের ঢঙে কথা বলছে অবলাল, কিন্তু ওর হাঁটার ভঙ্গি এবং গলার স্বরে মনে হচ্ছে আজকে যেন সে একটু বেশীই সতর্ক – অবশ্য সেটা কি করে সম্ভব তা বলতে পারবে না কায়েস; কারণ অবলালকে ওদের গত চারবছরের পরিচয়ে যতবার দেখেছে, সর্বক্ষণ সর্বচ্চো সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে সিরিয়াস ছিল অদ্ভুত লোকটা। অবলালের পরবর্তী কথায় চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেলো কায়েসের, "ঘটনাটা কি তা বোঝার জন্যে আগে তোমার দিকটা শোনা দরকার।"

"তা তো বটেই," সায় দিল কায়েস, "আসলে কোথা থেকে শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না..."

"এখানে নয়!" ওর দিকে ঘুরে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল অবলাল, এক মূহুর্ত ভাবলো কি যেন, তারপর বলল, "আজকে রাতটা বরং আমি তোমার সাথে থাকি – তোমার বাসায় বসে বিস্তারিত শোনা যাবে। তাছাড়া ভাব গতিক সুবিধার লাগছে না – যদি কোন সমস্যা হয়, আমি থাকলে সেদিকটাও দেখতে পারব।"

"নিজেকে সামলে রাখার ক্ষমতা আমার আছে!" বলল কায়েস।

স্বভাব বিরুদ্ধ এক চিলতে হাসি দেখা দিল অবলালের ঠোঁটের কোণে, ক্ষণিকের জন্যে ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো দৃষ্টি গোচর হলো, "হ্যাঁ, তা তো দেখলামই একটু আগে!"

খোঁচাটা হজম করতে কষ্ট হলেও মেনে নিল কায়েস কারণ মিথ্যে বলেনি অবলাল, "ঠিক আছে, চলো তাহলে আমার বাসায়, ওখানেই সব খুলে বলব।"

আট

রাতের শহর, তায় বৃষ্টি পড়ছে – ফাঁকা নির্জন রাস্তা দিয়ে ছুটছে কায়েসের মোটরবাইক, পেছনে অবলাল বসা – বৃষ্টির ছাঁট লাগছে ওদের গায়ে, কায়েসের পরনে বর্ষাতি রয়েছে; কিন্তু অবলাল ভিজে একশা হয়ে গেছে। অবশ্য তাতে ওর কোন ভাবান্তর হচ্ছে বলে মনে হয় না।
পিচ্ছিল রাস্তার তুলনায় একটু বেশিই জোরে চালাচ্ছে কায়েস – আসলে সে উদগ্রীব হয়ে আছে পরিস্থিতির একটা ব্যাখ্যা পেতে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই গন্তব্যে পৌছে গেল ওরা, গ্যারেজে মোটরবাইক রেখে বর্ষাতিটা খুলে, ভাঁজ করে, হাতে নিল কায়েস; লক্ষ্য করল অবলালের ভেজা জামাকাপড় থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। "তোমার শীত করছে না?" কিছুটা আশ্চর্য গলায় প্রশ্ন করল সে।
"শীত? না তো!" অবলাল নির্বিকার। মাথা নাড়ল কায়েস – এই লোকটার কাজকারবার সবসময়ই ওর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে – বেশ অনেকদিনের পরিচয় কিন্তু অবলালের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না ও। শুধু এটুকুই যে অবলাল একজন সাংঘাতিক লোক এবং আপাত দৃষ্টিতে যা অদ্ভুত আর অতিপ্রাকৃত সেসব ব্যাপার প্রগাঢ় এবং টনটনে জ্ঞান রাখে সে। প্রায় চার বছর আগে বেশ অদ্ভুত ভাবেই পরিচয় হয় ওদের – গাজীপুরে।
তখন কেবল একটা সাস্পেন্সশন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে কায়েস। এক রাজনৈতিক নেতার শ্যালককে ছাড় না দিয়ে বরং আরও কঠিন ভাবে ইন্টেরোগেট করেছিল – করবে নাই বা কেন? ওই নরপশুটাকে চোদ্দ শিকের মাঝে ঢোকাতে না পারলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেত কায়েস।
লোকটা ছিল একজন হোটেল ব্যাবসায়ী – কিন্তু ব্যাবসার আড়ালে চোরাচালন থেকে শুরু করে মাদক পাচার, নারী ব্যাবসা, জুয়ার আড্ডা পরিচালনা, ইত্যাদি হেন কুকর্ম নেই যেটা সে করত না। দীর্ঘদিন ধরে সে তার দুলাভাইয়ের ক্ষমতার জোরে এইসব কীর্তি চালিয়ে আসছিল, কিন্তু সেবার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা খুন করে বসে। অ্যারেস্ট হবার পরও তেমন বিচলিত হয়নি শয়তানটা – কারণ, স্বাভাবিক হিসাবে সে কয়েক দিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে যেত। কিন্তু কপাল তার খারাপ – কিংবা হয়ত ন্যাচারাল জাস্টিস; কেসটা পড়েছিল কায়েসের হাতে, এবং ওপর মহলের শত চাপেও কায়েস টলেনি বরং ওর নিজের কিছু চ্যানেল ব্যবহার করে কেসটাকে মজবুত ভাবে দাঁড়া করায়। ফাঁসিই হয়ে যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপের ফলে যাবজ্জীবন হয়।
কিন্তু ফলস্রুতিতে কায়েসকে সাস্পেন্ড করা হয়, এবং বার দুই ওর জীবনের ওপর হামলাও হয়েছিল। কয়েক মাস পর নিজেদের প্রয়োজনেই পুলিশ বাহিনী এক রকম দায়ে পড়েই ওকে পুনর্বহাল করে, কারণ ওর অনুপস্থিতিতে ইন্টেরোগেশন ডিপার্টমেন্ট এক রকম অচল হয়ে গিয়েছিল।

সে যাই হোক, নতুন করে অফিসে ফেরার পর হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে পড়ে ওর দায়িত্ব – সেইসাথে যত রাজ্যের বিদঘুটে, সমস্যাযুক্ত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভয়ঙ্কর কেস আসতে থাকে ওর ডেস্কে – আর দায়িত্ব পালন করতে ওকে ছুটে বেড়াতে হয় দেশের আনাচে কানাচে, প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে।

মোহাম্মদপুর থানার বর্তমান ওসি রবিউল আলম তখন গাজীপুরে কর্মরত – কায়েসের সাথে তাঁর আগে থেকেই সখ্যতা ছিল - যেটা বেশ বিরল একটা ব্যাপার। তো সেই শীতে একদিন হঠাৎ গাজীপুরে তলব পড়ে কায়েসের। একটা খুনের মামলার তদন্তের ভার নিয়ে।

###

খুনটা বেশ অদ্ভুত ভাবে সংগঠিত হয়েছিল – এবং কায়েসের ডাক পড়ার বোধহয় সেটাই ছিল কারণ। ভিক্টিম একজন ২২/২৩ বছরের তরুণী।

ঘটনাটা এরকমঃ

কয়েক দিন পুর্বে, রাতে খাবার পর ছাদে তার স্বামীর সঙ্গে হাঁটছিল সে – সদ্য বিয়ে করে কেবলই নাকি শহরের প্রান্তের ওই দোতলা বাড়িটাতে উঠেছে তারা।

স্বামীটির জবানবন্দি পড়ে কায়েস জানতে পারে যে ঠাট্টা মস্করা করতে করতে হালকা অভিমান করেছিল মেয়েটা – বাস্তবিক অভিমান নয়, বরং বরের সাথে সামান্য ঠোঁট ফুলানো। তার জের ধরে ছাদের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ায় সে, সম্ভবত স্বামী প্রবরের এসে মান ভাঙ্গানোর অপেক্ষাতে। যে ধারটাতে সে দাঁড়িয়ে ছিল – তার নিচে দিয়ে একটা সরু গলিপথ চলে গেছে মূল সড়কের দিকে। দাঁড়িয়ে নিচে তাকানোর কয়েক মূহুর্ত পরই হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটা, এবং পরমূহুর্তে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ভাগ্য আপাত ভালো ছিল বলতে হবে – মেয়েটা কিছুটা বেঁটে এবং ছাদের রেলিংটা বেশ উঁচু। তাই নিচে না পড়ে বরং রেলিং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে। ওদিকে চিৎকার শুনে স্বামীটি ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে এবং এযাত্রায় সে প্রাণে বেঁচে যায়। অবশ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

ডাক্তার ডেকে জ্ঞান ফেরাতে ঘন্টা দুয়েক লেগে যায় – ডাক্তার বলেন অতিরিক্ত ভয় পাওয়ার ফলে এমন হয়েছে। কিন্তু মেয়েটাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, কি দেখে সে ভয় পেয়েছিল? কোন সদউত্তর পাওয়া যায়নি। অবশ্য স্বামীটি ছেড়ে দেয়না – এবং অনেক চাপাচাপির পর মেয়েটা বলে যে সে নিচে একটা অপার্থিব এবং ভয়ঙ্ককর ছায়ামূর্তিকে দেখেছে। বর্ণনা জানতে চাইলে অবশ্য পরিস্কার করে কিছু বলতে পারে না। শুধু এটুকু জানা যায় যে লম্বাটে মুখ, রোমশ দেহ এবং ধক ধক করে জ্বলতে থাকা একজোড়া চোখের কথা।

এসব শুনে পাড়া প্রতিবেশি কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি – বিশেষ করে মহিলারা, যদিও বা কিছু কানাঘুষো করছিলেন – কিন্তু মেয়েটির শিক্ষিত এবং বাস্তববাদী স্বামী, যে কিনা পেশায় একজন

ব্যাঙ্কার, তেমন পাত্তা দেয়নি। বরং ডাক্তারের পরামর্শ মত সিডেটিভ দিয়ে স্ত্রীকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। কি না কি দেখে চমকে গেছে! নার্ভ ঠাণ্ডা হলে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিধিবাম! অফিস থেকে স্ত্রীর দেখাশোনা করতে সপ্তাহের বাকিটা ছুটি নিয়েছিল সে – কিন্তু পরের সপ্তাহের প্রথমদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরেই দেখতে পায় বউয়ের ছিন্নভিন্ন লাশ! রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। থানায় ডিউটি অফিসার ছিলেন রবিউল আলম স্বয়ং – ওনার তত্ত্বাবধানেই লাশ সরানো হয়। কায়েস এসে পৌঁছায় পরদিনে ভোরে – এবং বিলম্ব না করে ক্রাইমসীনটা দেখতে চলে যায়।

ঘরটাতে ঢুকেই থতমত খেয়ে যায় কায়েস। মর্গের দায়িত্বে থাকা লোকটি তখনও আসেনি বলে লাশ দেখার আগেই ক্রাইমসীন দেখতে চলে এসেছিল ও। শুনেছিল বটে যে সীনটা বেশ ব্রুটাল – কিন্তু এতটা আশা করেনি, ঘটনার সময় রক্ত যে পিচকারীর মত ছিটেছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে – দেয়াল, আসবাব পত্র থেকে শুরু করে বিছানার চাদর এবং আরও যা যা কাপড়ের তৈরি সবকিছুতেই রক্ত লেগে কালচে হয়ে গেছে।

মেয়েটির স্বামী এই দৃশ্য, তাও তাজা অবস্থায় এবং সঙ্গে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখে কি করে সহ্য করেছে ভেবে অবাক না হয়ে পারল না কায়েস। তবে ওর থতমত খাবার ব্যাপারটা শুধু রক্তের ছড়াছড়ির জন্যেই হয়নি।

ঘরটায় ঢোকার পর থেকেই একটা অদ্ভুত বোধ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ওকে। এর সাথে কোন পরিচয় নেই ওর – একবারেই নতুন একটা অনুভুতি। মনে হচ্ছিল যেন ওর চামড়ার নিচে কিলবিল করছে শত শত শুঁয়োপোকা, যেন এখনি ছিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে! শুধু তাই নয়, ওর মনে হচ্ছিল যেন চারপাশ থেকে কি একটা চেপে আসছে – গভীর জলে ডুব দিলে পর কানে যেমন চাপ অনুভুত হয় অনেকটা তেমনই।

সত্যি বলতে কি – উর্ধশ্বাসে দৌড়ে ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ঝোঁকটা রোধ করতে নিজের ওপর রীতিমত জোর খাটাতে হয়েছিল কায়েসকে।

এমনিতে ঘরটায় অস্বাভাবিক তেমন কিছু ছিল না, রক্তের দাগগুলো বাদে আরকি। কিন্তু ওই অদ্ভুত অনুভুতি কায়েসের মনে বেশ চাপ ফেলছিল – কথা প্রসঙ্গে সঙ্গে আসা একজন কন্সটেবলকে জিজ্ঞাসা করে ও, যে সে কোন বিচিত্র বোধের শিকার হচ্ছে কিনা। কিন্তু কন্সটেবল নির্বিকার, বরং কায়েসের দিকে ক্ষীণ সন্দেহের দৃষ্টিতে একবার তাকাতে ভোলেনি ব্যাটা!

ঘরটা খুঁটিয়ে দেখে কায়েসের যে বিষয়গুলোতে খটকা লাগল তার একটি হল, হত্যাকান্ড ঘটে গিয়ে থাকা সত্ত্বেও ঘরে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই – অথচ যেভাবে রক্ত ছিটেছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে খুনটি অত্যন্ত নৃশংস ভাবে করা হয়েছে।

তাছাড়া আরেকটি ব্যাপার খুবই অদ্ভুত – মেয়েটির স্বামীর দাবী অনুযায়ী, ঘরে ফিরে স্ত্রীকে মৃতা অবস্থায় আবিস্কার করার আগে সে নিজ হাতে চাবি দিয়ে বাসার সদর দরজা খুলেছিল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ওই একটি ছাড়া আর কোন পথ নেই ভেতরে ঢোকার। যে বাড়িটিতে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা যদিও পুরানো আমলের কিন্তু ইদানিং সংস্কার করে আধুনিক

একটা ধাঁচ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে – দোতলাটিকে দুই ইউনিট বিশিষ্ট একটি ফ্লোরে রুপান্তরিত করা হয়েছে। ফ্ল্যাটগুলি আর দশটি আধুনিক ফ্ল্যাটের মতই বেশ নিরাপদ – উল্টো পাল্টা কোন প্রবেশ পথ নেই। সংস্কারের কাজটি মাত্র কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছিল – এবং ওই দূর্ভাগা দম্পতিই ছিল প্রথম ভাড়াটিয়া; অপর ইউনিটটি সে সময় খালিই পড়ে ছিল। মোদ্দা কথা – দরজা জানালা কিচ্ছু ভাঙ্গেনি এবং ভেতর থেকে বন্ধও ছিল – কিন্তু তারপরও কোন ভাবে কেউ প্রবেশ করেছে এবং খুন করেছে একটি অসুস্থ এবং অসহায় মেয়েকে! শুধু তাই নয় – খুনের পর সে পালিয়েও গেছে!

পুরো কেসটাই গোলমেলে মনে হল কায়েসের কাছে – ভিক্টিমের স্বামীকে নিজে জেরা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে, কারণ জবানবন্দির ওপর নির্ভর করতে ও কখনোই ভরসা পায় না। তাছাড়া সব দেখে ওর মনে হল, এমনও হতে পারে যে খুনটা স্বামীটি নিজেই করেছে – কোন গোপন মোটিভ থেকে। বিশেষ করে সেই যখন প্রথম লাশ খুঁজে পেয়েছে – একটা গপ্প ফেঁদে বসা তার পক্ষে অসম্বভব না।

তবে জেরা টেরা করার আগে সরজমিনে লাশটা দেখা দরকার – তাই ঘরটা খুটিয়ে দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলো কায়েস; একই সঙ্গে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। ওই অদ্ভুত অনুভুতিটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে বড় স্বাধীন মনে হল ওর। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া ওই গা গুলিয়ে ওঠা ভাবটা যে আসলে কি ছিল, আর কেনই বা ও বাদে আর কেউ ওটা অনুভব করেনি তা নিয়ে বেশ চিন্তিত বোধ করছিল সে।

মর্গটা বেশি দূরে নয় – কিন্তু আগে একবার থানা হয়ে যাবে বলে ঠিক করল কায়েস, রবিউলকে ওর সন্দেহের কথাটা জানানো এবং স্বামীটির ওপর যাতে নজর রাখা হয় সে ব্যাবস্থা করতে বলাই ছিল ওর উদ্দেশ্য।

ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিয়ে মর্গে যাবার জন্যে ফের থানা থেকে বের হতে যাবে, এমন সময় প্রথম বারের মত লোকটাকে দেখে কায়েস। এতদিন হয়ে গেছে কিন্তু স্মৃতিতে আজও একবিন্দু ফেকাসে হয়নি ঘটনাটা।

এটা ঠিক যে তখন শীতকাল, কিন্তু লোকটি যে জ্যাকেট পরেছিল ওরকম পোশাক পরার মত শীত বাংলাদেশে পড়ে না। কালো, লম্বা ট্রেঞ্চকোট মার্কা জিনিষটা দেখলেই মনে হয় এর নিচে নিশ্চই কোন অস্ত্র লুকানো আছে। শুধু কোট নয় – আপাদমস্তকই কালো পোশাক ছিল লোকটার পরনে। চিতার মত সাবলীল তার হাঁটার ভঙ্গি – প্রত্যেকটা পদক্ষেপে যেন স্বাচ্ছন্দ্য আর আত্মবিশ্বাস ফুটে বের হচ্ছে।

কোন রকম দ্বিধা দন্ধ না দেখিয়ে সোজা রবিউল আলম আর কায়েস যে টেবিল ঘিরে বসে ছিল তার সামনে চলে এল লোকটি, "আপনি কি ওসি?" রবিউলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন রবিউল আলম, তারপর জোরে খাকারি দিয়ে গলা পরিস্কার করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "তা আপনি কে, আর কি দরকারে এসেছেন?"

"আমার নাম অবলাল," ঠাণ্ডা স্বরে উত্তর দিল আগন্তুক, "আর এসেছি গতকাল যে লাশটা মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়ছে তা পরিদর্শনের অনুমতি নিতে!"

এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন রবিউল, কিন্তু আগন্তুকের কথা শুনে ঝটকা মেরে পিঠ সোজা করে বসলেন। "আপনি কি সাংবাদিক?"

"জ্বি না।"

"তাহলে তো দেখা যাবে না।" একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন তিনি, "যে কেউ এসে চাইলেই তো আর একটা মার্ডারড বডি দেখতে দিতে পারি না।"

"দেখুন," আগন্তকের গলা শীতল, "আমি 'যে কেউ' নই – একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই লাশটা দেখা আমার খুব দরকার।"

"কি প্রয়োজন?" এবার কায়েস প্রশ্ন করল।

আস্তে করে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালো অবলাল, "আপনি কে?"

মেজাজ খিচড়ে গেলো কায়েসের, কোথাকার কোন উটকো লোক থানায় এসে উল্টো পুলিশের পোশাক পরা একজনকে জেরার ঢঙ্গে প্রশ্ন করছে! আস্পর্ধা তো কম না! তবে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করল ও, দেখাই যাক না কি চায় ব্যাটা! "আমার নাম কায়েস, কায়েস হায়দার। আমি এই কেসটার ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার। তা এখন বলুন কি ফায়দা আপনার লাশটা দেখে?"

"আমি হয়ত বলতে পারব কি করে মেয়েটা মারা গেছে।" সোজা সাপ্টা উত্তর অবলালের।

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে খুনটা কে করেছে আপনি জানেন?" চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন রবিউল আলম।

"না তা জানি না। তবে দেখলে হয়ত জানতে পারব কিসে করেছে।" হেয়লির মত করে উত্তর দিল অবলাল।

এক মূহুর্ত ভাবল কায়েস, না এতে করে কোন লস নেই, তাছাড়া লোকটার হাবভাবে এমন একটা কনফিডেন্স আছে যে হুট করে উড়িয়ে দেয়া যায় না। দেখাই যাক না অদ্ভুত আগন্তুক কি বলতে পারে। "বেশ," রবিউলের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কায়েস, "দেখাই যাক কি বলতে পারেন উনি, আমি সঙ্গে নিয়ে যাই?"

শ্রাগ করলেন রবিউল, "ঠিক আছে, তবে আমিও আসছি, চল জীপটা নিয়ে নেয়া যাবে।"

মর্গের শীতল ঘরে রাখা লাশটা, তখনও ময়না তদন্ত হয়নি। আগে একবার দেখে থাকা সত্ত্বেও রবিউলের মুখ রক্তশুন্য হয়ে গেলো। অবশ্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।

সুন্দর একটা মেয়ে, কিন্তু তার পেট চিরে ফালাফালা করে ফেলা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারি। আঘাতগুলি কোনটাই একক ভাবে মারাত্মক নয় – দেখে মনে হয় রক্তক্ষরণই মৃত্যুর কারণ।। কিন্তু কি ধরণের অস্ত্রের সাহায্য অপরাধটা সংগঠিত হয়েছে তা বুঝে উঠতে পারল না কায়েস। দেখে মনে হয় ছুরির কাজ, কিন্তু এতগুলো চেরা ছুরি দিয়ে একবার একবার করে কেটে থাকলে কাজটা অনেক সময় সাপেক্ষ হবে; কিন্তু সেরকম হলে মৃত্যুর আগে হাত-পা ছুঁড়ে অনেক ধস্তাধস্তি করার কথা ভিক্টিমের। ক্রাইমসীনে তেমন কোন আলামত চোখে পড়েনি।

ছুরি যদি না হয় তবে কি? বাঘ-সিংহ জাতীয় কোন হিংস্র জন্তুর নখের আঘাতে এরকমটা হতে পারে – কিন্তু শহরে, তারওপর দোতলা ঘরের মাঝে তো আর ওরকম কিছুর পক্ষে আসা সম্ভব

না। চিন্তিত মুখে সঙ্গে আসা অবলালের দিকে তাকালো কায়েস। অদ্ভুত লোকটা ঘরে ঢোকার পর থেকেই মুর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে লাশটা দেখছে – একটুও নড়েনি।
"এই যে মিস্টার?" গলা খাঁকারি দিল কায়েস, "কি, সহ্য হচ্ছে না নাকি?"
নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাল অবলাল, "বুঝলাম না আপনার কথা।"
"মানে বললাম সীনটা তো বেশ ভয়ঙ্কর, আপনার অসুবিধা হচ্ছে নাকি?"
"এর মাঝে ভয়ঙ্করের কি পেলেন?" পাল্টা প্রশ্ন করল অবলাল।
লও ঠেলা! মনে মনে ভাবল কায়েস, এ তো সহজ চীজ না! মুখে বলল, "তা কি বুঝলেন? যে জন্যে এসেছিলেন তা হয়েছে? বলতে পারবেন খুনি কে?"
মাথা ঝাঁকাল অবলাল, "হ্যাঁ পারব। তবে কে নয় – বলুন কী!"
"মানে?!" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রবিউল, 'কী' মানে?"
"কী' মানে কী!" অবলাল অবিচল, "খুনটা কোন মানুষ করেনি তাই কে বলার কোন মানে হয় না!"
"মিয়া ফাইজলামী করেন!" ধমকে উঠলেন রবিউল, ভেতরে ভেতরে প্রথম থেকেই বাইরের একজন উটকো লোককে সাথে আনার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি – শুধু কায়েসের ইশারার কারণে নিমরাজি হয়েছেন, "মানুষ করে নাই তো কি ভুতে করেছে?"
"তা বলা যেতে পারে, তবে ঠিক ভুত না, পিশাচ!"
এবার সত্যি সত্যি অবাক হল কায়েস, ভাব দেখে মনে হচ্ছে না আগন্তুক মস্ককরা করছে, কিন্তু তার কথার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না – আচ্ছা লোকটা পাগল নাতো?
ঠিক একই কথা ভাবছেন রবিউল আলমও – তবে কায়েসের মত শুধু ভেবেই ক্ষান্ত দিলেন না তিনি বরং মুখ ফুটে বলেই ফেললেন। "কি আবোল তাবোল বকছেন পাগলের মত! আসলে আপনাকে সাথে আনাটাই ভুল হয়েছে – যান, বেরিয়ে যান, আমাদের কাজ করতে দেন। যত্তসব ননসেন্স!"
অবলাল রাগল না, ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আপনার যা ভাবছেন পরিস্থিতি তার থেকে অনেক জটিল, আমাকে কিছু কাজ করতে হবে, তাই যেতে পারছি না - দুঃখিত!"
"আপনি কি বাংলা কথা বোঝেন না নাকি?" ধৈর্য হারিয়ে খেকিয়ে উঠলেন রবিউল, "দেখুন এটা পুলিশি ব্যাপার – আপনার নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। ঝামেলা না করে কেটে পড়ুন!"
"বললাম তো একবার, কিছু কাজ না করে যেতে পারছি না।" অবলাল অটল।
"আরে এতো মহা যন্ত্রণা দেখা যাচ্ছে! আসতে দেয়াই ভুল হয়েছে – এই কায়েস, একে বের করে দেও; আর তেড়িবেড়ি করলে কন্সটেবল কে বলবে দু'ঘা যেন লাগিয়ে দেয়!"
"খবরদার, ওই চেষ্টাও করবেন না!" গম্ভীর গলায় বলল অবলাল, "আইনের লোকের সাথে ঝামেলা করার ইচ্ছা নেই আমার – কিন্তু বাধ্য হলে তাও করব বৈকি!"

এবার রেগে উঠল কায়েস – উটকো উপদ্রব আর বলেছে কাকে? এমনিতেই কেসটা জটিল আর এই উন্মাদ এসে জুড়ে বসেছে। ব্যাটাকে ভয় দেখানোর জন্যে কোমর থেকে ঝটকা মেরে সার্ভিস রিভলবারটা বের করল সে, উদ্দেশ্য একটু ভড়কে দিয়ে ঝামেলা দূরীকরণ। কিন্তু এরপর যা ঘটল তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না ও।

ওর হাতে অস্ত্র উঠে আসার আগেই বিদ্যুৎ বেগে সক্রিয় হল আগন্তুক। নিমিষে পেরিয়ে এল ওদের মাঝের কয়েক ফুট দূরত্বটুকু। নিজের ক্ষিপ্রতা নিয়ে গর্ব বোধ করত কায়েস, কিন্তু অবলালের গতির কাছে ওকে মনে হয় মন্থর এক জ্বরাগ্রস্থ বৃদ্ধের মত।

তবে ওকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল না অবলাল, শুধু ইস্পাত দৃঢ় হাতে চেপে ধরল ওর রিভলবারের সিলিন্ডারটা – এখন ট্রিগার টানলেও আর ফায়ার করতে পারবে না কায়েস; কারণ রিভলবারের মেকানিজমে আগে সিলিন্ডার ঘুরে এবং তারপর পড়ে হ্যামার।

ওদিকে ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন রবিউল আলম। অবলাল এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যে কায়েস পড়ে গেছে তাঁদের দু'জনে মাঝখানে। এমতাবস্থায়, হুট করে তাঁর পক্ষে কিছু করতে যাওয়া বেশ ঝুঁকিপুর্ণ। কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মত দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা হজম করার চেষ্টা করছেন তিনি, এই সময় মুখ খুলল অবলাল, "দেখুন আমি ঝামেলা চাই না।" বলল সে, "আমার কথা একটু শুনে দেখুন, না হলে অবাঞ্ছিত বাড়তি সমস্যা হবে যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়!"

নয়

রাগ এবং বিস্ময় দু'টোই একসাথে গ্রাস করল কায়েসকে। রাগ - কারণ পরিস্থিতিটা এইরকম প্রতিকুলে চলে যাবার পেছনে ও নিজেই দায়ী, ওর সিদ্ধান্তেই অদ্ভুত এই আগন্তুককে এই রকম রেস্ট্রিক্টেড একটা জায়গাতে আসতে দেয়া হয়েছে – যার ফলশ্রুতিতেই এই অযাচিত বিপত্তি। বিস্ময় এর পেছনের কারণ অবশ্য ভিন্ন, স্বপ্নেও ভাবেনি কায়েস যে কারো পক্ষে এত দ্রুত অ্যাকশনে যাওয়া সম্ভব, আর ওর মত ঝানু পিস্তলবাজের রিভলবারকে কিনা স্রেফ সিলিন্ডার চেপে ধরে অকেজো করে দিল লোকটা! তাও এত অবলীলাক্রমে যেন এটা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না।

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে গুলি করার লক্ষ্যে ট্রিগারে হ্যাচকা টান দিল কায়েস – ইচ্ছা যদি আগন্তুকের হাতের জোরকে পরাস্ত করা যায়! কিন্তু একচুলও নড়ল না ট্রিগার, হাত তো নয় – যেন ইস্পাতের ভাইস অবলালের। জোরাজুরি করছে দেখে ভুরু কুঁচকে এবার কায়েসের দিকে তাকাল অবলাল। তারপর ট্রেঞ্চকোটের ঝুল সরিয়ে দিল মুক্ত হাতের ঝটকায়, শরীরের পেছন থেকে টেনে বের করল ভয়ঙ্কর দর্শন একটা অস্ত্র।

ওটাও একটা রিভলবার বটে, কিন্তু কায়েসের হাতেরটার তুলনায় কামান বললেও ভুল হবে না। সত্তরের দশকের জনপ্রিয় সিনেমা, "ডার্টি হ্যারি"তে ক্লিন্ট ইস্টউড ব্যবহার করে একটা রিভলবারকে জনপ্রিয় করে তোলেন – স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন মডেল ২৯, বিশ্বের সবচেয়ে বিধ্বংসী হ্যান্ডগান সমূহের মাঝে অন্যতম। তবে অবলাল যেটা বের করেছে সেটা ওই একই যাতের হলেও আরও ভারি - স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন মডেল ৫০০।
মিনি কামানটার নল রবিউলের বুকে তাক করল অবলাল, কিন্তু কথা বলল কায়েসের উদ্দেশ্য, "আপনি কিন্তু খামাখা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন," ওর গলা আগের মতই ভাবলেশহীন, "গোলমাল করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনার যা মতিগতি তাতে তো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে!"

এতক্ষণে যেন ভাষা ফিরে পেলেন রবিউল, "আপনি কি জানেন কত বড় বেআইনি কাজ করছেন?" স্বরে কর্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পেলেন তিনি, কিন্তু তেমন জমল না, অবশ্য বুকের দিকে ওইরকম একটা পিস্তল তাক করা অবস্থায় ভয় পেলে দোষ দেয়া যায় না।
জবাবে মুচকি হাসল অবলাল, "আইন?" চওড়া কাঁধ ঝাঁকাল সে, "আসলে মানুষের তৈরী আইন এর প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই আমার!"
"বটে! কিন্তু তাই বলে দু'জন পুলিশ অফিসারকে অস্ত্রের মুখে কর্তব্য পালনে বাঁধা দেবার পর নির্বিঘ্নে কেটে পড়তে পারবেন বলে ভাববেন না!" হুমকির সুরটাও ঠিক ফুটল না রবিউলের কণ্ঠে।

“নির্বিঘ্ন জীবন আমার কখনওই ছিল না, ওসব নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না!”
চাঁছাছোলা জবাব দিল অবলাল, তারপর কায়েসের দিকে ফিরে যোগ করল, “আপনার খেলনাটা খাপে ভরে যদি আমার কথা একটু শুনেন তাহলে অবাঞ্ছিত অনেক সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।”
নিরুপায় দৃষ্টিতে রবিউলের দিকে তাকাল কায়েস– পরিস্থিতি সম্পুর্ন প্রতিকূলে, এমতাবস্থায় আগন্তুক যা বলছে মেনে নেয়াই ভালো। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু’জনের, সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিলেন রবিউল।
আস্তে করে পিস্তলটা ছেড়ে দিল কায়েস, অবলাল ধরে থাকায় পড়ল না অস্ত্রটা। সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল অবলাল, “ধন্যবাদ।” কোমরের বেল্টের সামনের দিকে ওটা গুঁজে রাখল সে।
“ভুল বুঝবেন না!” গম্ভীর রবিউলের কণ্ঠ, “বাধ্য হয়েই আপনার কথা মানতে হচ্ছে, কিন্তু জেনে রাখুন, প্রথম সুযোগেই আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে।”
“সে আমি বিলকুল জানি!” ক্রুর হাসল অবলাল, “সুযোগটা যাতে করে না পান সেদিকে আমার খেয়াল থাকবে!”
“তা যা হোক,” কথার খেই ধরল আবার সে, “আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন।”
“বেশ।” বলল কায়েস, সত্যি বলতে কি, অদ্ভুত এই লোকটা কি বলতে চায় জানার জন্যে বেশ কৌতুহল বোধ করছে ও। আর যাই হোক, লোকটা যে মজা করছে না সেটুকু না বোঝার কোন কারণ নেই।
“আমার কথা হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে,” অবলালের স্বর ঠাণ্ডা, “কিন্তু এই মূহুর্তে আপনাদের সহযোগিতা আমার যতটুকু দরকার তার থেকে আমার সহযোগিতা আপনাদের দরকার অনেক বেশি।” রবিউল কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিলেন কিন্তু হাত তুলে তাঁকে বাঁধা দিল সে, “আগে পুরোটা শুনুন!”
“যা বলছিলাম,” আবার শুরু করল ও, “আজ রাতে একটা ঘটনা ঘটবে, সেই সময়ের আগ পর্যন্ত আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন আমার। তারপর আমাকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করতে পারেন, বাঁধা যদি দেইও – কারো ক্ষতি করব না, কিন্তু এর আগে আমাকে থামাতে চেষ্টা করলে সফল তো হবেন নাই, বরং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে।”
“ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলুন।” অধৈর্য গলায় বলল কায়েস।
“বলছি,” ওকে থামিয়ে দিল অবলাল, “আগেই বলেছি আমার কথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, সত্যি বলতে কি বিশ্বাস করার কোন কারণই নেই আপনাদের। কিন্তু যদি কিছুক্ষণ মাত্র ধৈর্য ধরেন তবেই বুঝতে পারবেন আমি ভুল বলছিনা।” থেমে খালি হাতটা দিয়ে গাল চুলকাল সে, অন্য হাতে এখনও নিষ্কম্প ভঙ্গিমায় ধরে আছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা, তবে এখন আর ওটা নির্দিস্ট কারো দিকে তাক করা নেই।

রবিউল একবার ভাবলেন নিজের অস্ত্রটা বের করার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি, কিন্তু নাকচ করে দিলেন চিন্তাটা – একটু আগে যে অ্যাকশন অবলাল দেখিয়েছে, তারপর ওর উদ্যত পিস্তলের সামনে ড্র করতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

"আমি বলেছি যে এই খুনটা মানুষ নয়, বরং পিশাচের কাজ!" বলে চলল অবলাল, "আপনারা তথাকথিত বাস্তববাদী লোকজন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাতে করে সেসবের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যায় না! আরও অনেক কিছুর মতই পিশাচ ও বাস্তব!"

সন্দিহান চোখে অবলালকে দেখল আবার কায়েস, "লোকটা আসলেই মানসিক ভাবে অসুস্থ," ভাবল ও – এবং সেটা আরও ভয়ের ব্যাপার, একজন অস্ত্রধারী পাগল, যে কিনা তার কাজ বোঝে – এর থেকে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ আর কি হতে পারে?

"আমি ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়েছি – যে মেয়েটি নিহত হয়েছে তার স্বামীর এক বন্ধু আমাকে চেনে। কাল সংবাদটা পেয়ে সে আমাকে জানায় যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আজ সকালে অকুস্থলে এসে আমি নিশ্চিত হয়েছি এটা আসলেই আমার লাইনের ব্যাপার।"

"আপনার লাইন মানে? একজাক্টলি কি করেন আপনি?" প্রশ্ন করলেন রবিউল।

"কি করি?" একটু দোদুল্যমান মনে হল অবলালকে, "তা অনেক কিছুই করি, তবে এককথায় বলতে গেলে আমি অনেকটা আপনাদেরই মত! আমিও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করি – তবে অতিপ্রাকৃত শৃঙ্খলা!"

"লও ঠেলা!" ভাবল কায়েস।

"যদি আপনার কথা সত্যি বলে ধরেও নেই," বললেন রবিউল, "মানে তর্কের খাতিরে আর কি! তারপরও কথা থেকে যায়। গল্প উপন্যাসে পিশাচের যেসব কেচ্ছা পড়েছি – ওরা তো কাউকে মারলে তাকে খেয়ে ফেলে..."

"হ্যাঁ সাধারণত তাই করে বইকি!" তাঁকে থামিয়ে দিল অবলাল, "তবে গল্প উপন্যাসে তো আর সব তথ্য থাকে না – অনেক বিষয়ই আছে যেগুলি বাদ পড়ে যায়।

এমনিতে একটা পিশাচ কোন মানুষকে আক্রমণ করলে তাকে মেরে খেয়ে ফেলবে, অনেকটা হিংস্র জন্তুর মত। কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্র – বা স্পেসিফিক ভাবে বলতে গেলে দু'টো বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।"

"দু'টো?" প্রশ্ন করল কায়েস।

"হ্যাঁ, দু'টো ক্ষেত্রে।"

"তা সে দু'টো কেস কি কি?" রবিউলকেও এবার কৌতুহলি মনে হল।

"এক, যখন কোন সাধক পিশাচকে পাঠায় কারো ক্ষতি করার জন্যে, তখন যে ক্ষতিটা সে করার কথা বলে দেয় ঠিক সেটাই করে পিশাচ – তার বেশি কিছু না। তাই যদি কাউকে মারতে পিশাচ পাঠানো হয়, তাহলে মারা পর্যন্তই – এর বেশি কিছু করবে না, বা বলা ভালো করার ক্ষমতা থাকবে না। কারণ বশীকরণের শর্ত অনুযায়ী ওই সময় ওদের ফ্রী উইল থাকে না!"

কথাগুলোর মাথা মুণ্ডু ঠিক বুঝতে পারল না কায়েস, কিন্তু আপাতত এই বিষয় নিয়ে বেশি ঘাটানোর কোন উৎসাহ বোধ করল না ও, পাগলের প্রলাপ শোনা এক কথা, কিন্তু তা বিশ্লেষণ করার তো কোন মানে হয় না।

বাঁধা না পেয়ে কথা চালিয়ে গেলো অবলাল, "আর দ্বিতীয় কেসটা হল এখন আমরা যা নিয়ে ডীল করছি," বলল সে, "পিশাচের বংশ বিস্তার!"

"মানে?" ভ্রুকুটি করলেন রবিউল। এমনিতে বাস্তববাদী হলেও হরর গল্প উপন্যাস বেশ পছন্দ করেন তিনি, বই পড়ার নেশাও আছে, কিন্তু পিশাচের বাচ্চা-কাচ্চার ব্যাপারে কখনও কোথাও কিছু পড়েননি বা শোনেননি।

"এই ব্যাপারটা খুব রেয়ার," বলল অবলাল, "কারণ অত্যন্ত প্রাচীন আর ক্ষমতাশালী না হলে পিশাচরা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বরং পিশাচ সাধনাকালীন ভুল ভ্রান্তির ফলস্বরূপ সাধক নিজে পিশাচে পরিনত হয়, এবং সেভাবেই পিশাচের সংখ্যা বেড়ে চলে।"

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কেউ সাধনা করতে গিয়ে বিফল হলে পিশাচ বশ করার পরিবর্তে নিজেই পিশাচ হয়ে যাবে?" জানতে চাইল কায়েস, ব্যাপারটা এখন ইন্টারেস্টিং লাগতে শুরু করেছে ওর কাছে। ভুলে গেছে যে অবাস্তব এবং অসম্ভব একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে তারা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অবলাল, "হ্যাঁ ঠিক তাই, এবং বলতে গেলে প্রায় সব পিশাচই ওভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে কিছু বিশেষ কেসে কোন কোন পিশাচ নতুন পিশাচ জন্ম দেবার ক্ষমতা অর্জন করে। এই বেলাও তাই হয়েছে।"

"আমি বুঝতে পারছি না আপনি উন্মাদ না আমরাই উন্মাদ!" বললেন রবিউল, "তবে যাই হোক না কেন আপনার কল্পনা শক্তির তারিফ না করে উপায় নেই!"

খোঁচাটাকে পাত্তা না দিয়ে আবার শুরু করল অবলাল, "কালকে মেয়েটাকে যে পিশাচটা আক্রমণ করেছিল, সে তাকে কয়েকদিন ধরেই অনুসরণ করছে – পিশাচের রিপ্রোডাকশন পদ্ধতি সাধারণ জন্তু জানোয়ারের মত সরল নয় – অনেক ব্যাপার আছে। আমি নিজেও এই বিষয়ে এক্সপার্ট নই, আমি একজন প্রব্লেম সলভার, ব্যবহারিক জ্ঞান রাখি, তাত্তিক ব্যাপারগুলো নিয়ে তেমন ঘাটাই না।"

"বরং বল যে এত গাঁজাখুরি চিন্তা করে কুলাতে পারিস না!" মনে মনে বলল কায়েস।

"যাই হোক, এই মেয়েটিকে গতকাল সে তার বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রস্তুত করা শুরু করেছে। কিন্তু প্রস্তুতি এখনো শেষ হয়নি! আজরাতে হবে – মানে যদি আমরা কোন ব্যবস্থা না নেই আর কি।"

"কি বলছেন এসব!" বিহ্বল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন রবিউল, "মেয়েটা যে মৃতা তা ভুলে গেলেন নাকি?"

"না ভুলিনি।" ধৈর্যের সাথে উত্তর দিল অবলাল, "আপনিই বরং ভুলে যাচ্ছেন যে আমরা এখানে একটা পিশাচকে নিয়ে ডীল করছি – স্বাভাবিক লজিক এখন খাটবে না।"

“আচ্ছা!” বলল কায়েস, “তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার এই পিশাচটা একটা মৃতা মেয়েকে গর্ভবতি গর্ভবতী করবে?”
“ক্লিনিক্যালি মৃতা হলেও মেয়েটার উপর পিশাচ তার প্রভাব বিস্তার করেছে।” ঠাণ্ডা সুরে বলল অবলাল, “আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে খুনের পর আটচল্লিশ ঘন্টা সময়ের মাঝে পিশাচ সঙ্গমের মাধ্যমে মেয়েটিকে একটা পিশাচিনীতে পরিনত করতে পারবে – গর্ভধারণের কোন ব্যাপার নেই এখানে কারণ শিশু পিশাচ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।”
“শুধু শিশু না, কোন পিশাচেরই নেই!” ভাবল কায়েস, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।
“তা আমাদের কি করতে হবে?” জানতে চাইলেন রবিউল।
“আমারা ফাঁদ পাতব – রাত ছাড়া পিশাচ আসবে না, কারণ রাত ছাড়া ওরা সঙ্গম করতে পারে না। আর সময়ের লিমিট মৃত্যুর পর আটচল্লিশ ঘন্টা, এরপর প্রভাব ধরে রাখার মত অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা পিশাচের মত নিম্ন শ্রেণীর অতিপ্রাকৃতদের নেই – অন্যদিকে চব্বিশ ঘন্টার আগে আবার দেহটা প্রস্তুত হয় না, তাই আজ রাতেই আসবে ওটা।”
মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন রবিউল আর কায়েস - লোকটা গপ্প একখান ফেঁদেছে যাহোক! আর এমন কনফিডেন্স নিয়ে বলছে! কিন্তু এখন তারা দুজনেই নিরুপায় অবস্থায় আছেন, সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। “তা কি রকম ফাঁদ?” একটু ইতস্তত করে জানতে চাইলেন রবিউল আলম।

###

সেদিনই রাতে, মর্গের শীতল ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে কায়েস। অন্য আরও দুই কোণে অবস্থান করে নিয়েছে অবলাল আর রবিউল।

সকালে পরিস্থিতির চাপে পড়ে অবলালের কথা মত কাজ করতে রাজি হতে বাধ্য হয়েছে ওরা দু’জনে। অবশ্য সুযোগ পেলে লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে দ্বিধা করত না ও, একটা উন্মাদকে দেয়া প্রতিশ্রুতি – তাও আবার চাপের মুখে আদায় করা, রক্ষার কোন প্রয়োজন দেখেনা ও। কিন্তু লোকটা অতি সতর্ক, সারাটাদিন ওদের সাথেই ছিল – এবং একটা মূহুর্তও সাবধানতায় ঢিল দেয়নি। সর্বক্ষণ ওর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ওদের একজনকে কভার করেছে – যখন তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিল তখন পোশাকের নিচে ঢেকে রেখেছে অস্ত্রটা, কিন্তু নিশানা সরায়নি। বলেই দিয়েছিল যে বেচাল কোন কিছু হলে অন্তত একজনের মৃত্যু ঘটবেই।

সন্ধ্যার একটু আগে এসে এই ঘরে আস্তনা গেড়েছে ওরা। কয়েকবার ভেবেছে কায়েস, এখন যেহেতু অবলাল একেবারে কাছে নেই, তার ওপর ঘরটা অন্ধকার, একটা সুযোগ নিয়ে দেখবে নাকি? তাছাড়া এখন ওদের দু’জনের পিস্তলই ফিরিয়ে দিয়েছে অবলাল – ওর ভাস্যমতে

পিশাচের মোকাবেলা করার সময় ওগুলোর প্রয়োজন পড়বে! সবমিলিয়ে সারাদিনের মধ্যে কোন স্টেপ নেবার জন্যে এখনই সেরা সময়, কিন্তু দ্বিধা করছে কায়েস।
ঠিক কেন, তা ও নিজেও বলতে পারবে না, কিন্তু অবলালের ভেতর এমন কিছু আছে যে ওর ওই উদ্ভট কেচ্ছাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, মনে হয় দেখাই যাক না আসলে কি ঘটে। এই বোধটা সকালে ছিল না, কিন্তু বিকালের পর থেকে শুরু হয়েছে। এই রকম মনে হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝে উঠতে পারছে না কায়েস, কিন্তু বোধটা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।
আরও একটা ব্যাপার হল এই যে, মর্গের ঘরটায় ঢোকা বা বের হবার একমাত্র দরজাটা এমনই জায়াগাতে যে কায়েস বা রবিউল নিজ নিজ পজিশন থেকে ওখানে যেতে চেষ্টা করলে কোন কভারই পাবে না, কিন্তু অবলাল অনায়াসে নিজের অবস্থান থেকে ওদের গুলি করতে পারবে। ইচ্ছে করেই এই রকম ভাবে জায়গা নির্বাচন করেছে সে। আরেকবার মানতে বাধ্য হল কায়েস, পাগল হোক আর যাই হোক - লোকটার কম্ব্যাট আর স্ট্র্যাটেজির সেন্স জিনিয়াস পর্যায়ের – ভাবে মনে হয় উঁচুদরের সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত।
খুবই ধীর গতিতে বয়ে চলেছে সময়, মানে কায়েসের জন্যে আর কি। সময় চলে তার নিজের গতিতে, কিন্তু অনুধাবনকারীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর তার আপেক্ষিক গতি নির্ভর করে। ডাবল ডাবল শীতের কাপড় পরে তার ওপর গরম একটা কম্বল পেঁচিয়েও হি হি করে কায়েস কাঁপছে, কারণ লাশ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এ ঘরের তাপমাত্রা হীমাঙ্কের নিচে রাখা।
মর্গের এই ঘরটি একতলায়। অনেক গুলো বক্স কয়েকটা ডিসেকশন টেবিল রয়েছে। অবলালের পরামর্শমত মাঝের একটা টেবিলে রাখা হয়েছে নিহত মেয়েটার দেহ - যেটার জন্যে নাকি পিশাচ আসবে! ঘরটাতে ঢোকার জন্যে দরজা ছাড়া আর কোন স্বাভাবিক পথ না থাকলেও ওপরে একটা কাঁচ লাগানো স্কাই লাইট মত আছে। তবে ওই ফোকর দিয়ে ঢুকতে হলে দক্ষ দড়াবাজিকর হতে হবে – তারওপর আবার গরাদ লাগানো। কিন্তু অবলাল বলেছে ওই পথেই পিশাচের আগমনের সম্ভাবনা বেশি! অবশ্য বাস্তবিক কোন কিছু আশা করছে না কায়েস – ভালোয় ভালোয় রাতটা কেটে গেলে এই আপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই ভেবেই ও খুশি। পরে সুযোগমত ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করতে হবে! এই লোক সমাজের জন্যে একটা হুমকি স্বরূপ - ওর স্থান কোন মেন্টাল হোমে!
কিন্তু এই ঠাণ্ডার মাঝে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভেবেই মেজাজ খিচড়ে যাচ্ছে কায়েসের। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়ি দেখল ও, আজকেই কিনতে হয়েছে অবলালের কথায়।

মোবাইল গুলো অফ করে রাখতে বলেছে লোকটা – নাহলে হঠাৎ বেজে উঠলে নাকি সমস্যা! যত্তোসব!
মাত্র এগারোটা বাজে! মনে মনে প্রমাদ গুনল কায়েস, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে নির্ঘাত জমে যাবে! সত্যিই যদি পিশাচ বলে কিছু থাকত এবং আসত তাও বরং ভালো হত – ভাবল সে। আর কিছু না হোক, এই ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকার হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া যেত!

বসে থাকতে থাকতে একটু ঝিমুনি মত এসে গিয়েছিল ওর, এমন সময় হঠাৎ আবার সেই অদ্ভুত অনুভুতিটা বোধ করল ও, সকালে ক্রাইমসীনটা দেখতে গিয়ে যেটা হয়েছিল। গা শিরশিরে সেই কিলবিলে অস্বস্তি! চমকে জেগে উঠল ও। সতর্ক নজর বোলাল চারপাশে, কোন সাড়াশব্দ নেই, শুধু খুব ক্ষীণ ভাবে অবলাল আর রবিউলের নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ আর এয়ারকুলারের মৃদু গুঞ্জন। আবার গা এলিয়ে দিতে গেলো কায়েস, আর ঠিক এমন সময়ই ঝনঝন করে তীক্ষ্ণ শব্দে ভেঙ্গে পড়ল স্কাইলাইটের কাঁচ!

###

অভ্যাস বশে কখন যে কায়েসের হাতে পিস্তল উঠে এসেছে নিজেও বলতে পারবে না ও। তবে গুলি করল না ও, কারণ অবলাল পই পই করে বলে দিয়েছিল যেন একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া ওরা দু'জন আগে গুলি না ছোড়ে। প্রথম আঘাত অবলাল নিজেই হানতে চায়। তাছাড়া যে দৃশ্য দেখছে তাতে এতটাই অবাক হয়েছে যে গুলি করার কথা মনেও নেই। অবলালের কথা একবারের জন্যেও বিশ্বাস করেনি ওরা কেউ, করার কোন কারণও ছিল না। ওই রকম আজগুবি কাহিনী পাগলেও মানবে না! কিন্তু এই মূহুর্তে চোখের সামনে যা দেখতে পেল তাতে নিজের মানসিক সুস্থতা নিয়েই সন্দেহ হল কায়েসের।

ভেঙ্গে পড়েছে স্কাইলাইটের কাঁচ, সেখানে উকি দিয়েছে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা মুখ। মর্গের মধ্যে একটা ডিম লাইট জ্বলছে – তাতে অন্ধকার না কাটলেও একটা আবছা আলো আছে, সে আলোতে মুখটা দেখে শিউরে উঠল কায়েসে।

উঁচু হনু, নাকের জায়গায় দু'টো ছিদ্র মাত্র, ঠেলে বেরনো জোড়া শ্বদন্ত আর জ্বলন্ত লাল চোখ বিশিষ্ট মুখটা যে কোন মানুষের নয় তা বোঝার জন্যে বিশেষ কোন জ্ঞানের দরকার পড়ে না। রোমশ দু'টো হাত বাড়িয়ে স্কাইলাইটের গরাদ আঁকড়ে ধরল মুখের মালিক, তারপর গেরস্ত যেভাবে মুর্গির খোপের দরজা সরায় – তেমনি অনায়াসে ছুটিয়ে ফেলল ওটা। বানরের মত সাবলীল ভঙ্গিতে শরীর মুচড়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঝুপ করে মেঝেতে নেমে উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

অবায়বটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, দেখতে মানুষেরই মত - কিন্তু রোমশ দেহ – তবে রোমগুলি বানর প্রজাতির প্রাণীদের মত নয়, বরং কুকুর বা শেয়ালের রোমের মত। হাত দু'টো অত্যাধিক লম্বা, হাঁটু ছাড়িয়ে নেমেছে – শিম্পাঞ্জীর মত, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গি কুঁজো নয় বরং মানুষের মতই সটান। সবমিলে কোনমতেই একে পরিচিত কোন প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একমাত্র অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেকআপ নিলে হয়ত এরকম একটা চেহারা ফোটানো যেতে পারে।

প্রথমে সোজা মাঝের টেবিল – মানে যেখানে মেয়েটার লাশ রাখা আছে ওটার দিকে এগিয়ে আসতে গেলো জিনিষটা। কিন্তু এক পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়াল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল তার

এক চাপা জান্তব গর্জন, পাই করে ঘুরল ওটা, তাকাল কায়েস যে টেবিলর পেছনে বসে আছে সেদিকে - পর মূহুর্তে বিদ্যুৎ বেগে তেড়ে এল!
এতটাই ক্ষিপ্র যে চোখ দিয়ে অনুসরণ কষ্ট হয় – কিন্তু কায়েস প্রস্তুতই ছিল, সকালে একবার অবলালের কাছে নাকাল হয়েছে – আর ইচ্ছে নেই। গর্জে উঠল ওর রিভলবার!
পয়েন্ট থ্রী টু ক্যালিবারের বুলেট আহামরি কিছু না হলেও মানুষকে থামিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট, বিশেষ করে গুলিটা যখন জিনিষটার বুকে আঘাত হেনেছে। কিন্তু থামা দুরের কথা, বিন্দু মাত্র ধীর পর্যন্ত হল না ওটা! বরং হাতের এক ঝটকায় কায়েসের সামনের ভারি টেবিলটাকে একপাশে ছিটকে ফেলল। অন্ধকারেও ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার হাতের বড় বড়, ধারাল, বাঁকা নখ!
হঠাৎ উজ্জ্বল সবুজ আলোতে ভরে গেলো ঘর, একই সঙ্গে কানে তালা লাগানো শব্দে গর্জে উঠল ভারী পিস্তল। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের .৫০ ক্যালিবারের ভারী গুলির আঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল জিনিষটার ধাবমান দেহ।
প্রথম গুলিতে কাজ না হবার পর কায়েস চাচ্ছিল মাথায় নিশানা করতে – কারণ এলো পাথারি গুলি ছুড়ে যদি থামাতে না পারে, ও বিলক্ষণ বুঝছিল যে একবার ওই বিভীষিকা যদি গায়ের ওপর এসে পড়ে, আর বাঁচতে হবে না। কিন্তু নিশানা ঠিক রাখতে গিয়ে দেরী করে ফেলায় দ্বিতীয় গুলি ছোড়ার আর সময় পেলো না সে।
পিঠে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের বুলেট নিয়েও অসাধারণ সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ভয়াল জীবটা। তারপর গর্জে উঠল অপার্থিব এক রক্তপানি করা স্বরে! ওই মূহুর্তেই কায়েস মানতে বাধ্য হল যে সামনে দাঁড়ানো জিনিষটা আসলেই একটা পিশাচ! কোন লৌকিক প্রাণীর পক্ষে এমন স্বরে গর্জানো অসম্ভব!
ঝটকা মেরে ঘুরে গেল পিশাচটা, এবং মুখোমুখি হল অবলালের। মর্গের ঘরটা বেশ বড়, প্রায় ষাট ফুট বাই চল্লিশ ফুট – এবং অবলাল দাঁড়িয়ে আছে একেবারে অন্য প্রান্তে। ওর বাম হাতে ধরে রেখেছে সবুজ রঙের একটা ফ্লেয়ার, আর ডান হাতে শোভা পাচ্ছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

অবাক হয়ে ভাবল কায়েস, কতটা শারীরিক শক্তি ধরে এই লোকটা? বেশি লম্বা নয় সে, যদিও দেহের গঠন চমৎকার কিন্তু তারপরও ওজন ১৭০ পাউন্ডের বেশি হবে না। অথচ কিনা এক হাতে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ৫০০ ফায়ার করছে! যেখানে দুহাতে ধরে গুলি করলেও .৪৫ ক্যালিবারের রিকয়েল সামলানোই কঠিন, সেখানে একহাতে .৫০ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন!

অবশ্য সেই মূহুর্তে ওসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ নেই। আগের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে অবলালের দিকে ধেয়ে গেলো পিশাচটা, একে বেকে আগাল যাতে করে গুলি লাগানো কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু পর পর দু'বার গর্জন ছাড়ল অবলালের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, এবং লক্ষ্যভেদ করল। প্রথম গুলিটা বুকে এবং শেষটা মুখের পাশে আঘাত হানার পর পিছিয়ে গেল পিশাচটা, কায়েস বুঝতে পারল - যাই হোক না কেন, ওটারও দুর্বলতা আছে, ওটাও মরণশীল! দ্রুত

সামনে এগিয়ে এল অবলাল, এবং আসতে আসতে আরও একটা গুলি ছুড়ে পিশাচটার কণ্ঠা বিদীর্ণ করে দিল। এবারে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেলো ওটা, কিন্তু এখনও কিছু প্রাণ বাকি আছে, তড়পাতে তড়পাতে ওঠার প্রয়াস পেল। ধারাল নখগুলোর সাহায্যে একটা টেবিলের পায়া আঁকড়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে তুলতে চাইল নিজ দেহটাকে। কিন্তু বিধিবাম, বিন্দু মাত্র দয়া দেখাল না অবলাল, কাছে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল কপালের ঠিক মাঝখানে! পাকা তরমুজ আছড়ে পড়লে যেভাবে ফাটে, সেভাবেই চৌচির হয়ে গেলো পিশাচটার মাথা – কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটাও।

"ফুহ!" হাঁফ ছাড়ল অবলাল, "কি, এখন বিশ্বাস হল আমার কথা?" বিহবল কায়েসের দিকে তাকিয়ে দেঁতো হাসি হাসল সে। তারপর এদিক ওদিক তাকাল রবিউলের খোঁজে। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বাম হাতে এখনও ধরে আছে ফ্লেয়ারটা।

কায়েসও নজর চালাল রবিউলকে বের করতে, প্রায় একই সময় দু'জনেরই গোচর হলেন তিনি। যেখানে পজিশন নিয়েছিলেন সেখানেই আছেন – তবে অচেতন। চোখ উল্টে গেছে তাঁর, মুখ দিয়ে বের হচ্ছে গ্যাঁজলা!

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল অবলাল, "পুলিশের লোকের নার্ভ এত দুর্বল হলে চলে?" বলে ঘুরল ও পিশাচটার মৃত দেহের দিকে। ঝুকে পড়ে জিনিষটাকে পরিক্ষা করতে শুরু করল, "বেশ ক্ষমতাধর ছিল ব্যাটা!" স্বগতোক্তির ঢঙ্গে বলল সে, "সাধারণত দুই রাউন্ড .৫০ এই কাজ হয়ে যায় কিন্তু এ পুরো পাঁচ'টা লাগিয়ে ছেড়েছে! তার ওপর তোমার একটা গুলি।" কথার ছলে কায়েসকে যে তুমি সম্বোধনে করে ফেলেছে বোধহয় খেয়াল করল না। আরেকটু ঝুঁকে ফ্লেয়ারটা আরও কাছে নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগল পিশাচটাকে।
কায়েসও একটু দেখবে ভেবে আগাতে নিল, কিন্তু কি মনে করে যেন তাকাল দরজাটার দিকে। এবং একই মুহূর্তে যেন শেলের আঘাতে উড়ে চলে গেল দরজাটা – প্রকান্ড একটা ছায়া, অমানুষিক এক গর্জন ছেড়ে ছুটে ঢুকল ভেতরে। মৃত পিশাচটার মতই দেখতে এটাও, কিন্তু উচ্চতায় সাত ফুটেরও বেশি। আর এর চোখ দু'টো আরও অনেক বেশি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে!

বিন্দু মাত্র দ্বিধা করল না কায়েস, ও জানে অবলালের পিস্তল খালি – আর দেখেই বুঝে গেছে এবারের প্রতিপক্ষ আরও শক্তিমান। বাম হাতের চেটোর সাহায্য হ্যামার ওঠাতে শুরু করল ও, মেশিনগানের মত ছুটল গুলি বৃষ্টি! দু'সেকেন্ডে খালি হয়ে গেলো রিভলবার। সাত গুলির একটা খরচ হয়েছিল আগে, বাকি ছয়টা হজম করল নতুন অতিথি - বুকে এবং মাথায়। কিন্তু বাস্তবিকই এবারের পিশাচটা শুধু আকারেই বড় নয়, অনেক বেশি ক্ষমতাধরও বটে। যেন কিছুই হয়নি এমনই ভঙ্গিতে ছুটল ওটা, কায়েসের দিকে ফিরেও ও তাকালো না। লক্ষ্য অবলাল। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চালাল ধারাল নখযুক্ত থাবা!

একেবারে শেষ মূহুর্তে ঝটকা মেরে পিছিয়ে গেল অবলাল, থাবাটা পড়ল একটা খালি টেবিলে। প্রচন্ড সে আঘাতে শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল টেবিলের কাঠ। পাগলের মত রিলোড করা শুরু করল কায়েস, কিন্তু যত তাড়াহুড়োই করুক না কেন, রিভালবার রিলোড করা সময় সাপেক্ষ কাজ।

ওদিকে আবার আক্রমণ চালাল পিশাচটা। কিন্তু এবারও শেষ মূহুর্তে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে এড়িয়ে গেল অবলাল, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেলো খানিকটা। বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হল না ওকে। সামনে দাঁড়ানো উন্মত্ত বিভীষিকাটার মুখে ফ্লেয়ারটা ছুড়ে দিলও, তারপর অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে তুলে ধরল ওর বাম হাত। কনিষ্ঠা এবং অনামিকা – এই দু'টো আঙুল বাঁকানো আর বাকি তিনটেকে সোজা রেখে সামনে বাড়িয়ে ধরল সে হাতটা।

অবাক হয়ে ওকে লক্ষ্য করছে কায়েস। কি করতে চাচ্ছে লোকটা? খালি হাতে ওই দানবীয় পিশাচটার সাথে লড়বে? ছ' ছ'টা গুলি খেয়েও যেটার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত হয়নি! আরেকবার রক্ত পানি করা গর্জন ছেড়ে তেড়ে গেলো পিশাচটা। এবার এক নয়, বরং দুই থাবাই আক্রমন শানাতে প্রস্তুত। কিন্তু ওই আগ্রাসনের মুখেও পেছানোর কোন লক্ষণ দেখা গেলো না অবলালের মাঝে। শুধু বড় করে দম নিল সে একবার। কায়েস ভাবল নির্ঘাত আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে লোকটা। মরিয়া হয়ে রিলোড শেষ করার চেষ্টা করল ও। পুরো ঘটনা যেন স্লো মোশনে ঘটছে – কারণ দরজা ভেঙ্গে পিশাচটার প্রবেশের পর এখনো দশ সেকেন্ডও পেরোয়নি।
অবলালের একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ল পিশাচটা। এখনই আঘাত করবে ভয়ঙ্কর নখ গুলি, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বেচারার শরীর – যদিও মাত্র একদিনের পরিচয় এবং তিক্ত; তবু লোকটার জন্যে খারাপ লাগল কায়সের। ওর রিলোড করা শেষ। রিভলবার তুলতে শুরু করল ও, তবে এতে কতটুকু কাজ হবে নিশ্চিত নয় – কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে!

"হুবড়িজাহ নোজাহ!" চাপা কিন্তু দৃঢ় স্বরে অদ্ভুত শব্দ দু'টো উচ্চারণ করল অবলাল। আলোর একটা ঝলক, এবং তার সাথে সাথেই ওর এগিয়ে দেয়া বাম হাতের তালু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল নীলাভ একটা অগ্নি গোলক, সোজা গিয়ে আঘাত করল ছুটে আসা পিশাচটার বুকে।

রকেট লঞ্চারের শেলের মত হল প্রতিক্রিয়া, দানবীয় শরীরটা খড়ের পুতুলের মত ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল প্রায় বিশ ফুট দুরের দেয়ালের সাথে! ওখানেই দীর্ঘ একটা মূহুর্ত লেপ্টে রইল দেহটা, মাটিতে পড়ে থাকা ফ্লেয়ারের নিভন্ত আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেলো যে ওটার বুকের দুই

তৃতীয়াংশ বেমালুম বাষ্পীভূত হয়ে গেছে! আস্তে করে মেঝেয় খসে পড়ল ওটা, একচুল নড়ছে না – পেছনে দেয়ালে লেপ্টে রয়েছে কালচে লাল রক্ত!

দশ

“কি হলো? দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি?” অবলালের কথায় চটকা ভেঙ্গে বর্তমানে ফিরে এলো কায়েস। স্মৃতিচারণ করতে গেলে অনেক দীর্ঘক্ষণের চিন্তাও খুব দ্রুত পার হয়ে যায় বাস্তব সময়ে। গাজীপুরের সেই আধিভৌতিক অভিজ্ঞতা লাভের পর চার বছর পেরিয়ে গেছে – এর মাঝে ওর আর অবলালের মাঝে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
ধ্বংসযজ্ঞের পর সেদিন রাতে অবলাল ব্যাখা করে কেন সে কায়েস এবং রবিউলকে জিম্মি করেছিল। ও জানত যে একটা বড় রকমের গোলযোগ হবে – এবং সেটাকে ধামাচাপা দিতে পুলিশের সাহায্য নেয়া ছাড়া গতি ছিল না। তাই ওদেরকে ওই ঝামেলার মাঝে এনে ফেলেছিল। বস্তুত, পিশাচ দুটোকে ঘটনার পরপরই ভ্যানে করে গোপনে সরিয়ে ফেলা এবং পরে পুড়িয়ে ফেলা হয়। গুলির শব্দে লোক জমে গিয়েছিল বলে কাজটা অবশ্য তত সহজ হয়নি – তবে জ্ঞান ফিরে পাবার পর রবিউল বেশ দক্ষতার সাথেই পরিস্থিতিকে সামলেছেন।

অবলালের কথার গুরুত্ব বুঝতে পেরে এবং ওর ক্ষমতাকে চাক্ষুষ করে ওকে অ্যারেস্ট করার চিন্তাও আর মাথায় আনেনি কায়েস, তবে রবিউল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে ঘটনার বেশিরভাগই দেখতে পাননি – কিন্তু ফলাফল দেখে এবং কায়েসের ভাষ্য শুনে উনিও আর উচ্চবাচ্য করেননি। অবশ্য অবলালের ব্যাপারে একটা সন্দিহান ভাব তাঁর মাঝে রয়ে গেছে – ওর ক্ষমতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নয়, কিন্তু ওর মতিগতির ওপর তাঁর বিশেষ ভরসা নেই। বিশেষ করে সে নিজেই যখন ঘোষণা করেছে যে মানুষের তৈরি আইনের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই!

কায়েসের কথা অবশ্য ভিন্ন, অবলালের মাঝে যে বুনো এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তিমত্তার আভাস ও দেখেছে – সেটাকে ঠিক বুঝতে না পারলেও একটা অমোঘ আকর্ষণ বোধ করেছে ও গোটা বিষয়টার প্রতি; তাছাড়া নিজের চোখে অতিপ্রাকৃত অবলোকন করে জগৎ সংসারের ব্যাপারে ওর ধ্যান ধারণা আমূল পাল্টে গেছে। স্বভাবগত ভাবেই কায়েস জ্ঞান-পিপাসু এবং কৌতুহলি, আর ও বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছে যে অধিভৌতিক বিষয়ে জানতে হলে অবলালই সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। অবশ্য ওদের সখ্যতা গড়ে ওঠার আরেকটা কারণ আছে – অস্ত্র!

অস্ত্রের প্রতি ওদের দু’জনেরই রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ, এবং পরে একসাথে অস্ত্র বহুবার চর্চা আর অনুশীলনের ফলে পরস্পরের প্রতি এই ব্যাপারটা নিয়ে মিউচুয়াল রেস্পেক্ট গড়ে উঠেছে ওদের। অবলাল ক্ষিপ্রতর, এবং অবশ্যই অনেক বেশি শক্তিশালী – ওর অস্ত্রগুলো সব ভারী পাল্লার। আসলে এত ভারী অস্ত্র ও কি করে চালায় – এত শক্তি কোথায় পায় ?
এটা এখনো কায়েসের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। অপরদিকে নিশানার বেলায় কায়েস এগিয়ে রয়েছে – অবশ্য এমন না যে অবলালের এইম খারাপ। অনায়াসে উড়ন্ত পাখিকে গেঁথে

ফেলতে পারে ও, কিংবা ভেদ করে দিতে পারে শুন্যে ছুড়ে দেয়া কয়েন – কিন্তু কায়েসের তাক আরও অনেক উঁচু স্তরের, রবিউল যে বলেন কায়েস অলিম্পিকে সোনা জিততে পারবে – মনে হয় না বাড়িয়ে বলেন।

কিন্তু কায়েসের জন্যে হতাশাজনক হলেও সত্যি যে গত চার বছরে বহুবার দেখা হলেও – একসাথে বহু সময় কাটালেও, আজ অবধি অবলালের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতে পারেনি সে। লোকটা অত্যন্ত চাপা স্বভাবের। কয়েকবার অবশ্য কিছু পুলিশি ঝামেলা থেকে ওকে উদ্ধার করেছে কায়েস – কিন্তু সেসব সমস্যা, যদিও বা বেশ জটিল – কখনো ওকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেছে বলে মনে হয়নি কায়েসের কাছে। জীবন ধারণের জন্যে লোকটা কি করে সে বিষয়টাও কায়েসের কাছে ঝাপসা, অবলালের টাকা পয়সার কোন কমতি আছে বলে মনে হয় না – ওর কাছে নতুন নতুন অস্ত্র আর সাজ সরঞ্জামের রীতিমত যেন মেলা বসে যায়। তবে নিশ্চিত না হলেও কায়েস একটা আঁচ করেছে এ বিষয়ে – তবে সেই ধারণাটা মোটেও সন্তোষজনক নয়। স্বাভাবিক নিয়মে চললে অবশ্য কায়েসের কর্তব্য অবলালকে অ্যারেস্ট করা, একে সন্দেহজনক গতিবিধি – তার ওপর এত সব অবৈধ অস্ত্র! কিন্তু এদিকটায় চোখ বুজে আছে ও সার্বিক কারণে। তাছাড়া যতদূর বুঝতে পেরেছে জনসাধারণের জন্যে অবলাল কোন হুমকি নয়। কায়েসের ধারণা অবলাল ঢাকা তথা সমগ্র বাংলাদেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডে একজন উঁচুদরের হিটম্যান হিসেবে কাজ করে থাকে। অতিপ্রাকৃত বাদ দিলেও ওর যা অস্ত্র চালনার ক্ষমতা বা কলাকৌশলগত দক্ষতা তাতে করে ওর পক্ষে খুন জখম করা কোন ব্যাপারই না। ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও একবার জিজ্ঞাসা করেছিল কায়েস – উত্তরে অবলাল শুধু এটুকুই বলেছে, "নিরীহ বা নির্দোষ বা এমনকি যার সামান্য আশাও বাকি আছে তেমন মানুষের ক্ষতি আমি পারতপক্ষে করি না!"

আপাতত সেটাই মেনে নিয়েছে কায়েস – কারণ সত্যি বলতে কি, সেদিন রাতে ওকে অ্যাকশনে দেখার পর থেকে লোকটাকে শুধু সমীহই করে না ও, বরং বলা যায় রীতিমত ভয় পায়। কিন্তু সর্বোপরি যা নিয়ে কায়েসের ফ্রাস্টেশনের শেষ নেই তা হচ্ছে এই চার বছরে অতিপ্রাকৃত কোনকিছুর ব্যাপারে একটা টু শব্দও করেনি অবলাল। কায়েসও মুখোমুখি হয়নি কোন অস্বাভাবিক ঘটনার। মাঝে মাঝে ওর মনে হয়েছে – আসলেই কি সে রাতে ওই রকম কিছু ঘটেছিল? নাকি কোন কারণে ওর ভ্রম হয়েছে? কিন্তু চোখ বুজলেই আজও ওই পিশাচ দু'টোর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখগুলো দেখতে পায় ও, কানে বাজে সেই অমানুষিক ক্রুদ্ধ গর্জন, মনে পড়ে যায় অবলালের কণ্ঠে ধ্বনিত সেই অদ্ভুত শব্দ দু'টো, "হুবড়িজাহ নোজাহ!" আর সেই চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকটা। আর সব থেকে বেশি মনে পড়ে ওই গা শিরশিরে অনুভূতিটার কথা।

সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেও ছাড়েনি কায়েস, কিন্তু অবলাল জবাব দিয়েছে যে এসব ব্যাপারে যতকম জানা যায় ততই মঙ্গলজনক। শত চাপাচাপি সত্তেও এর বেশি কিছু বের হয়নি ওর মুখ থেকে।

পিশাচগুলিকে যখন পেট্রোল ঢেলে পোড়ানো হচ্ছে তখন কিছু কথা বলেছিল অবলাল, এই এতদিনের পরিচয়ে অতিপ্রাকৃত নিয়ে ওই একটিবারই মুখ খুলেছিল সে। কায়েসের চোয়াল তখনও ঝুলে আছে, ঘটনার আকস্মিকতার প্রভাব ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারছে না ও – সারাজীবনের ধ্যান ধারণা বিচারবুদ্ধি এক নিমেষে উবে গেছে ফুঁৎকারের মত। রবিউলের অবস্থা আরও খারাপ – তাঁর মুখটা একবার বোয়াল মাছের মত হা হচ্ছে, আবার বন্ধও হচ্ছে – নিজে নিজেই, যেন মুখের মালিকের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রন নেই ওটার ওপর।

কায়েস ভাবছে, রবি ভাই তো বলতে গেলে কিছুই দেখে নাই, তাতেই বেচারার এই দশা! যদি পুরো সময় সজ্ঞান থাকত তাহলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেত! অবশ্য নিজেই যে মানসিক ভারসম্য হারিয়ে ফেলেনি সে ব্যাপারেও শত ভাগ নিশ্চিত বোধ করছে না ও। হঠাৎ চোখ তুলে নিকট দাঁড়ানো অবলালের দিকে তাকাল কায়েস – চুপচাপ একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আছে লোকটা। পোড়ানোর কাজটা গোপনে সারার জন্যে শালবনের বেশ ভেতরে একটা নির্জন এলাকায় এসেছে ওরা তিনজন, পুলিশ ভ্যান নিয়ে। সারাটা রাস্তা ঝিমিয়েছে অবলাল – সেই অদ্ভুত আগুনের গোলক নিক্ষেপের পর থেকেই ওর ভেতর কেমন একটা নির্জীব ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, জোরে একবার ডানে বামে ঝাঁকি দিল মাথাটা, তারপর এগিয়ে এলো কায়েসের দিকে। "আজকে যা দেখলে এরপর তোমার মনের অবস্থা কি হতে পারে বেশ বুঝতে পারছি," নরম গলায় শুরু করল সে, "তবে, কিছু বিষয় আছে যা তোমাকে জানান দরকার।"

"তা আর বলতে!" মাথা দোলাল কায়েস।

"আসলে আজকে কয়েকটা ব্যাপার আমার হিসেবের বাইরে চলে গেছিল," বলল অবলাল, "কপাল ভালো যে সব ঠিকঠাক মত শেষ হয়েছে – কিন্তু নাও হতে পারত।"

"এই রকম নরকগুলজারকে ঠিকঠাক বলছ?!" বিস্ময় গোপন করার কোন চেষ্টা করল না কায়েস, অবশ্য করলেও লাভ হত না, ওরকম কিছুর পক্ষে অতিরিক্ত বিহ্বল বোধ করছে ও।

"অবশ্যই!" জোরের সাথে বলল অবলাল, "আমরা সবাই মারা পড়তে পারতাম, আর তাহলে পিশাচগুলির সংখ্যাও বেড়ে যেত। তাছাড়া," একটু বিরতি দিল ও, "আমি মারা পড়লে এ অঞ্চল প্রতিরক্ষার জন্যে সাময়িক ভাবে কেউ থাকত না – বিরাট এক বিপর্যয় ঘটে যেত।"

না বুঝেই মাথা নাড়ল কায়েস।

"এবং এমনটা ঘটার জন্যে তুমিই দায়ী!" অবলালের গলাটা ঠাণ্ডা।

এগার

এবার চমকাল কায়েস – যদিও ভেবেছিল একরাতের মত চমকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ও, কিন্তু হঠাৎ করে এহেন গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে ওর নড়বড়ে ভিত আরও নড়ে গেলো। "ক্ক-কি বলতে চাইছো?" প্রায় তোতলে উঠল ও, নিজের কানেই অপরিচিত শোনাল কণ্ঠস্বর।

"না না!" তাড়াতাড়ি হাত তুলে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল অবলাল, "আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না, তুমি দায়ী হলেও আদপে ব্যাপারটা তোমার হাতে ছিল না। বরং বলা চলে আমারই গাফিলতি।"

"বুঝিয়ে বললে মনে হয় ভালো হত!" নিজেকে সামলে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলল কায়েস।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও!" এই প্রথমবারের মত অপ্রস্তুত হতে দেখা গেল অবলালকে, "আসলে কি করে বোঝাই।" ভুরু কুঁচকে এক মূহুর্ত ভাবল সে, "কথা হচ্ছে, সকালে যখন প্রথম সিনে আসি তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে একটা মাত্র পিশাচের কাজ এটা – এবং আমার ধারণা সঠিকও ছিল, যে পিশাচ বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েটাকে মেরেছে, সে ছিল প্রথম পিশাচটা। বেশ ক্ষমতাধর! ওটাকে সামলাতে ভালোই বেগ পেতে হয়েছে – এমনিতে .৫০ গুলি জায়গামত দু'টো লাগলেই পিশাচের দফারফা হয়ে যায়, কিন্তু ওটাকে ঘায়েল করতে যে পুরো অস্ত্র খালি করতে হয়েছে তাতো দেখেইছ?"

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল কায়েস।

"কিন্তু ওটার পর যেটা এসেছিল – সেটার মত এত ভয়ঙ্কর পিশাচ আমি আর কখনো দেখিনি। সুপারন্যাচারাল লাইনে পিশাচেরা অনেকটা তোমাদের পুলিশের কন্সটেবলের মত – একদম নিম্ন শ্রেণীর!" গাল চুলকালো অবলাল, "কিন্তু এই বিশেষ কেসটা দেখলাম অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।"

"কিন্তু তার সাথে আমার দোষের কি সম্পর্ক?" জানতে চাইল অধৈর্য কায়েস।

"তোমার দোষ আছে তা তো বলিনি!" বাঁধা দিল অবলাল, "কথা হচ্ছে, এত ক্ষমতাধর একটা কিছু খুনের সীনটাতে এলে আমি বুঝতে পারতাম আগে থেকে – আসেনি। কিন্তু তাহলে পরে কেন এলো? এমনিতে নিজে থেকে কোন কাজ করলে পিশাচেরা একা একাই চলে – কেউ ওদের নিয়ন্ত্রন করলে অবশ্য ভিন্ন কথা; তাই দ্বিতীয় পিশাচটা কেন এলো সেটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।"

"তা ভেবে কি উত্তর পেলে?"

"আমি নিজে আমার প্রেজেন্স বা বলা ভালো আমার নিজের অতিপ্রাকৃত শক্তিকে আড়াল করে রেখেছিলাম, ওদের টের পাবার যো ছিল না। কিন্তু ওরা তারপরও কোন ভাবে বুঝতে পেরেছে যে আশেপাশে অন্য কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি আছে; এবং সেজন্যেই স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে জোট বেঁধে এসেছে।"

“অন্য কোন অতিপ্রাকৃত?” এদিক সেদিক চাইল কায়েস যেন কোন কোনায় লুকিয়ে বসে আছে ব্যাটা অতিপ্রাকৃত তাই খুঁজছে!
“হ্যাঁ অন্য অতিপ্রাকৃৎ শক্তি!” বলল অবলাল, “আর সেটা হচ্ছে তুমি!” চড় মারলেও মনে হয় এতটা কাজ হত না, এই কথাটায় যা হল। কায়েসকে দেখে মনে হল সে পড়েই যাবে টলে।
“আ আ – আমি?” তোতলাতে তোতলাতে কোনমতে বলল কায়েস।
ওপর নিচ মাথা দোলাল অবলাল, “হ্যাঁ,” বলল সে, “আমার চোখ এড়ায়নি, যখন দ্বিতীয় পিশাচটা প্রবেশ করে তার ঠিক আগে তুমি টের পেয়েছিলে, তাই না?”
“হ্যাঁ” একমত হল কায়েস, “কেমন একটা বিচ্ছিরি গা শিরশির করা অনুভুতি হয়েছিল।”
“দেখো ওই পিশাচটা নিজের উপস্থিতি গোপন করার জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টা নিয়েছিল – এবং প্রায় নিখুঁত ছিল ওর প্রস্তুতি। এমনকি আমি নিজেও বিন্দু মাত্র টের পাইনি – কিন্তু তুমি, যার কিনা অলৌকিকতার ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই, সে কিনা অনুভব করলে ওকে!” দম ছাড়ল অবলাল, “গা শিরশির করার কারণ তোমার অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে ভালো পরিচয় নেই, নেই কোন প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি – কিন্তু কথা হল তুমি স্বাভাবিক হলে কিছু অনুভবই করতে না। যেহেতু করেছ – তার মানে তুমি একজন সেন্সেটিভ! এবং সেকারণেই তোমার নিজেরও একটা সুপারন্যাচারাল প্রেজেন্স আছে।”
“আমি একজন কী?”
“সেন্সেটিভ! অলৌকিক কিছু ধারে কাছে থাকলে তা অনুভব করতে পারো। এটাও একটা অলৌকিক ক্ষমতা। আর যেহেতু এর জন্যেও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োজন হয় – তাই এটাও টের পাওয়া যায়। পিশাচেরা ন্যাচারাল ভাবেই ভালো সেন্সর তাই আমি হুট করে বুঝতে না পারলেও ওরা ঠিকই তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছিল। সেজন্যেই জোট বেঁধে এসেছে। তাই বললাম, তুমি দায়ী।”

###

“এই আবার কি হলো তোমার?!” এবার বিরক্ত গলায় প্রায় ধমকে উঠল অবলাল, “বার বার কোন কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া হচ্ছে? – এই রকম স্বপ্নালু ভাব ধরে থাকলে কিন্তু নিজেরই অতীত স্বপ্নে পরিনত হতে বেশি দেরী হবে না!”
অতি সল্প ব্যবধানের মাঝে দ্বিতীয়বারের মত স্মৃতিচারণ বাদ দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলো কায়েস। ঠিকই বলেছে অবলাল – এরকম একটা পরিস্থিতিতে অন্যমনস্ক হবার মত বিলাসিতা শোভা পায় না। বাম থেকে ডান হাতে নিল সে ভাঁজ করা বর্ষাতিটা। তারপর ঘুরে অবলালের দিকে তাকালো, “চল যাওয়া যাক।” ক্লান্ত শোনাল কণ্ঠটা।

মাথা ঝাঁকাল অবলাল, একপাশে সরে কায়েসকে আগে যেতে দিল সে – কারণ চাবি ওর কাছেই। কায়েসের ফ্ল্যাট আটতলায়। লিফটে তেমন কথা হল না। আসলে কায়েস বেশ অবসাদ

বোধ করছে – সকাল থেকে একটার পর একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। হ্যাঁ দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম সে নিয়েছে বটে কিন্তু সারাদিনের ধকলের পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রতুল, তাছাড়া রাতও কম হয়নি এবং আগের রাতেও ঘুমায়নি বললেই চলে। তবে ঝক্কি সহ্য করে চলার অভ্যাস আছে কায়েসের। আপাতত ঘরে ফিরে অবলালকে পরিস্থিতিটা খুলে বলবে, তারপর ওর ব্যাখ্যা শুনে ঘুম দেবে। পরবর্তি কর্মপন্থা সকালে দেখা যাবে। ভাবে মনে হচ্ছে কালকের দিনটা আরও ব্যস্ত কাটবে, তাই শক্তি পুনরুদ্ধার করা জরুরি।

বিল্ডিংটার ডিজাইনটাই এমন যে লিফট থামে দুই ফ্লোরের মাঝে – তাতে করে লিফট থেকে বেড়িয়ে একপ্রস্থ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে বা নামতে হয়। সাধারণত নামাটাই পছন্দ কায়েসের, কিন্তু আজ মনের ভুলে নয় এর বদলে আট নম্বর বোতাম চেপে ফেলেছে। বিষয়টা খেয়াল করে বিড়বিড় করে গাল বকল ও – এমনিতেই ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে তার ওপর আবার সিঁড়ি বাওয়া! অবশ্য পরক্ষণে নিজের ওপরই বিরক্তি বোধ করল, মাত্র অর্ধেক ফ্লোরেরই তো ব্যাপার – এ নিয়ে এত অভিযোগের কি আছে?

সব মিলে বেশ অন্যমনস্ক এবং খিঁচরে যাওয়া মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এল কায়েস লিফট থেকে, পেছনে ভাবলেশহীন অবলাল।সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ থমকে গেলো কায়েস, কেমন একটা চাপা অস্বস্তি বোধ – তিরিক্ষি মেজাজের কারণে একটু দেরী হয়েছে, না হলে আরো আগেই টের পেত। নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে ইতস্তত ভঙ্গিতে থেমে দাঁড়াল ও।

"কি ব্যাপার?" পেছন থেকে অবলালের প্রশ্ন।

"না, কি যেন একটা অনুভব করলাম বলে মনে হয়েছিল – কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।"

ভ্রু কুঁচকে এক মূহুর্ত তাকিয়ে থাকল অবলাল দরজাটার দিকে। তারপর মাথা নাড়ল, "কিছু তো টের পাচ্ছি না। হয় তোমার মনের ভুল আর নাহলে খুব দক্ষতার সাথে উপস্থিতি গোপন করে হয়েছে।"

পকেট থেকে চাবি বের করল কায়েস, "এখানে তো আর অনির্দিস্ট কাল দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, চল দেখি।"

ওর ফ্ল্যাটটা বেশি বড় নয়, একটা বেডরুম আর বড় একটা লিভিং রুম – কিচেন, বাথরুম আর একটা বারান্দা, ব্যস; অবশ্য একা মানুষের এর বেশি প্রয়োজনও পড়ে না। দোদুল্যচিত্তে চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলল কায়েস, প্রবেশ করল লিভিং রুমে।

রাতের বেলা ফিরলে – যা কিনা তার স্বাভাবিক রুটিন - ঘরে ঢুকেই বাতি জ্বালানোটা কায়েসের অভ্যাস। লাইটের সুইচটা দরজার বা দিকে, স্বভাব বসত সেদিকে ঘুরল ও – এবং খুব সম্ভব সেকারণেই বেঁচে গেলো এযাত্রা!

আক্রমনটার তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ওর ভিত পর্যন্ত টলে গেল – একেবারে শেষ মূহুর্তে অনুভব করতে পেরেছিল – ঠিক কিভাবে বলে বোঝাতে পারবে না, হয়ত ওর অনুভূতি, বা সিঁড়ির মৃয়মান বাতির যে সামান্য ছটা আধ খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে তাতে ওর চোখের কোণে কিছু ধরা পড়েছিল; কিংবা হয়ত নিছক সতর্কতা বোধ, দির্ঘদিন বিপদ নিয়ে

কারবার করায় যা ওর মজ্জায় ঢুকে গেছে। যাই হোক না কেন, আৎম্ররক্ষার সহজাত প্রবণতা থেকেই ডান হাতটা তুলে বাঁধা দেবার চেষ্টা করল ও।

গদা দিয়ে বাড়ি মারলে যেমন হবার কথা তেমনই জোরাল লাগল ওর কাছে আঘাতটা, পার্থক্য এই যে, গদা ভোঁতা হয়, কিন্তু ওকে যে জিনিষটা স্পর্শ করল তার মাথায় একাধিক ধারাল বস্তু রয়েছে। কপাল ভাল বলতে হবে কায়েসের, পুরু অয়েলস্কিনের বর্ষাতিটা কয়েক ভাঁজ করে ডান হাতে রেখেছিল, এবং সেখানেই পড়েছে ঘাটা, তাই তীক্ষ্ণধার নখগুলো ওর শরীর ছুঁতে পারল না। কিন্তু আঘাতের প্রচন্ডতায় কাঁধ পর্যন্ত অবশ হয়ে গেলো।

মুখ দিয়ে অস্পস্ট একটা আর্তনাদ বের হল ওর, টলে উঠে পিছিয়ে গেলো কয়েক পা – পিঠ ঠেকে গেলো দেয়ালে। কিন্তু তাই বলে দমে গেলো না মোটেও, ডান হাতে সাড়া পাচ্ছে না, কিন্তু বাম হাতে বিদ্যুৎবেগে ক্রস ড্র করে বের করে আনল ওর ব্রাউনিং পিস্তলটা। অবলালের হাতে সেবার হেনস্তা হবার পর থেকে রিভলবার ব্যবহার বাদ দিয়েছে ও; আগে ওই জিনিষ রাখত কারণ পিস্তলের থেকে নির্ভরযোগ্য ওগুলো, জ্যাম হয় না। কিন্তু কেউ যদি শুধু ধরে ফেলে অকেজো করে দিতে পারে তাহলে আর নির্ভরতা দিয়ে কি হবে? তার চেয়ে বরং মেশিনের ওপরই ভরসা করা ভালো, আর পিস্তলে গুলিও ধরে বেশি। চোখ কুঁচকে প্রতিপক্ষকে খোঁজার চেষ্টা করল সে, এবং যা দেখতে পেলো তাতে হীম হয়ে গেলো ওর গায়ের রক্ত।

মানুষের মতই আকৃতি বটে ওটার, হাত-পাও রয়েছে; কিন্তু ওই পর্যন্তই! পিপের মোটা মোটা ধড়, কুচকুচে কালো! উচ্চতায় সাড়ে চার ফুটের বেশি হবে না, গায়ে কোন কাপড় নেই – কিন্তু ঘন কালো রোমে ঢাকা সর্বাঙ্গ। ভয়ঙ্কর বিষয় হল, অবয়বটার মাথা বলতে কিচ্ছু নেই! কাঁধের ওপরই শেষ হয়ে গেছে শরীর। বুকের মাঝে কিছু একটা আগুনের গোলকের মত জ্বলছে – চোখ?

জান্তব বিভীষিকাটা দেখে শিউরে উঠল কায়েস, কিন্তু তাই বলে গুলি ছুড়তে ভুলল না। সাধারণ কেউ হলে ওই রকম আধো-অন্ধকারে মিস করার কথা কিন্তু শুটার হিসেবে কায়েসের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। দ্বিতীয়বার আক্রমনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসা দানবটার শরীরে পর পর দু'টো তপ্ত সীসে বিধিয়ে দিলো ও। চাপা একটা গর্জন ছেড়ে পিছিয়ে গেলো ওটা। পরক্ষণে অমানুষিক ক্ষিপ্রতার সাথে লাফিয়ে সরে গেলো ঘরের অন্ধকার কোণে।

পেছনে ক্ষীণ একটা শব্দ পেয়ে ঝট করে ঘুরতে গেলো কায়েস, কিন্তু একই সময় আবার ছুটে এলো দানবটা – ছোট ছোট লাফ মেরে, একেবেকে, ধেয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। আবার গুলি করল ও, পরপর কয়েকবার।

এবং একই সঙ্গে শুনতে পেলো অবলালের স্মিত অ্যান্ড ওয়েসনের ভারি গর্জন, ওর কানের পাশ কেটে বেরিয়ে গেলো তপ্ত সীসা – এবং পেছন থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ আর্তনাদ।

"সাবধান কায়েস!" লাথি মেরে দরজাটা পুরো খুলে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল অবলাল, "ওগুলো স্কন্ধকাটা! চোখে এইম কর!"

সিঁড়ি থেকে আসা আলোর মাত্রা একটু বেড়ে যেতে আগের চেয়ে ভালো করে দেখার সুযোগ হল কায়েসের – কমপক্ষে পাঁচটা গুলি হজম করেছে স্কন্ধকাটাটা, মেঝের ওপর ঝরে পরছে

ওটার কালচে লাল রক্ত; কিন্তু তাই বলে থেমে নেই ওটা! চরকির মত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। সুযোগ খুঁজছে কায়েসের অব্যর্থ লক্ষ্যকে ফাঁকি দিয়ে কাছে আসার। ওদিকে আবার গুলি করেছে অবলাল এবং কায়েসকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে। পেছনে যা আছে তাকে ওর ওপরই ছেড়ে দিল কায়েস – নিজের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল সামনের মূর্তিমান আতঙ্কটার ওপর। এমন ভাবে লাফাচ্ছে ওটা, গুলি লাগানোই কঠিন, তারওপর চোখে লাগাতে হবে!

ওদিকে অবশ ভাবটা কেটে গিয়ে ডান হাতের ব্যাথাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দাঁতেদাঁত চেপে সহ্য করল কায়েস, বারবার গুলি করতে হচ্ছে ওকে স্কন্ধকাটাকে দূরে সরিয়ে রাখতে – পিস্তলটায় ১৩ রাউন্ড ধরে, আর ক'টা বাকি আছে কে জানে?

এক কদম ডানে সরে ভালো মত তাক করল এবার সে, সুযোগ বুঝে তেড়ে আসছিল দানবটা, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ওটার চোখে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিল ও। ঝুপ করে একতাল মাংস পিন্ডের মত আছড়ে পড়ল ওটা, এতটাই কাছে যে গলিত চোখ ছিটে এসে লাগল কায়েস শার্টে। ফোস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল কায়েস, হাপরের মত হাঁফাচ্ছে – তবে পরিশ্রমে নয়, উত্তেজনায়।

ঘুরে অবলালের কি অবস্থা দেখতে যাবে এমন সময় হালকা, খুব হালকা একটা সুগন্ধ এল ওর নাকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত – কারণ ঘরের বদ্ধ বাতাসে পোড়া করডাইটের তীব্র কটু গন্ধ, তার সাথে যোগ হয়েছে স্কন্ধকাটার গায়ের উৎকট বোটকা গন্ধ; এর মাঝে সুবাস কোথেকে আসবে? কি এক অজানা কৌতুহল ভর করল ওর ওপর, অনুভূতিটা এতটাই প্রখর যে বন্ধুর বিপদকে উপেক্ষা করে সামনে তাকালো আবার।

###

দীর্ঘ একটা মূহুর্ত, সময় যেন স্থির হয়ে গেছে। স্থবির হয়ে গেছে কায়েসও – একি দেখছে ও? স্বপ্ন? কিন্তু স্বপ্ন কি এতটা বাস্তব হয়? আর তাহলে ডান হাতের তীব্র ব্যাথাটাই বা অনুভব করছে কি করে? স্বপ্নে তো কোন ব্যাথা থাকে না!

অপার্থিব, এ অসম্ভব! হ্যাঁ, কি সম্ভব আর কি নয় তার সংজ্ঞা এখন অনেকটাই বদলে গেছে ওর কাছে – কিন্তু তারপরও, সব কিছুরই একটা সীমা আছে; এ কি করে হয়?

ওই তো মাত্র কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, কে ও ? বুকের ভেতর একটা অব্যক্ত ব্যাথা চিন চিন করে উঠল কায়েসের। কত বছর - আট, দশ, নাকি আরও বেশি? । আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে ও! যদিও আবছা আলো, তবু কি করে যেন ওকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। সেই টানাটানা মায়াবী চোখ, ঠোঁটের কোনে রহস্যময় হাসি, তবে একটু যে মোটার ধাত ছিল তা আর নেই। নাকটাও বোধহয় আগের থেকে টিকলো হয়েছে? কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে আসা দিঘল কালো চুল, মাখন রঙা ত্বক, মানুষ নয় যেন দেবী! আজও অতি পরিচিত, আজও অতি আপন – কিন্তু, কিন্তু সামিয়া তো মৃতা!

নিমিষের মধ্যে হাজারটা অল্পমধুর আর তীব্র বেদনাদায়ক স্মৃতি খেলে গেলো কায়েসের মনে। আবেগের সর্বগ্রাসী একটা ঢেউ আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। সেই কলেজ লাইফে পরিচয় – সেই নানা ছুতোয় খুঁজে পরস্পরকে চেনা। প্রেম। একসাথে ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি নিয়ে পড়া। ওর বোহেমিয়ান জীবন নিয়ে সামিয়ার অভিযোগ। পুলিশে ঢুকবে শুনে প্রথমে চোখ কপালে তোলা – তারপর অভিমান। বিয়ের প্রস্তুতি। এবং সবশেষ মৃত্যুর কড়াল করাল থাবায় বিচ্ছেদ। মাঝে টুকরো টুকরো কত ঘটনা, কত মান অভিমান, কত খুনসুটি, অব্যক্ত কত কথা – কোনদিন আর বলা হবে না।

এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলো, আর কারো দিকে ফিরেও তাকায়নি কায়েস। ভালবাসতে পারেনি অন্য কাউকে, সে বোধই জন্মায়নি মনে। আজ ওর এই কাটখোট্টা স্বভাবের পেছনের ইতিহাসটা বড়ই করুণ। লঞ্চ ডুবিতে মৃত্যু – এমনকি লাশটাও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু একি দেখছে ও? ওই তো ওর হারিয়ে যাওয়া ভালবাসা, ওই তো সামিয়া! দু'পা এগোলেই ছুঁতে পারবে! স্বাভাবিক বোধ লুপ্ত হয়েছে কায়েসের। ঘোরের ভেতর চলে গেছে যেন ও। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, বিহ্বল ভঙ্গিতে এক পা এগলো সামনে। তারপর আরও এক পা। এই তো এসে গেছে নাগালের মধ্যে! হোক অসম্ভব, কেয়ার করে না কায়েস, এবার বুকের সাথে চেপে ধরে রাখবে ওকে – দেবে না আর কিছুতেই হারাতে। উল্টে যাক বিশ্ব, ঘটুক মহা প্রলয়, কিচ্ছু আসে যায়না আর! ওকে ছোঁয়ার জন্যে কাঁপা কাঁপা হাত উঁচু করল কায়েস।

"আলরেশো রালারোশা" চাপা কিন্তু পরিস্কার কণ্ঠে ধ্বনিত হল অদ্ভুত শব্দ দু'টো – একই সঙ্গে মাথার তালুতে একটা তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক শকের মত লাগল কায়েসের। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল একটা ঝিম ধরা অনুভূতি। অবশ হয়ে এলো গোটা দেহ – ভাঁজ হয়ে গেলো হাঁটু, বসে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু মস্তিস্ক সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে ওর।

চোখের সামনে যা দেখতে পেল তাতে সর সর করে দাঁড়িয়ে গেলো ঘাড়ের কাছের ছোট চুলগুলো। যুগপৎ বিস্মিত এবং আতঙ্কিত বোধ করল ও – এতটা ভয় জীবনে আর পেয়েছে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তার চেয়েও অতীব পীড়াদায়ক অন্য একটা বোধ ছাপিয়ে গেলো সেই ভয়কেও। কেউ যেন ওকে স্বর্গ ফিরিয়ে দিয়ে আবার কেড়ে নিয়েছে, এক নিষ্ঠুর প্রলোভনে! কোথায় সামিয়া! সামনে দাঁড়ান ওটা কী? নরকের কোন অতল গহ্বর থেকে উঠে এসেছে? উত্তপ্ত মস্তিকের সবথেকে ভয়াল কল্পনাকেও যেন হার মানাবে ওই পৈশাচিক মূর্তি!

সাধারণ নারীদের তুলনায় বেশ লম্বা ওটা - শীর্ণ দেহ, এক খণ্ড সাদা কাপড়ে আবৃত – তবে কাপড়টা মোটেও পরিস্কার নয়। জায়গায় জায়গায় লেগে আছে মাটি, শুকনো রক্ত আর পোড়া দাগ। শনের মত এলো চুল, নোংরা – নেমেছে কাঁধ ছাড়িয়ে। মুখটা কুঠারের মত, লম্বা বাঁকা নাক। ঠোঁটের কোণ থেকে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে শ্বদন্ত, পাশে লেগে আছে শুকনো রক্তের দাগ। চোখ দুটো ছানি পড়া রোগীর মত অস্বচ্ছ – তাতে ঘষা কাঁচের মত স্থির দৃষ্টি। কিন্তু সব থেকে ভয়াল হচ্ছে তার পা দু'টো। বুড়ো আঙ্গুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা - তাতে আরও লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু সেটা দেখে ভয় পায়নি কায়েস – গায়ে কাঁটা দেবার মত ব্যাপার হচ্ছে, মূর্তিটার পায়ের পাতা দু'টো উল্টো! আঙ্গুলগুলো পেছন দিকে, গোড়ালি সামনে। বিষয়টার মাঝে

এমন একটা অপার্থিব অস্বাভাবিকতা রয়েছে যে ঠিক মেনে নেয়া যায় না। একটা সূক্ষ্ম কিন্তু একই সঙ্গে প্রকট নিয়ম বহির্ভুত ব্যাপার।

কায়েসের ঘোর কেটে গেছে বুঝে খনখনে গলায় বীভৎস হাসি হেসে উঠল পিশাচীটা। পরক্ষণে শীর্ণ একটা হাত তুলে ছোবল বসাতে গেলো ওর গলা লক্ষ্য করে – সেই হাতে রয়েছে শিকারি পাখির মত বাঁকা, তীক্ষ্ণধার নখ! সম্পূর্ণ মাত্রায় বিহ্বল অবস্থা কায়েসের, বাঁধা দেয়া দূরে থাক – নড়তে পর্যন্ত পারল না ও। গলায় ওই থাবা খেলে নিশ্চিত মৃত্যু, বুঝতে পেরেও অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারছেনা।

ঘরের ম্রিয়মাণ আলোতেও ঝলকটা দিব্যি চোখে পড়ার মত – ঠান্ডা, নীলচে, ধারাল ইস্পাতের আঘাতে পিশাচীর শরীর থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে গেলো হাতটা, ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। আর মূহুর্তের ভগ্নাংশ দেরী হলেই বিদীর্ণ হয়ে যেত কায়েসের কণ্ঠনালী। প্রকান্ড এক লাফ দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে অমানুষিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মূর্তিটা – এতটাই তীক্ষ্ণ আর তীব্র সে আওয়াজ, কায়েসের মনে হল কানের পর্দা বুঝি ফেটে যাবে।

উত্তরোত্তর বেড়ে চলল শব্দের জোর, ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল শোকেসের কাঁচ, একই দশা হল লাইটেরও। বাম হাত দিয়ে বাম কান চেপে ধরল কায়েস – ডান হাত নড়াতে পারছে না, তাই ডান কান অরক্ষিত। ওর মনে হল বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। আবছা ভাবে দেখতে পেল, খোলা তলোয়ার হাতে পৈশাচিক অবায়বটার দিকে ছুটে যাচ্ছে অবলাল। কিন্তু ওটাও কম ক্ষিপ্র না, সাপের মত একেবেকে একছুটে চলে গেলো দরজার কাছে – পেছন থেকে সাই করে তলোয়ার চালাল অবলাল, কিন্তু কাপড়ের একটা খণ্ড ছাড়া আর কিছু কাটতে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে দমকা বাতাসের মত বেরিয়ে গেলো ওটা। দূরে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে এলো চিৎকারের আওয়াজ, তারপর থেমে গেলো হঠাৎ করেই।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল অবলাল। স্বগতোক্তির সুরে বলল, “ঢাকা শহরে চুড়েল! স্বপ্নেও ভাবিনি!” ঘুরে কায়সের দিকে তাকাল ও, “তুমি ঠিক আছো?”

বারো

“রক্তের মাঝেই আছে সকল প্রশ্নের উত্তর!” কণ্ঠটা একঘেয়ে - কেমন যেন বিজাতীয়, বুড়োটে গলা। মনে হচ্ছে কথকের খুব কাশির ব্যামো – কিন্তু সে তা চেপে রাখছে।
“আবার!” তিক্তমনে বক্তাকে খুঁজল সে, ওইতো; বরাবরের মতই – মুখ দেখা যাচ্ছে না, শরীর তো নয়ই; তবে চোখ দু’টো দৃশ্যমান। চিনাদের মত ছোট ছোট এক জোড়া চোখ, কিন্তু তাতে কি তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! না - আবেগপূর্ণ চোখে প্রেমিক যখন প্রেয়সীর ভেতরটা দেখে নেয়, সেরকম অন্তর্ভেদী নয়, বরং ছোট বাচ্চা দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা খেলে রাগী শিক্ষক যেভাবে তাকায় অনেকটা সেধরণের; কিন্তু অত্যাধিক প্রখর।

এই জিনিসটাই সবথেকে বেশি রাগায় তাকে, কেউ তাকে বাচ্চা মনে করুক বা সেরকম ভাব দেখাক তা একদমই সইতে পারে না অরণী। পারবেই বা কেন? বয়স তো আর কম হল না, প্রায় তিরিশ ছুই ছুই করছে - তাকে আর এমনকি তরুণীও বলা যায় না; কিন্তু লোকে এখনও এমন আচরণ করে যেন সে হাই স্কুলে পড়া এক কিশোরী - সন্ধ্যা নামলেই বেণী দুলিয়ে পড়তে বসবে! মানে ভান করবে আর কি, আসলে অপেক্ষায় থাকবে প্রেমিকের চিঠির, অবশ্য আজকাল মনে হয় আর চিঠি লেখার চল নেই।
“সঠিক রক্তকে খুঁজে বের করতে হবে – সে তোমার কাছেই আছে, এড়িয়ে যেও না!” ঢিমেতেতালা ভাঙ্গা রেকর্ডের মত বলে যাচ্ছে কণ্ঠটা, “একমাত্র সেই পারবে ঠেকাতে, নাহলে মহা বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী! সাবধান, সময় খুবই মূল্যবান!”
তোর বকবকানির তুলনায় যেকোন কিছুই মূল্যবান, ব্যাটা বুইড়া রামছাগল! বলতে ইচ্ছে হল তার, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঠোঁট নাড়াতে পারল না – কখনোই পারে না।
প্রত্যেকবার সেই একই হেঁয়ালি পূর্ণ কথা, একই পরিবেশ, আর সহ্য হয় না। আর এটা নিয়ে রিপোর্ট করাতেই কিনা এখন ছুটি থেকে জরুরী তলবে ডেকে নেয়া হয়েছে তাকে। যত্তসব! আর ভালো লাগে না।
“অল প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড টু ফ্যাসেন দেয়ার সীট বেল্টস। উই উড বি ল্যান্ডিং অন ঢাকা শর্টলি...” মাইক্রোফোনে ভেসে আসা এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠ যেন বাঁচাল তাকে। মিলিয়ে গেলো কুতকুতে চোখ দু’টো; নিজের চোখ খুলে মিটমিট করে চাইল সে চারপাশে। বাইরে এখনো ভোর হয়নি, প্লেনের ভেতরে আবছা অন্ধকার, সামান্য টার্বুলেন্স হচ্ছে, পাইলট ব্যাটা মনে হয় তেমন ঝানু না! ভাবল সে।

ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি, ল্যান্ডিংয়ের আগে ফ্রেশ হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু এখন আর সীট ছেড়ে ওঠা যাবে না। লম্বা জার্নি করতে হয়েছে, এখন রেস্টরুমে যাবার জন্য ল্যান্ডিং প্রক্রিয়াটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা সুখকর হবার কথা নয়। আর না ঘুমুলে ওই আজগুবি বিরক্তিকর স্বপ্নটাও আবার দেখতে হত না।

দুঃস্বপ্ন অবশ্য ওটাকে বলা যায় না, বুড়োটে গলায় ঝাড়া কয়েকটা উপদেশ বিরক্তি উৎপাদক হলেও ভয়াল কিছু নয়; কিন্তু একই স্বপ্ন দিনের পরদিন চোখ মুদলেই দেখতে পেলে একপর্যায় তা অসহ্য হয়ে ওঠে বইকি। কোন বৈচিত্র্য নেই, সেই একই কথা, একই ঘ্যানঘ্যানে গলায় আউড়ে যায় কণ্ঠটাঃ রক্ত, সঠিক রক্ত, সাবধান, বিপর্যয়, সময়, মূল্যবান! মুখস্ত হয়ে গেছে – কি ছাই ঘোড়ার ডিম মানে এর তা কে বলবে? আপাতত ওই ঝামেলা বিদায় হয়েছে তাতেই সে খুশি।

ল্যান্ড করার পর সবার মত তাড়াহুড়ো করল না সে। একটু সময় নিয়ে ভিড় কমলে পরই নামল, যদিও ওয়াশ রুমে যাওয়াটা বিশেষ দরকার, কিন্তু হুড়োহুড়ি তার একদমই নাপছন্দ। লাগেজের লাইনে গিয়ে যখন দাঁড়ালো, অরণীকে আর চেনার উপায় নেই। প্রথমত ওর গায়ের ভারি কার্ডিগানটা বিদায় নিয়েছে – চিলি থেকে যখন প্লেনে চেপেছিল, সেসময় ওখানে হাড় কাঁপানো শীত, ওটার ওপর একটা ভারী জ্যাকেটও পড়তে হয়েছিল ওকে এয়ারপোর্টে আসার সময়। তারপর প্রায় পুরোটা রাস্তাই হয় বিমানে না হয় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিমানবন্দরে অবস্থান করায় আর ওটা ছাড়ার প্রয়োজন পড়েনি, কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান আবহাওয়াতে তো আর শীতের কাপড় পরে থাকার মানে নেই।

তবে শুধু সেটা না, ওর চোখের রঙও এখন বদলে গেছে – কন্টাক্ট লেন্সের বদৌলতে। একটু আগের নীলচে চোখ আর নেই, কালো মণি শোভা পাচ্ছে সেখানে। এছাড়া একটা স্কার্ফে ঢাকা পড়েছে চুল, এখন আর কেউ ওর মোলায়েম বাদামী কেশ দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে না। এই দু'টো বিষয় বাদ দিলে একজন বাঙালি নারীর সাথে অরণীর তেমন কোন সুরতগত পার্থক্য নেই। একটু হয়ত লম্বা, তবে ওটা অস্বভাবিক কিছু না। গায়ের রঙ মাঝারী, মুখায়ব অনিন্দ্য সুন্দর হলেও তা দেশীয় ধাঁচেরই, মায়ের থেকে পাওয়া। ওর ইটালিয়ান বাবার চোখ আর চুল ছাড়া তেমন কিছুই পায়নি অরণী, অবশ্য স্বভাবের কথাটাও খাটে – অন্তত কিছুটা।

সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার চালু আছে, তাছাড়া এখনও সূর্য ওঠেনি তবুও বেশ গরম লাগছে ওর। লাগেজের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে আর ভাবছে, কতদিন পর এলো?

ভাষাটা কি এখনো আগের মত বলতে পারে? বারো বছর অনেক লম্বা সময় – তাছাড়া আগেও যে খুব ভালো দখল ছিল তা না। নিজের মনেই মাথা নাড়ল সে। লাগেজ এসে গেছে – বিজনেস ক্লাসের মজাই আলাদা, ভাগ্যিস টিকেট নিজের কাটতে হয়নি!

কাস্টমস এর ঝামেলা কাটিয়ে বেরিয়ে এলো অরণী – ওর কাছে চালু সিম নেই, এখানকার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করা তাই সম্ভব হয়নি। তবে সেন্ট্রাল থেকে বলা হয়েছে যে সে হাজির থাকবে – মনে হতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। আর কোনদিন ওই লোকটার মুখ দেখতে হবে ভাবেনি ও।

সত্যি বলতে কি, বিদেশে বড় হলেও মায়ের দেশের প্রতি ওর একটা নিবিড় টান আছে কিন্তু তবু গত বারো বছর আসেনি এদেশে এই একটা মাত্র কারণে। আসলে ওই লোকটার সাথে

দেখা হয়ে যেতে পারত! অথচ এবার আসতেই হল এবং তার সাথেই কাজ করতে হবে! ভাবতেই সারা গা চিড়বিড় করে উঠল ওর, রাগে।

একবার ভেবেছিল উপেক্ষা করে – কিন্তু হাই কমান্ড, না মেনে উপায় নেই। এই একটা ব্যাপারে ওপরঅলারা বড্ড কড়া – অন্তত ওর বেলায়।

ভোর হচ্ছে কেবল, কিন্তু এয়ারপোর্টে ভীড়ের কমতি নেই। তীক্ষ্ণ নজরে গেটের কাছে সবার ওপর চোখ বোলাল অরণী, কই সে? ও নিশ্চিত যে দেখা মাত্র তাকে চিনতে পারবে। বারোর জায়গায় চব্বিশ বছর পেরিয়ে গিয়ে থাকলেও পারত, কিন্তু না! নেই তো! অথচ সে কখনো দেরী করে না, কক্ষনো না!

আজব! বিড়বিড় করল অরণী – কোথাও কি কোন ভুল হল? নাকি কোন দুর্ঘটনা? ব্যাপারটা চিন্তা করে মিশ্র অনুভূতি হল ওর, তার কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে ও কেমন বোধ করবে? খুশি হওয়াই তো উচিৎ, নাকি? কিন্তু মন থেকে ঠিক সদুত্তর পেল না। মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে দূর করে দিতে চাইল – বলা যায়না বারো বছর অনেক লম্বা সময়, হয়ত সে বদলে গেছে, যদিও ব্যাপারটা ওর নিজেরই বিশ্বাস হল না।

গলায় ঝোলানো বিশাল কালো সানগ্লাসটা তুলে চোখে দিল ও, বরাবরের অভ্যাস – রোদ থাকুক আর নাই থাকুক বাইরে গেলেই পরে, রাতেও অনেক সময় খুলতে ভুলে যায়!

"এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম! আপনার নাম কি অরণী মোরেস?"

ঝট করে ঘুরল অরণী, এখানে কারোই ওর নাম জানার কথা না, একমাত্র স্থানীয় এজেন্ট ছাড়া। কিন্তু তার কণ্ঠ চিনতে তো ওর ভুল হবে না – দুনিয়া উল্টে গেলেও না!

ওর যা পেশা তাতে অপরিচিত কারো পক্ষে ওর পরিচয় জেনে ফেলা খুব একটা সুখকর নয়, বরং বিপজ্জনক। তাছাড়া এই মূহুর্তে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত রয়েছে ও, আৎম্ররক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কোন উপকরণই নেই সঙ্গে; তাই কিছুটা উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল অরণী।

নিতান্তই বাচ্চা একটা ছেলে, এখনো ঠিকমত দাঁড়ি-গোফই ওঠেনি। লম্বা, হালকা পাতলা স্বাস্থ্য – সুদর্শন চেহারার সাথে বেশ মানিয়ে গেছে মায়াকাড়া চোখ দুটি। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে – অমায়িক হাবভাব।

"কে আপনি?" পাল্টা প্রশ্ন করল অরণী।

###

"ঠিক?" মুখ বাঁকাল কায়েস, "বেঁচে যে আছি এই কি বেশি নয়?"

কাষ্ঠ হাসল অবলাল, "তা অবশ্য ভুল বলনি!" দ্রুত পায়ে কায়েসের দিকে এগিয়ে এলো সে, "কোথায় লেগেছে?"

বাম হাতের তর্জনির সাহায্যে ডান হাত দেখাল কায়েস। "মন হয় ভেঙ্গে গেছে!"

"দেখি আমি।" বলে হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে পড়ল অবলাল।

"তুমি ডাক্তারিও জান নাকি?" সন্দিহান ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল কায়েস।

“তা জানি না, কিন্তু আমার লাইনে কাজ করতে হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে ধারণা থাকতে হয়।”

“হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু আগে আমাদের যেটা করতে হবে তা হচ্ছে কৌতূহলী জনতাকে সামাল দেয়া।” বলে উঠে দাঁড়াল কায়েস, ব্যাথায় বিকৃত হয়ে আছে ওর মুখ – ডান হাত আর ডান কান দু’টোই ভালো রকম জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওসব ভাবার সময় এখন নেই। যে নরক গুলজার হয়ে গেছে তাতে করে যখন তখন হাজির হয়ে যাবে অতি উৎসাহী লোকজন এবং ওর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যেকোন মূল্যে তাদের বিদায় করা।

অবলালকে অনুসরণ করার ইশারা করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল সে, আটকে দিল দরজা। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল প্রথম দর্শকের আবির্ভাব ঘটার।

বেশিক্ষণ লাগল না, দু’মিনিট না পেরোতেই একসাথে বেশ কয়েকজনকে দেখা গেলো। সবাই এ ভবনেরই বাসিন্দা – উদ্বিগ্ন, পাংশু মুখে উঁকি ঝুঁকি মারছে। তাড়াতাড়ি তাদের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওকে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল লোকগুলি, কারণ ওর পুলিশ পরিচয় কমবেশি সবাই জানে। “আপনারা বিচলিত হবেন না।” কর্তৃত্ব পূর্ণ গলায় ঘোষণা করল কায়েস, “কয়েকজন ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল আমাকে আক্রমণ করেছিল, তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। দয়া করে ভিড় না জমিয়ে যার যার বাসায় ফিরে যান।”

নড়তে খুব একটা ইচ্ছুক মনে হল না কাউকে, সকলেই আরও বিস্তারিত জানতে চায়। এবার এগিয়ে এলো অবলাল। গলা উঁচিয়ে বলল, “কথা কানে যায় না? যান বাসায় যান!” কায়েস একজন চেনা মুখ, এবং পুলিশ; কিন্তু ওর কথায় কাজ হয়নি। অথচ অপরিচিত অবলালের কন্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হবার সাথে সাথে কে কার আগে কেটে পড়বে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি লেগে গেলো। মিনিট পেরোনোর আগেই সিঁড়ি ঘর ফাঁকা!

তির্যক চোখে অবলালকে দেখলো বিস্মিত কায়েস, “বুঝলাম না! তোমার কথাকে ওরা এত গুরুত্ব দিল কেন?”

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অবলাল, বলল, “ঘরে চল, তোমার হাতটা দেখা দরকার। আরও অনেক কাজ বাকি আছে।”

আধ ঘন্টা পর, কায়েসের বেডরুমে একটা ইজি চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে আছে অবলাল। কায়েস ওর নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে ঘরটাতে। আরামদায়ক পরিবেশ। কোন রকমে সাফ সুতরো হয়ে নিয়েছে ওরা। লিভিং রুমটাকে জাতে আনা অবশ্য বাকি আছে তবে ওটা সকালের আগে ধরবে না, শুধু স্কন্ধকাটা দু’টোর মৃতদেহকে বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে এক কোণে ফেলে রেখেছে – বাকিটা পরে দেখা যাবে।

“কপাল তোমার ভালোই বলতে হবে,” মন্তব্য করল অবলাল, “হাড় ভাঙ্গেনি, তবে বাজে ভাবে থেঁতলে গেছে মাংসপেশী – বেশ ক’দিন ভুগবে। ভাগ্যিস ওই বর্ষাতিটা ছিল হাতে।”

“এইবার তুমি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেও!” অবলালের কথাকে পাত্তা না দিয়ে অধৈর্যের মত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কায়েস।

“কিন্তু কথা তো ছিল তুমি খুলে বলবে কি সমস্যা!” অবলাল নির্বিকার।

“চুলোয় যাক কি কথা ছিল!” কায়েসের গলায় উত্তেজনা, “আগে বল তুমি কি করেছিলে সে সময় রাস্তায় যে আমি প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিলাম? তারপর ঘরে ওটা কি ছিল – ওই পিশাচীর মূর্তিটা? আর আমার ওপর কি করেছিল ওটা? লোকগুলোই বা তোমার কথায় এত গুরুত্বদিল কেন? আর কেনই বা আমার ওপর এই ভয়ঙ্কর হামলা হল? তুমি আগে থেকে বুঝলে কি করে যে কিছু একটা হবে?” এক নিশ্বাসে প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিয়ে হাঁফাতে লাগল কায়েস।

“ধীরে বন্ধু ধীরে!” অবলাল অবিচল, “সবগুলোর উত্তর তো আমি জানিও না, আর জানলেও এতকিছুর জবাব একসাথে দেব কি করে?”

“প্রথম থেকেই শুরু করি,” নিজেকে সামলে নিয়েছে কায়েস, ওর স্বর এখন ঠাণ্ডা, “কি করেছিলে তখন রাস্তায়?”

“নাছোড় বান্দা দেখছি,” বিরক্ত গলায় বলল অবলাল, “যাই করে থাকি, আমাদের বর্তমান কেসের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি বরং কাজের কোন প্রশ্ন থাকলে কর নাহলে আমাকে খুলে বল ঘটনা কি?”

“এড়িয়ে যাবার কি দরকার বুঝলাম না!” অসহিষ্ণু স্বরে বলল কায়েস, “পুরো ব্যাপারটার আগা মাথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, তাই অস্বাভাবিক প্রত্যেকটা বিষয়ই জানা থাকা দরকার।”

“হাহ! অস্বাভাবিক এত কিছু এই জগতে রয়েছে যে তা বলা শুরু করলে আজ রাত তো কোন ছার, এজীবনেও ফুরাবে বলে মনে হয় না!”

“আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বল ওই পিশাচীটা কি ছিল?”

“ওটা একটা চুড়েল,” নিজের দাঁড়িতে হাত বোলাল অবলাল, “সন্তান প্রসবের সময়ে স্বামী বা অন্য কোন অতি নিকট আত্মীয়ের অবহেলায় স্বরূপ তীব্র আক্ষেপ নিয়ে কোন সতি নারীর মৃত্যু হলে সে চুড়েলে পরিনত হতে পারে! মৃত্যুর পূর্বে তার মনে যত বেশি ঘৃণা জন্মাবে, ততই ভয়ঙ্কর হবে তার রূপ!”

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল কায়েস, “কি ভয়ঙ্কর!”

“আসলেই ভয়ঙ্কর!” সায় দিল অবলাল, “চুড়েলরা মায়াবী, অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু যে পুরুষকে আক্রমণ করে তার মনের গভীর থেকে অতীত স্মৃতিকে টেনে তুলতে পারে ওরা – যার ফলে ঘোরের মধ্যে চলে যায় পুরুষটি এবং তখন তাকে বশ করে ফেলে চুড়েল!

তোমাকে আমি তখন জাগিয়ে না তুললে ওর হাতের পুতুলে পরিনত হতে তুমি এবং তোমার জীবনিশক্তি শুষে নিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করত ওটা। এই চুড়েলটা বেশ শক্তিশালী ছিল বলেই মনে হয়েছে আমার আর না হলে এত দক্ষতার সাথে উপস্থিতি গোপন করতে পারত না; যতদূর বোঝা যায়, আর কয়েকটা পুরুষকে বশ করতে পারলেই ডাকিনীতে পরিনত হবে ওটা!”

“ডাকিনী আবার কি?”

“বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা কঠিন, সহজে ব্যাখ্যা করলে চুড়েলেরই একটা পরিনততর রূপ। তবে ওদের ক্ষমতা আরও অনেক ব্যাপক হয়।” দম নেবার জন্যে এক মূহুর্ত বিরতি দিল অবলাল, “আমরা যারা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কাজ করি তাদের একটা মাপকাঠি আছে। সুপারন্যাচারাল ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এক এক ধরণের অতিপ্রাকৃতের জন্যে বিভিন্ন থ্রেট লেভেল নির্নয় করা হয়ে থাকে।”

কৌতূহলী হয়ে উঠে বসল কায়েস, “আচ্ছা!”

অবলালের ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল, “যেমন ধর সাধারণ পিশাচকে সাদা স্তরে ফেলা হয়, সেখানে একটা ডাকিনীর স্তর হবে নীল বা হলুদ!”

“তা স্তরগুলি কি কি?”

“সাদা, কমলা, নীল, হলুদ, লাল, ধুসর এবং কালো।” বলল অবলাল, বেলা বাড়ার সাথে সাথে আকাশের রঙ যেভাবে পালটায় তার সাথে মিল রেখে এই মাপ কাঠি তৈরি হয়েছে।

“আকাশ আবার লালও হয় নাকি?” সন্দিহান ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল কায়েস।

“তা হয়ত হয় না, কিন্তু সন্ধ্যার আগে আগে পশ্চিমে যখন সূর্যটা ডুবতে বসে তখন তার রঙটা কি থাকে খেয়াল করে দেখো।”

“তা ঠিক কি করে বোঝা যায় কার কতটা অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে?” কায়েসের জ্ঞান পিপাসা যেন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

“অতিপ্রাকৃত শক্তির মূল ধরণ দুটো,” ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে চলল অবলাল, “প্রথমত শারীরিক ক্ষমতা, কিন্তু এটা মূখ্য নয়। কারণ শারীরিক শক্তি যদিও ভয়াবহ হতে পারে কিন্তু অলৌকিক শক্তির সামনে তা নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। অলৌকিক শক্তিকে নানা ভাবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এর মূল উৎস সাধারণত একটাই – ‘মানা’!”

“মানা?”

“হ্যাঁ, মানা হচ্ছে সৃষ্টির মৌলিক শক্তির একটা রূপ। একে ব্যবহার করেই প্রায় সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত কার্য সাধন করা হয়ে থাকে। একজন কতটা মানা ধারন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তার ওপরই নির্ভর করে তার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা কতটুকু!” একটু বিরতি দিল অবলাল, “তোমার মত যারা সেন্সেটিভ, তারা মানা অনুভব করতে পারে খুব সহজেই। সামান্য প্রশিক্ষণ পেলে তুমি তাই আমার থেকে অনেক ভালো ভাবে অলৌকিক শক্তি পরিমাপ করতে পারবে।

কিন্তু আমরা মনে হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি, এসব নিয়ে পরে কোন সময় বিশদ আলোচনা করা যাবেক্ষণ।”

ওর শেষ কথাটাকে উপেক্ষা করল কায়েস, “তুমি যে ঢাকা শহরে চুড়েল দেখে অবাক হলে তার কারণ কি?”

“নিম্ন শ্রেণীর সুপারন্যাচারালেরা সাধারণত লোকালয়, ভিড়ভাট্টা থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলে, অজ পাড়া গায়ে ছাড়া চুড়েলের দেখা মেলা খুবই অস্বাভাবিক।”

“বুঝলাম, সিঁড়িতে কি করে লোকগুলোকে বিদায় করলে তা বল।”

বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অবলাল, “নো কমেন্ট! বললাম তো এসব নিয়ে পরে আলাপ হবে, এখন তোমার সমস্যার কথা বল।”

লম্বা করে দম নিল কায়েস, বুঝতে পারছে কোন বিশেষ কারণে কিছু একটা চেপে যেতে চাইছে অবলাল তাই আপাতত ওকে আর না ঘাটানোর সিদ্ধান্ত নিল সে, “ঠিক আছে।”
সকাল থেকে শুরু করে ওদের দেখা হবার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে একে একে ব্যাখ্যা করে বলে চলল ওঃ থানায় জরুরি তলব, লাশ দেখতে যাওয়া – সেখানে অদ্ভুত অনুভূতি, দুলুর অস্বাভাবিক আচরণ, সোবাহানের সাথে সাক্ষাত, হাসপাতালের গোলাগুলি, কিছুই বাদ দিল না।

মনযোগী শ্রোতা হয়ে চুপ করে শুনে গেলো অবলাল, শুনতে শুনতে ওর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল; এমনিতেই গম্ভীর থাকে এখন আরও গম্ভীর হয়ে গেলো ওর ভাব ভঙ্গি। কায়েসের বক্তব্য শেষ হতে পকেট থেকে একটা পাইপ বের করল ও, সময় নিয়ে তামাক ঠেসে অগ্নি সংযোগ করল তাতে। একবুক ধোঁয়া টেনে নাখ মুখ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, “যা ভেবেছিলাম পরিস্থিতি তার থেকেও অনেক বেশি গোলমেলে মনে হচ্ছে!” চার বছরের পরিচয়ে এই প্রথম ওর গলায় উদ্বেগ লক্ষ্য করল কায়েস।
“কি বুঝলে খুলে বলবে?” কায়েসের নিজের কণ্ঠের উৎকণ্ঠাটাও চাপা থাকল না।

তের

ধীরে ধীরে ঘুম থেকে জেগে উঠল সে, চোখ দু'টো আস্তে করে খুলে গেল। আড়মোড়া ভাঙ্গার জন্যে ওপরে তুলতে গেলো হাত দু'টি, কিন্তু আধাআধি তুলেই থেমে যেতে হল – সোঁদা মাটির সাথে ঠেকে গেছে হাত!

এত বছর হল কিন্তু এই একটা ব্যাপার আজও অভ্যাস হয়নি তার, জাগার পরপর নিজে কি বা কোথায় আছে তা মনে থাকে না।

"হুউউয়াক্কা হুয়ায়ায়া!" শেয়ালের ডাক শোনা গেল হঠাৎ। সন্তুষ্টির ছোট্ট এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। যা দিনকাল পড়েছে, ইদানিং আর এসব তেমন শোনা যায় না! এমনিতেই ছোট, বদ্ধ জায়গা তার ওপর পাশেই রয়েছে ঠাণ্ডা আর শক্ত একটা কংকাল! – নড়াচড়া করতে বড্ড ঝামেলা! তাই কবরের ওপরের ফোকর গলে আস্তে করে বেরিয়ে এল সে, কুকুরের মত গা ঝাড়া দিল – উদ্দেশ্য মাটি ঝেড়ে ফেলা, তবে তাতে কতটা কাজ হল বলতে পারবে না।

ওপরে মেঘ মুক্ত আকাশ – সেদিকে তাকিয়ে তারার অবস্থান দেখে আন্দাজ করল রাত আটটার মত বাজে। যদিও রাতের তৃতীয় প্রহরের আগে সময় জানার প্রয়োজন নেই তার, কিন্তু অভ্যাস। পুরনো স্বভাব সহজে বদলায় না!

তার নাম তরন্দীদেব, অবশ্য আসল নাম নয় – আগের নাম সে কবেই ভুলে গেছে, মনে করার ইচ্ছেও নেই। আজ তার ডাক পড়েছে, যেতে হবে অনেক দূর, তাই আগে ভাগে জেগেছে – নাহলে মধ্যরাতের পর উঠত।

বেশ অবাক হয়েছে তরন্দীদেব – কে এই সুস্ময় ভট্টাচার্য? এমনিতে তার সাথে যোগাযোগের জন্যে যারা আসে তারা জীবন হাতে করে মধ্যরাতে তার ডেরায় হাজির হয়। তাও শুধু পূর্নিমা এবং অমাবস্যাতে । কিন্তু এ লোক সরাসরি তার স্বপ্নে হানা দিয়েছে, কল্পনা করা যায়? ব্যাটা সহজ চীজ না! ভাবল তরন্দীদেব।

তরন্দীদেব একজন তান্ত্রিক – জীবনমৃতের সাধনাতে লিপ্ত তান্ত্রিক! সাধনা করে নিজের জীবনের বিনিময়ে ক্ষমতা পেতে চায় – ভয়াবহ ক্ষমতা। তার উচ্চাশার শেষ নেই, বহু বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে সে এই কঠোর সাধনা।

তবে শুধু তপস্যা করেই ক্ষান্ত দেয়নি তরন্দীদেব, তার জাগতিক চাহিদাও কম নয়। জীবনমৃত হতে চাইবার মানে এই নয় যে তার ষড়রিপু বিনষ্ট হয়ে গেছে। সে অতীব শক্তিধর, অশুভ শক্তির পূজারী; আর শক্তি দিয়ে কি করবে যদি ভোগই করতে না পারে?সাধনার স্বার্থে তাকে কিছু না কিছু আচার মেনে চলতে হয়, যার অংশবিশেষই হল কবরের ভেতর বসবাস।

কিন্তু সুস্ময় ভট্টাচার্যের ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তাকে, প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই – কিন্তু তরন্দীদেব নিজের নিয়মে কাজ করে, কারো ঘুঁটি হওয়া তার একেবারেই নাপছন্দ। তবু গিয়ে দেখা যাক, সত্যিই যদি যা বলছে দিতে পারে তাহলে দশ বছর এগিয়ে যাব। ভাবল সে। কবরস্থানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিন্তু তরন্দীদেবের কাছে তা কোন বাঁধা নয় – লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল সে। প্রথম লক্ষ্য, নিজের অন্যতম ডেরা – দূর যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে।

###

"আমার নাম সাদিব, সাদিব চৌধুরী।" বিনীত গলায় বলল ছেলেটা। ওর কণ্ঠস্বর বয়সের তুলনায় একটু বেশিই ভারী, "আমি আপনাকে রিসিভ করতে এসেছি, মানে আপনিই যদি মিস অরণী হয়ে থাকেন আরকি।"

দ্বিধায় পড়ে গেলো অরণী, স্থানীয় এজেন্টের আসার কথা – তার জায়গাতে এই ছেলেটা কেনো? অবশ্য সত্যি বলতে সে আসেনি বলে খুবই খুশী হয়েছে ও; এক মূহুর্ত ইতস্তত করল, "হ্যাঁ আমিই অরণী, কিন্তু..."

"হ্যাঁ জানি, আসলে আমার বসের আসার কথা ছিল আপনাকে পিক আপ করতে কিন্তু উনি হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আটকে গেছেন।" গলা নামিয়ে যোগ করল, "চিন্তার কিছু নেই, আমিও 'সাদা হাত'-এরই একজন – শিক্ষানবীশ হিসেবে আছি আপাতত।"

নরম হল না অরণী, যে কেউ নিজেকে যা খুশি দাবী করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সবসময় তা মেনে নিলে এতদিন আর বেঁচে থাকতে হত না ওকে। হঠাৎ চোখ দিয়ে একটা ইশারা করল ও, ওই ইশারা আসলে এক ধরনের সঙ্কেত; একমাত্র সাদা হাতের লোক হলেই ধরতে পারা সম্ভব। পাল্টা ইশারা করল সাদিব এবং হেসে হাত বাড়িয়ে দিল অরণীর লাগেজ নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অরণী, সময় নষ্ট করে লাভ নেই, একটু ঝুঁকি নিতেই হবে – যেহেতু ইশারার পরীক্ষায় উৎরে গেছে ছেলেটা তাই আপাতত ওকে বিশ্বাস করবে বলে ঠিক করল।

"দরকার নেই, আমিই বেশ পারব।" বলল সে।

মাথা নাড়ল সাদিব, "উঁহু, আপনি গেস্ট মানুষ, তাছাড়া একজন লেডিকে আমি বোঝা বইতে দিতে পারি না!" একরকম জোর করেই অরণীর কাছ থেকে লাগেজটা নিয়ে নিল ও। "আসুন"। একটা নোয়া মাইক্রোবাসের সামনে গিয়ে থামল ওরা। "প্লিজ।" সসম্ভ্রমে বলল সাদিব।

ওর দিকে তাকাল অরণী, ছেলেটা বড্ড বেশি কেতাদুরস্ত আচরণ করছে, বেশি ফরমালিটি ভালো লাগে না ওর, তবে কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসল সাদিব, অরণী উঠে এলো ওর পাশের সিটে। "আমাকে আগে গ্যাজেটগুলো সংগ্রহ করতে হবে।"

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সাদিব, "অবশ্যই!"

নিরবে চলতে শুরু করল গাড়ি, এয়ারপোর্ট রোড ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে পরে আশুলিয়ার দিকে মোড় নিল।
"আপনি বললেন শিক্ষানবীশ," আলাপ জমানোর চেষ্টা করল অরণী, "কবে থেকে আছেন আমাদের সাথে?" একটু থেমে যোগ করল, "আমার কথা বুঝতে সমস্যা হলে বলবেন।"
"কি যে বলেন না ম্যাডাম! সামান্য একটু টান আছে কি নেই, ধরাই যায় না। বুঝতে মোটেও সমস্যা হচ্ছে না। আর আমি প্রায় এক বছর হলো যোগদিয়েছি। আমার বস, মানে..."
হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল অরণী, "হয়েছে, ওই লোকের নাম নিতে হবে না!" ওর কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্বেষ, "আর আমার সাথে এত ফরমাল হবার দরকার নেই, ওসব ম্যাডাম ফ্যাডাম শুনতে ভাল লাগে না, আপু বলতে পারেন বা নাম ধরে ডাকলেও সমস্যা নেই।"
ঠোঁটের কোণে হাসল সাদিব, "আপনার ব্যাপারে যা যা শুনেছি হুবহু মিলে যাচ্ছে।" বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল সে, "আচ্ছা তাহলে অরণীপু বলে ডাকব, কেমন? কিন্তু এক শর্তে, আমাকে তুমি করে বলবেন।"
"ঠিক আছে, তা কি শুনেছ আমার কথা?" কৌতূহলী ভাবটা ঢাকতে চাইলেও পুরোপুরি চাপা দিতে পারল না অরণী।
হাসল সাদিব, "তা সব বলতে গেলে একদিনে কুলোবে না, তবে খারাপ কিছু শুনিনি।"
"বটে!" কাঁধ ঝাঁকাল অরণী, "আচ্ছা তুমিও আমাকে তুমি করে বল, আপনি শুনলে নিজেকে আরও বেশি বুড়ো বলে মনে হয়!"
আসলে খুব কম সময়ের মাঝে কাউকে আপন করে নিতে পারাটা অরণীর একটা ভালো গুণ।
কিছুক্ষণ বিরতি, আবার নিরবতা ভাঙ্গল অরণী, "আর কত দূর?"
"এইতো এসে পড়েছি, সামেনের মোড়টা পেরোলেই।"
রাস্তার পাশ দিয়ে একটা মেঠো পথ চলে গেছে কিছুটা ভেতরের এক পরিত্যক্ত জমির দিকে, তার সামনে গাড়ি থামাল সাদিব। "আপনি... মানে তুমি বস আপু, আমি নিয়ে আসছি।" বলে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলো ও, হারিয়ে গেলো গাছপালার আড়ালে।
সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে এলো অরণী, যদিও ছেলেটাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই তবু সাবধান থাকা ভাল। গাড়ির পেছনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল।
একটু পরেই ফিরে এলো সাদিব। ওর হাতে একটা মাঝারি সাইজের ব্রিফকেস। আস্তে করে গাড়ির পেছেন থেকে বেরিয়ে এল অরণী।
ওকে বাইরে দেখে সাদিব অবাক হয়েছে কিনা বোঝা গেল না, "নিন... ইয়ে মানে নেও।" বলে আবার চালকের আসনে উঠে বসল সে।
ব্রিফকেসটা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করল অরণী, তারপর সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল।
"পারফেক্ট, থ্যাঙ্কস আ লট।"
"আরে এটা তো আমার কাজের মধ্যে পড়ে, ধন্যবাদ দিচ্ছেন, মানে দিচ্ছ কি জন্যে?"
"তবুও। যাই হোক, আমাকে একটু একটা হোটেলে পৌছে দিতে পারবে? খুব ক্লান্ত লাগছে। আজকের দিনটা রেস্ট নিয়ে কাল থেকে আবার কাজে নামতে হবে।"

“নিশ্চয়ই! কিন্তু হোটেল কেন? আমাদের ওখানেই তো গেস্টদের থাকার ব্যাবস্থা আছে।” বলল সাদিব।
“তা জানি, কিন্তু আমি তোমার বসের সাথে দেখা করতে চাচ্ছি না। কপালগুনে যেহেতু সামনে পড়তে হয়নি, আর যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করব।”
সাদিবের সার্বক্ষণিক হাসিটা একটু ম্লান হয়ে এলো, “তুমি মনে হয় ওনাকে খুবই ঘৃণা কর, না আপু?”
“হ্যাঁ!” অপ্রিয় কথাটা বলতে একবিন্দুও কাঁপল না অরণীর কন্ঠ। “যাই হোক, আমাকে হোটেলে উঠিয়ে দিলেই চলবে।”
উচ্চবাচ্য করল না সাদিব, মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে নিরবে গাড়ি চালানোতে মন দিল সে।

###

“সরেজমিনে না দেখে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, তবে তোমার কথা শুনে আর তোমাকে দেখে যা বুঝতে পারছি তাতে মনে হচ্ছে বেশ বাজে ধরনের একটা সমস্যাতে জড়িয়ে পড়েছ তুমি।” চোখ সরু করে কায়েসের দিকে তাকিয়ে বলল অবলাল।
“এমন কিছু বল যেটা আমি জানি না! আর তাড়াতাড়ি!” কায়েসের কন্ঠে বিরক্তি।
“ধৈর্য ধর হে বৎস, সবুরে মেওয়া ফলে।” বাঁকা হাসল অবলাল, “প্রথম যখন তুমি এই অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করলে, আমি একবার ভেবেছিলাম তোমাকে এই লাইনে কিছু ট্রেইনিং দিয়ে নেব। কিন্তু পরে চিন্তাটা নাকচ করে দেই এই ভেবে যে ব্যাপারটা বড় বেশি বিপজ্জনক এবং আমি যেহেতু তোমাকে সব সময় সঙ্গ দিতে পারব না তাই এই সব তুমি যত কম জান ততই মঙ্গল। কারণ স্বাভাবিক ভাবে শহর অঞ্চলে এগুলো তেমন ঘটে না, ভেবেছিলাম তুমি এরকম পরিস্থিতিতে আর পড়বে না।” থেমে পাইপে কষে একটা টান দিল সে, “কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওটা একটা ভুল পদক্ষেপ ছিল।”
“বুঝলাম।” কায়েস গম্ভীর।
“যাই হোক, ছোড়া তীর ফেরে না।” নাক মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল অবলাল।
“এই বিশ্রী অভ্যাসটা ছাড়তে পার না?”
উত্তর না দিয়ে আবার প্রসঙ্গে ফিরে গেল অবলাল, “আজ তোমাকে দেখেই টের পেয়েছি তুমি খুব শক্তিশালী একটা কিছু সংঘটিত হয়েছে এমন কোথাও গিয়েছিলে, আর সেখানে যাই ঘটে থাকুক তাতে কোন যক্ষ জড়িত ছিল।”
“সে তো আগেই বলেছ, তা এই যক্ষের বিষয়টা কি, পিশাচ জাতিয় জাতীয় কিছু?”
“না, তাহলে তো আর এত চিন্তা করতাম না।” অত্যন্ত ঠাণ্ডা শোনাল অবলালের গলা, “দেখ কায়েস, তুমি এখনো পর্যন্ত যা কিছুর মুখোমুখি হয়েছ, তা যদিও বা ভয়ঙ্কর কিন্তু অতিপ্রাকৃতের বিচারে নেহাতই সাধারণ সব কেস। হ্যাঁ সেবারের সেই ধাড়ি পিশাচটা বা আজকের চুড়েলটা

হয়ত বেশ শক্তিধর ছিল – কিন্তু ওগুলো অনেকটা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া পরগাছার মত। কিন্তু এখন যার কথা বলছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের ব্যাপার স্যাপার।"

"বটে!" একটু আগের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা মনে করে শিউরে উঠল কায়েস, কাঁটা দিল গায়ে, ওটা যদি হয় সাধারণ 'পরগাছা' তাহলে সত্যিকারের গাছের দেখা পাওয়ার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে আমার নেই। ভাবল সে।

"পিশাচ বল, বা স্কন্ধকাটা, বা চুড়েল – এরা এজগতেরই বাসিন্দা, মানে ওদের কিছু সুপারন্যাচারাল গুণাবলী আছে বটে কিন্তু মোদ্দা কথা ওরা আমাদের পরিচিত পৃথিবীতেই বিচরণ করে। কিন্তু যক্ষ তা নয়।" পাইপে আবার টান দিল অবলাল, "আমাদের স্পর্শযোগ্য জগতের বাইরে আরও একটা জগত আছে, নানা নামে তা পরিচিত, কেউ বলে 'স্পিরিট ওয়ার্ল্ড', কেউ বা 'মায়ালোক', আবার কেউ বা 'নেভারনেভার', তবে সর্বজন গ্রহনযোগ্য নামটা হচ্ছে 'অ্যাস্ট্রাল'। তো এই অ্যাস্ট্রালে একমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী মানা ব্যবহারকারীরাই প্রবেশ করতে পারে। কারণ নিজের দেহকে আত্মা রূপে পরিবর্তন করেই শুধু ওখানে যাওয়া যায়, আর তার জন্য প্রচুর শক্তি দরকার।"

"অন্যদিকে অ্যাস্ট্রালই হচ্ছে সকল অতিপ্রাকৃতের উৎস, মানুষের কল্পনা এবং কল্পনার অতীত অনেককিছুরই দেখা পাওয়া যায় ওখানে। আসলে অ্যাস্ট্রাল এতই ব্যাপক, অনেকের মতে ওটাকে প্রায় অসীমই বলা যায়।" পাইপটা নিভে যাওয়াতে ওটা নামিয়ে রাখল অবলাল, "যক্ষরা অ্যাস্ট্রালের বাসিন্দা, ওদের অনেক, অনেক ক্ষমতা। একেবারে নিম্ন শ্রেণীর যক্ষরাও থ্রেট লেভেল ধুসরে পড়ে।

"ধুসর!" চমকে উঠল কায়েস, "একটু আগে না বললে আমাকে যে চুড়েলটা আক্রমণ করেছিল ওটা আরও ক্ষমতা পেলে ডাকিনীতে পরিনত হত আর ডাকিনীর স্তর হচ্ছে হলুদ..."

"স্বাভাবিক ভাবে নীল, অতি প্রাচীন কিছু ডাকিনী বহু সাধ্য সাধনা করে হলুদে উঠে আসতে পারে। তাহলেই বোঝ, হলুদের পর লাল এবং তারপর ধুসর। আমাদের কপাল ভালো যে অ্যাস্ট্রাল থেকে এজগতে আসতে হলেও একইরকম ঝক্কি পোহাতে হয়।

আত্মাকে রূপ দিতে হয় দেহে – যার জন্যে অস্বাভাবিক পরিমান মানার প্রয়োজন পড়ে, সেজন্যেই বাঁচোয়া। নাহলে কত ধরণের ভয়াল দুঃস্বপ্ন যে হানা দিত, কে বলবে!"

"বুঝলাম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তো এসেছিল কিছু একটা, নাকি? লাশটাই তো তার প্রমান, কি করে এলো?"

"কেউ ডেকে এনেছে।" শীতল স্বরে বলল অবলাল।

"কিন্তু কেন? আর কে? ওই দুলু যে মূল নাটের গুরু না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত – কেউ পেছন থেকে এই খেলার কলকাঠি নাড়ছে।"

"তা তো বটেই, আর সেটাই আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। যে লোক যক্ষ ডেকে আনতে পারে সে সহজ বান্দা না, নিঃসন্দেহে কোন বড় রকমের অঘটন ঘটানোর ধান্দায় আছে সে।"

"তা এখন আমাদের কি করণীয়?" জানতে চাইল কায়েস।

“প্রথমে আমি জায়গাটা একবার সরেজমিনে দেখতে চাই আর পারলে ওই দুলুকেও, তারপর ভেবে দেখতে হবে কোন পথে আগানো যায় – এই মূহুর্তে তো হাতে কোন সুত্রই নেই আমাদের।” বলল অবলাল।

“কিন্তু প্রতিপক্ষ তো বসে নেই, তারা আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে এবং বোঝা যাচ্ছে মানুষ মারা এদের কাছে কোন বিষয়ই না! তার ওপর অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে আক্রমণ শানাচ্ছে!” কায়েসের উদ্বেগটা চাপা থাকল না।

“হ্যাঁ আমাদের খুব সাবধানে আগাতে হবে।” সায় দিল অবলাল। “যাই হোক, চল দু’তিন ঘন্টা যা পারি একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক। ভোরে প্রথম কাজ ওই বাড়িটাতে যাওয়া।” ভ্রু কুঁচকে কি যেন ভাবল সে, “কিন্তু একটা বিষয় আমি বুঝে উঠতে পারছি না।”

“মাত্র একটা!” মুখ বাঁকাল কায়েস, “তা কি সেটা?”

“তুমি বলেছ ওই ঘরে দু’জন লোক ছিল, তার মধ্যে মাত্র একজন মরেছে – অন্যজন আহত। কোন যক্ষের আক্রমণ থেকে একজন সাধারণ লোক বেঁচে গেছে এমন কথা এই প্রথম শুনলাম। খুবই অস্বাভাবিক।

চোদ্দ

ধান্মন্ডির সেই বাড়িতে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পায়চারী করছে বেটে বুড়ো। রক্তবর্ণ চোখ আরও লাল হয়ে গেছে, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে সে। মাঝে মাঝেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ঘরের অন্যান্য সদস্যদের দিকে – যার ওপরই তার চোখ পড়ছে সেই কুঁকড়ে যাচ্ছে ভয়ে। এককোণে দাঁড়িয়ে টেনে ছেড়ে দেয়া তারের মত তিরতির করে কাপছে এক নারী মূর্তি, একটা হাত কনুই এর সামান্য ওপর থেকে নেই, টপটপ করে তাজা রক্ত ঝড়ে পড়ছে বীভৎস ক্ষতটা থেকে। কিন্তু সেদিকে বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই, বুড়োর দিকেই সকল মজোযোগ কেন্দ্রিভূত হয়ে আছে তার।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে গাল বকল বুড়ো, তারপর চোখ পাকিয়ে তাকাল সোবাহানের দিকে। "দেখেছিস?" গর্জে উঠল সে, "তোর একটা ছোট্ট ভুলের কারণে এখন পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে? তোকে যে এখনো কেন বাঁচিয়ে রেখেছি তা নিজেই জানি না!" এবার কোণের নারী মূর্তিটার দিকে ঘুরল সে, "আর তুই? ওই পুলিশ ব্যাটা কি এমন জিনিস যে তোর এই দশা করে ছাড়ল? তাও যদি কাজটা শেষ করে আসতে পারতি! যত্তসব অপদার্থের দল!"
"হুজুর!" খনখনে কিন্তু বিনীত গলায় বলল চুড়েলটা, "সে একা ছিল না!"
"একা ছিল না!" বাজখাই এক চিৎকার ছাড়ল বুড়ো - কুঁকড়ে গেল চুড়েল, "তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে, শুনি? কয় ডজন লোক ছিল ওর সাথে?!"
"মাত্র একজন হুজুর, কিন্তু সাধারণ কেউ না, ওই লোকটার ভেতর কি যেন একটা আছে। আর সে কি করে যেন আমার মায়া কাটিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওদের কাছে ভারি পাল্লার অস্ত্র ছিল আর দু'জনেই সেগুলোর ব্যবহারও খুব ভালো জানে।"
চিন্তিত ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল বুড়ো, "হুহ! ব্যাপারটা কেঁচে যাচ্ছে। আর কোন ভুল করা যাবে না। কোন ভুল না!" সোফায় গিয়ে বসে পড়ল সে, "এখন আগে ওই যে ছোকরাটা কোমায় আছে, ওকে মেরে ফেলতে হবে। তাহলে হয়ত কাজটা হয়ে যেতেও পারে।"
সোবাহানকে দিকে ফিরল সে, "তবে বিকল্প ব্যবস্থাও নিয়েছি, লোক চলে আসছে, তোর মত আনাড়ি, শখের প্র্যাক্টিশনার না – কাজের লোক! বুঝেছিস?"
চুপ করে রইল সোবাহান, মুখে মুখে তর্ক করলে কি হতে পারে ভালোই বোঝা হয়ে গেছে তার।
"হুহ!" নাক কুচকালো বুড়ো, বদখৎ চেহারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তাতে, "এবার এমন একটা টিম পাঠাতে হবে যাতে করে কোনমতেই বিফল না হয়। কিন্তু সেরকম কাউকে তো দেখছি না। যতসব অকর্মন্যের দল! শেষে আমার নিজেকেই যেতে হবে কিনা কে জানে।"
"কোথায় যাওয়া হচ্ছে, সুস্ময়দা?" দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ। সবগুলো চোখ ঘুরে গেলো সেদিকে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সি একলোক।

পরনে কেতাদুরস্ত সাহেবি পোশাক, একেবারে যেন চলচিত্রের প্রথম যুগের কোন নির্বাক ছবি থেকে উঠে আশা ইংরেজ ভদ্রলোক। কালো সুট, লাল টাই, মাথায় বোলার হ্যাট, এমনকি হাতে একটা ছড়িও আছে তার।

"এই যে, বায়রান এসে গেছো!" এই প্রথমবারের মত উৎফুল্ল শোনালো বুড়োর কণ্ঠ, "এত তারাতারি যে?"

"কাজ হয়ে গেলো, এক বুড়িকে পেয়েছি - বলল বয়স ১৩০, তা যদি নাও হয় কমসেকম ১১০ তো হবেই!" বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে বুড়োর পাশে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল লোকটা। তারপর কোটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা চ্যাপ্টা রূপোর ফ্লাস্ক। বুড়োর দিকে ওটা এগিয়ে দিল সে, ঠোঁটের কোণে খেলা করছে প্রফুল্ল একটা বাঁকা হাসি।

অধির আগ্রহে হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্কটা নিল বুড়ো, এবং খুলে গলায় ঢালল ভেতরের তরল। কিন্তু পর মূহুর্তেই বিকৃত হয়ে গেলো চেহারা।

"ঘোড়ার ডিম এনেছ তুমি!" খেকিয়ে উঠল সে, "১১০ না কচু! ৯৯ থেকে একদিনও বেশি হবে না এর বয়স! এই রদ্দি মালের জন্যেই কি তোমাকে এত ঘটা করে পাঠিয়েছিলাম নাকি?"

হাসিটা মুছে গেলো বায়রানের ঠোঁট থেকে, "৯৯?" অবিশ্বাসের সাথে প্রশ্ন করল সে, "আপনি নিশ্চিত তো, সুস্ময়দা?"

চোখ পাকাল বুড়ো, "এই সুস্ময় ভট্টাচার্য্য ভুল করে না, রক্তের বেলায় তো নয়ই!" একটু থেমে যোগ করল, "যাক যা এনেছ এনেছ, কাজ চলে যাবে। এখন এসব খুঁটিনাটি নিয়ে নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে।"

"আসলে আপনার এই আজব রিকয়ারমেন্টটা আমি ঠিক বুঝি না সুস্ময়দা," বলল বায়রান, "আপনার থেকে বেশি বয়স হলেই তো কাফি, তাহলে এত খুঁতখুঁত করার কি দরকার?"

"জীবনধারণের জন্যে তো শুধু জল পান করেলেই হয়, নাকি? তাহলে লোকে মদ খায় কেনো?" দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল বুড়ো।

"তা বটে!" মাথা নাড়ল বায়রান, "যাক এবারের কাজটা হয়ে গেলে পর তো আর এই বিদঘুটে অভ্যাস থাকবে না আপনার!"

"খবরদার!" রেগে গেলো আবার বুড়ো, "কোন সাহসে আমার বংশ পরম্পরায় চলে আশা সংস্কৃতিকে বিদঘুটে বলছ?" এক মূহুর্তে থেমে নিজের টাকে হাত বুলাল সে, "জানো না, কিংবদন্তির শোণিত মন্দির থেকে এসেছে এই গোপন পন্থা?"

"হ্যাঁ, বলেছেন বৈকি," নিরাশক্ত গলায় বলল বায়রান, "কিন্তু কথা হল, এত ফ্যাঁকড়া করে যৌবন ধরে রাখাটা আমার ঠিক সয় না।"

"আর সেজন্যেই তো মাত্র বাহাত্তুর বছরে বয়সেই বুড়িয়ে গেছো তুমি! অবশ্য লাভও হত না, এই বিদ্যা এমনকি তোমাকেও শেখাব না আমি।"

বায়রানকে দেখে অবশ্য মনে হয় বয়স পঞ্চাশও ছাড়ায়নি, কিন্তু ওই প্রসঙ্গে গেলো না সে, "থাক দরকারও নেই শেখানোর, কাজটা হয়ে গেলে পর এসবের অনেক উর্ধে চলে যাব আমরা।"

"তোমার গুণধর সাগরেদ যে খেল দেখাচ্ছে তাতে কাজটা ঠিক মত করা গেলে হয়!" বিরক্ত কণ্ঠে বাঁধা দিল তাকে বুড়ো।

"কি সমস্যা?" গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল বায়রান।

"সমস্যা কি একটা দু'টা?" বুড়োর গলায় বিদ্বেষ, "প্রথম গোল পাকিয়েছে তোমার পেয়ারের এই সোবাহান মিয়া!"

কটমট করে তীব্র চোখে সোবাহানের দিকে তাকাল বায়রান, সে দৃষ্টির সামনে আরো জরসর হয়ে গেল বেচারা। "এসব কি শুনছি?"

মুখ খুলতে গেল সোবাহান কিন্তু সুস্ময় ভট্টাচার্য্য থামিয়ে দিল ওকে, মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে, "ও আর কি বলবে, বন্ধনীটা ঠিকমত তুলতে পারেনি। ঘরে বলি'র ভাই ছিল, একই রক্তধারা তাই যক্ষ আলাদা করে চিনতে পারেনি, ভুল লোককে নিয়ে গেছে। আর এ ব্যাটার মানা এতই কম যে দ্বিতীয়বার জান কবচ করা পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি যক্ষকে।"

ঝট করে বসা থেকে উঠে পড়ল বায়রান, রাগে থরথর করে কাঁপছে, সোবাহানের দিকে আগাতে যাবে, কিন্তু বাধ সাধল সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, "আরে রোসো! তোমার কি ধারণা, শাস্তি দেব ঠিক করলে এখনো জীবিত থাকত ও?" এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল বুড়ো, "ভাবছি ওকে একটা শেষ সুযোগ দেয়া যাক, এমনিতে অবশ্য আমি কাউকে একবারের বেশি চান্স দেই না; কিন্তু পরিস্থিতি এখন জটিল। তাই নিজেদের ভেতর গোলমাল না করাই ভালো। যেকনো সাহায্য, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, এখন মহা মূল্যবান।"

গজগজ করতে করতে আবার বসে পড়ল বায়রান। "তা বলি'র কি হয়েছে?" জানতে চাইল সে।

"ওরা খবর এনেছে কোমাতে আছে ছোকরা, হাসপাতালে - পুলিশ পাহারায়।"

"তাহলে ওকে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

"তা কি আমি জানি না?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল বুড়ো, "রোঘুকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এক নচ্ছাড় পুলিশ ঝামেলা বাড়াল – গুলি করে আরেকটু হলেই ওকে মেরে ফেলেছিল ব্যাটা!"

"পুলিশ?" মুখ বাঁকাল বায়রান।

"হ্যাঁ, তবে শক্ত চিজ!" সুস্ময়ের গলার তীব্র বিতৃষ্ণা।

"কি রকম?" কৌতহল দেখাল বায়রান।

"শালাকে মারতে ওকে," আঙ্গুল তুলে চুড়েলটাকে দেখাল বুড়ো, "আর দুটো স্কন্ধকাটা পাঠিয়েছিলাম, ও একা ফিরে এসেছে তাও বহাল তবিয়তে যে না তাতো দেখতেই পাচ্ছ। কাজটাও যদি শেষ করতে পারত এক কথা ছিল!"

"কী!?" চমকে গেলো বায়রান, "আপনি বলতে চাচ্ছেন সামন্য একজন পুলিশকে মারতে ওমন একটা দল বিফল হয়েছে?"

“অবশ্য সে একা ছিল না,” খেই ধরল সুস্ময়, “সাথে নাকি আরেকজন ছিল, যে কিনা আবার মায়া কাটিয়ে দিতে জানে!”

“হুঁ, পরিস্থিতি ভালোই ঘোলাটে হয়ে গেছে দেখছি, কিন্তু তাই বলে তো আর কাজটা ফেলে রাখা যায় না, এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে, গ্রহণের আর মাত্রা তিন সপ্তাহ বাকি।”

“হ্যাঁ, সময় খুবই মূল্যবান,” সায় দিল সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, “এত বড় সুযোগ আগে কখনো আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে বলে মনে হয় না। ফেইলিওর ইজ নট অ্যান অপশন! তাই এবার কোনমতেই বিফল হওয়া যাবে না। ছোঁরাটাকে মারলে যদি কাজ হয়ে যায় তো ভালো, আর নাহলে নতুন আবার নতুন একটা বলি যোগার করতে হবে। বিরাট ঝক্কি!”

“তা কাকে পাঠাবেন বলে ভাবছেন? সেই যে এক তান্ত্রিকের কথা বলেছিলেন, পৌছেছে?”

“না কালকের আগে আসবে না সে, কিন্তু ইতিমধ্যেই দেরী হয়ে গেছে, তাই ভাবছিলাম নিজেই যাব। আনাড়ি কাউকে পাঠানোর ঝুঁকি আর নিতে চাচ্ছি না।”

“তাই বলে এই মামুলী কাজে আপনি যাবেন!” প্রায় আঁতকে উঠল বায়রান, “ছি ছি সুস্ময়দা! আমি থাকতে আপনাকে কেন যেতে হবে?”

“যখন ভাবছিলাম তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না।” সুস্ময় গম্ভীর, “তাছাড়া কাজটা ছোট হলেও এখন এর গুরুত্ব অনেক।”

“সে যা হোক, আমি যখন এসে পড়েছি, এর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন, সকালে প্রথম কাজ হবে ছোকরাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া!”

“দেখ বায়রান, সাবধান – কোন ভুল করা চলবে না।” সতর্ক করল বুড়ো।

“আমার ওপর আপনার ভরসা নেই?” একটু আহত শোনাল বায়রানের কণ্ঠ।

“তা না,” বলল সুস্ময়, “কিন্তু তুমি বড্ড বেশি মারদাঙ্গা! অতিরিক্ত গোলমাল হলে কারো নজরে পড়ে যেতে পারে – আর তার মানে কি তুমি ভালোই জানো।”

“আমি কেয়ারফুল থাকব। প্রয়োজনের বেশি টু শব্দও হবে না।”

“আচ্ছা তবে ওই কথাই রইল, তুমি এদিকটা সামলাও, তান্ত্রিক ব্যাটা এলে বাকি কাজ আমি দেখছি।”

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি খেলে গেলো বায়রানের ঠোঁটে, “কোন চিন্তা করবেন না।” বলল সে।

“এই বাড়ি?” সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কায়েসের দিকে তাকালো অবলাল, ভোর সাড়ে সাতটা বাজে, ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দু’জনে। কায়েসের বাম হাত সিলিং থেকে ঝুলছে, তাই আজকে বাইক নেয়নি। প্রথমে ট্যাক্সি চেপে অবলালের কয়েকটা আস্তানার একটাতে গিয়েছে, সেখান থেকে একটা পিকাপ ভ্যান নিয়ে ফিরে এসেছে কায়েসের ফ্ল্যাটে। স্কন্ধকাটা দুটোর ব্যবস্থা করার জন্যেই এই প্রস্তুতি, তাছাড়া কিছু অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করা দরকার ছিল। পুলিশ হলেও কায়েসের নিজের কালেকশনে যা আছে তা তেমন আধুনিক নয়, অন্তত অবলাল যা ম্যানেজ করছে তার তুলনায় তো বটেই। পিকাপের পেছনের ছাউনির নিচে তেরপল দিয়ে ঢাকা আছে এখন দেহ দুটো আর একটা বড়সড় বাক্সের স্থান হয়েছে তার পাশেই। ভাগ্যিস কায়েস নিজেই পুলিশ, না হলে কেউ তল্লাসি করলে ওদের নির্ঘাত যাবজ্জীবন হয়ে যেত!
“হ্যাঁ, এটাই।” মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল কায়েস, “চল ভেতরে যাওয়া যাক।” অবলালকে আগে যেতে দিল ও। গেটের সামনে দাঁড়ানো সেন্ট্রি অবাক চোখে ওর হাতের দিকে চেয়ে আছে, তবে কিছু জিগ্যেস করল না। কায়েসকে ডিপার্টমেন্টর কেউ পারতপক্ষে ঘাঁটাতে চায় না। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা ঠেলে ঘরটায় প্রবেশ করল ওরা। আবার সেই বিশ্রী অনুভূতি! তবে তীব্রতা এখন অনেক কম। তবু গা গুলিয়ে উঠল কায়েসের, কিন্তু পাত্তা দিলো না ও, তাকাল অবলালের দিকে। ওর কি প্রতিকৃয়া হয় তা জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে কৌতুহলে ফেটে যাচ্ছে ও।
লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে তবে ঘরের আর কিছুতে হাত দেয়া হয়নি, যদিও তেমন কোন আলামত ছিলই না, মেঝেতে সামান্য রক্তের দাগ ছাড়া; তবে দৃশ্যমান সুত্রের খোঁজে তো আর আসেনি ওরা। গম্ভীর ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকালো অবলাল। তারপর ঠোঁট গোল করে মৃদু শিস্ দিয়ে উঠল।
“কি, কিছু বুঝতে পারলে?” শুধালো কায়েস।
“হ্যাঁ আবার না!”
“দয়া করে হেঁয়ালি রাখো!” বিরক্তি গোপন করার কোন চেষ্টা করল না কায়েস, “সোজা কথা বলতে কি কষ্ট হয় নাকি মানুষকে বিভ্রান্ত করে মজা নেওয়াটা তোমার অভ্যাস?”
“কোনটাই না।” অবলাল নির্বিকার, “গোটা ব্যাপারটাই তো আগাগোড়া প্যাঁচালো, সহজ করে বলব কিভাবে?”
“কি ঘটেছে তা বুঝতে পারছ? পারলে সেটাই বল না বাবা!”
“কি ঘটেছে তা হয়ত বলতে পারব, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি জরুরী হচ্ছে কেন ঘটেছে সেটা জানা, কিন্তু তার আগামাথা কিছুরই হদিশ পাচ্ছি না।” অবলালের স্বর অস্বাভাবিক তিক্ত।
“আগে কী সেটাই বল, তারপর দু’জনে মিলে ভেবে দেখি।”
“অবস্থা দেখে যা বুঝতে পারছি – একটা বেষ্টনী তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তো একটা চক আর কয়েকটা মোমবাতি দিয়ে যেকোন পাতি যাদুকরই করতে পারত। যক্ষ নামানোর দরকার পড়ল কেন?”

“আর খুনটাই বা কেন হলো? কেনই বা কোমায় গেলো অন্য ছেলেটা? তারপর আবার কেন ওকে খুনের চেষ্টা করা হলো? আমার ওপরই বা হামলা আসল কেন? শুধু কেন, কেন, আর কেন!” অধৈর্য ভঙ্গিতে মেঝেতে পা দাপাল কায়েস।

“থাম, থাম! একবারে একটা একটা করে আগাতে হবে। যা আমরা জানি তা হচ্ছে, প্রথমত – যক্ষ নামানো হয়েছিল, দ্বিতীয়ত বেষ্টনী তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। খুবই অদ্ভুত! এরকমটা ঘটার কোন নজির নেই।”

“হোয়েন ইউ এলিমিনেট দ্যা ইম্পসিবল, হোয়াটএভার রিমেইনস, নো ম্যাটার হাউ ইম্প্রোবাবেল, মাস্ট বি দ্যা ট্রুথ।” কোনান ডয়েলের বিখ্যাত উক্তিটা আওড়াল কায়েস, “সমস্যা হচ্ছে, ইম্পসিবলের সংজ্ঞা পালটে গেছে!” মুখ বাঁকাল সে।

“আচ্ছা, যে ছেলেটা কোমায় আছে তার অবস্থা কেমন?” জানতে চাইল অবলাল।

“ডাক্তাররা তো বলছে ভালোর দিকে, এখনো কেন অজ্ঞান আছে সেটাই বুঝতে পারছে না তারা।”

“আচ্ছা, তাহলে চল ওকে একবার দেখে আসি। যদি জ্ঞান ফিরে থাকে হয়ত কিছু তথ্য দিতে পারবে। আর নাহলেও হয়ত কোন সুত্র পেয়ে যেতে পারি।”

“এখানে আর কিছু দেখার নেই?”

“নাহ!” গাল চুলকাল অবলাল, পকেট হাতড়ে বের করল ওর প্রিয় পাইপটা। “ওইযে বললাম, বেষ্টনী আর যক্ষ, এর বেশি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।”

“কিন্তু যক্ষরা বেষ্টনী তৈরি করতে পারে না, এই তো?” কৌতুহল দেখাল কায়েস।

“তা পারবে না কেন?” বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল অবলাল, “অবশ্যই পারে।” পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরাল সে।

“তাহলে আর সমস্যা কোথায়? যক্ষরা বেষ্টনী বানাতে পারে, আর কেউ সেজন্যে তাদেরকে ব্যবহার করেছে। এখন সেই কেউটা কে, তাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।” ঘোষণা করল কায়েস।

বাচ্চারা আকাশ কুসুম কথা বললে বড়রা তাদের দিকে যেভাবে তাকায়, সেই দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অবলাল, “আচ্ছা তুমি ডিম চেন?” সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অপ্রসাঙ্গিক এবং অদ্ভুত প্রশ্নটা করল সে।

“কী?” থতমত খেয়ে গেলো কায়েস।

“ডিম, হাঁস-মুরগিতে পারে, ফুটে বাচ্চা বের হয়, সকালের নাশতায় পোচ করে খেতে বেশ লাগে!”

“ইয়ার্কি রাখ! ডিম না চেনার কি আছে?”

“আচ্ছা বেশ, এবার বল ডেগ চেন নাকি?”

“ডেগ? মানে বড় হাঁড়ি, বিয়ে শাদীতে রান্নার কাজে যেগুলো ব্যবহার হয় ওই জিনিস তো? নিশ্চয়ই চিনি, কিন্তু এসব উদ্ভট প্রশ্ন করার মানে কি?” রীতিমত রেগে গেলো এবার কায়েস।

“কারণ আছে,” বলল অবলাল, ধোঁয়া ছাড়ল নাক মুখ দিয়ে, “একটা মাত্র ডিম সেদ্ধ করতে যদি কেউ গোটা একটা ডেগ ব্যবহার করে তাহলে কেমন দেখাবে?”

“মানে?”

“মানে সামান্য একটা বেষ্টনীর জন্যে যক্ষ নামানোর বিষয়টা অনেকটা ওরকমই! বুঝাইতে পারলাম?”

“হয়েছে!” ঝামটে উঠল কায়েস, “আচ্ছা চল আগে দেখি ওই ছেলের কাছ থেকে কোন সুত্র বের হয় কিনা।”

“হ্যাঁ চল।” বলে দরজা ঠেলে বেড়িয়ে গেলো অবলাল, পিছু নিল কায়েস।

পনের

চারদিকে গাড় অন্ধকার, হীমশীতল একটা ভাব, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে – যেন গভীর জ্বলে ডুবে যাচ্ছে সে। সারা গায়ে কেমন একটা ভোতা অবশ অনুভূতি, কিন্তু তার ভেতর থেকেও মাথাচাড়া দিচ্ছে তীব্র একটা ব্যাথা বোধ। কষ্ট! বড় কষ্ট! অনন্তকাল ধরে যেন ডুবেই চলেছে, এর শেষ কোথায়? পরিস্কার করে কিছু ভাবতেও পারছে না। যা হয় হোক, কিন্তু তবু শেষ হোক এর! কায়েমনবাক্যে এই প্রার্থনাই করে চলেছে সে, কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসই হয়ত বা, অবস্থা পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখছে না।

সকালের মিঠে কড়া রোদ এসে পড়ছে জানালার পর্দা গলে। সুন্দর, উষ্ণ আবহাওয়া। চোখের পাতা কেঁপে উঠল তার। আস্তে আস্তে খুলে গেলো চোখ দুটো – অস্বচ্ছ, ঘোলাটে দৃষ্টি সেখানে। মাথা নাড়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কয়েক ইঞ্চির বেশি পারল না কোনদিকেই। না কিছু আটকে রাখেনি তাকে – কিন্তু শক্তি পাচ্ছে না। আমি কোথায়? ভাবল সে।

কি ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করল, শিউড়ে উঠল সর্বাঙ্গ। রিয়ার ভিউ মিররে দেখা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু এখন সে কোথায় তা বুঝতে পারল না কিছুতেই। শুধুমাত্র ওপরে দেখতে পাচ্ছে, উঁচু ছাদের একটা ঘরে রয়েছে সে – সিলিং ফ্যান চোখে পড়ছে, তবে ঘুরছে না ওটা।

আরেকবার চেষ্টা করল সে মাথা ঘোরানোর, আংশিক সফল হলো এবার। দেখতে পেলো ঘরের একপাশ, মাঝারি আকৃতির একটা কামরা, একটা টেবিল রয়েছে আর একধারে একটা আলমিরা, কোণে বেশ উঁচুতে একটা টেলিভিশন – বন্ধ। যে খাটে সে শুয়ে আছে তার পাশে একটা স্যালাইনের স্ট্যান্ড দেখে আন্দাজ করল হাসপাতালে রয়েছে সে। বন্ধ দরজাটাও চোখে পড়ল, দশ বারো ফুট দূরে, কিন্তু এখন ওই দুরুত্বটাকেই যোজন সমান মনে হলো তার কাছে। কাউকে ডাকবে কিনা ভাবল সে, কিন্তু কথা বলার শক্তিও যেন নেই শরীরে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, হাসপাতাল হলে নিশ্চয়ই ডাক্তার বা নার্স রয়েছে, আগে হোক পড়ে হোক তারা কেউ আসবেই। খুব ক্লান্ত লাগছে, ঘুম পাচ্ছে, আবার চোখে বুজে ফেলল সে। কতক্ষণ পেরিয়েছে জানে না, খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছিল – হঠাৎ উত্তেজিত কন্ঠের চিৎকার শুনে জেগে গেলো। দরজার ঠিক বাইরেই চেঁচাচ্ছে কে যেন, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ঠিক বুঝতে পারল না কি বলছে লোকটা। কান পাতার চেষ্টা করল, আরেকবার অমানুষিক পরিশ্রম করে তাকালো দরজার দিকে। পর মূহুর্তেই এমন চমকে গেলো, শরীরে বল থাকলে নির্ঘাত লাফিয়ে উঠত।

দরজাটা হা করে খুলে গেছে, সেখান দিয়ে উড়ে এলো লাল-বাদামী রঙের কিছু একটা - ধুপ করে আছড়ে পড়ল তার খাটের পায়ার কাছে। বিস্ময় মেশানো ভয়ের সাথে সে উপলব্ধি করল যে ওটা আসলে একটা মানুষ – মানে কিছুক্ষণ আগেই ছিল আর কি!

প্রচন্ড গতিতে চলা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেলে যেমন হয় সে অবস্থা হয়েছে লোকটার, একেবারে থেঁতলে গেছে। নিজের অজান্তেই তার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো ভয়ার্ত চিৎকার। বিস্ফোরিত চোখে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা কাজ করছে না।

ধীরেসুস্থে চৌকাঠ পেড়িয়ে প্রবেশ করল লোকটা, মাঝারি উচ্চতা, লম্বা চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে। পরনে ফিটফাট সাহেবী পোশাক – সুট, টাই, মাথায় হ্যাট, এমনকি হাতে একটা ছড়িও আছে।

ঘরে ঢুকেই ভ্রু কুঁচকে ফেলল লোকটা, মাথা নাড়ল বিরক্ত ভঙ্গিতে। রাগী চোখে তাকালো তার দিকে, সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল – আত্মা শুকিয়ে গেলো রাশেদুনের।

"জেগে গেছে দেখা যায়! ঝামেলা বারল!" বিরবির করে বলল লোকটা। "এখন আর কাজটা হবে না, নতুন বলি খুঁজতে হবে!"

কথা গুলোর অর্থ বুঝল না রাশেদুন, এই লোককে আগে কখনো দেখেনি সে। আর দরজাটা ওভাবে ঝটকা দিয়ে খুলল কি করে? লাশটাই বা কোথেকে এল? মাথামুন্ড কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে এতটুকু ঠিকই আন্দাজ করতে পারল যে আগন্তুকের উদ্দেশ্য ভালো নয়।

কিন্তু কিছুই করার নেই তার, হাত পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না। অবশ্য যদি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা এই লোকের কীর্তি হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও কোন লাভ হত বলে মনে হয় না। যুগপৎ বভীষিকা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রাশেদুন, জীবনের শেষক্ষণ বোধহয় উপস্থিত!

হাতের ছড়িটা নাচাল আগন্তুক, "তোকে মেরে ফেলতে হবেরে ছোকরা!" যেন খোশগল্প করছে এমন ভঙ্গিতে বলল সে। অত্যান্ত মোলায়েম, কিন্তু কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে শুনলে।

আরেকবার শিউরে উঠল রাশেদুন, লোকটার কন্ঠস্বর অত্যান্ত মোলায়েম, কিন্তু কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে শুনলে। উষ্ণ খোলসের আড়ালে দুনিয়ার তাবৎ নিষ্ঠুরতা যেন তাতে অন্তর্নিহিত।

ছড়ি হাতে, দৃঢ় পায়ে খাটের দিকে এগিয়ে এলো লোকটা। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে রাশেদুনকে, "ভালো অ্যাফিনিটি ছিল! এরকম আরেকটাকে পেতে ঝামেলা আছে!" এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বিরবির করল সে, "কিন্তু কি আর করা!" ছড়িটা ওপরে তুলল সে, কিছু একটা যে করতে যাচ্ছে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে রাশেদুন – কিন্তু সেটা ঠিক কি, তা আন্দাজ করতে পারল না। অবশ্য ভয়ের কারণে সুস্থ ভাবে চিন্তাও করতে পারছে না।

হঠাতই দরজার কাছ থেকে পিস্তলের সেফটি অফ করার 'ক্লিক' জাতিয় একটা শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণেই কথা বলে উঠল একটা নারী কন্ঠ, "ডমিনিক বায়রান! সন্দেহজনক গতিবিধি, অতিপ্রাকৃত জগতে অশান্তি সৃষ্টি, নরহত্যা এবং মানা ব্যবহার করে জনজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলার অপরাধে সাদা হাতের নামে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!

নিরপেক্ষ বিচারের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, শান্তিপূর্ণ ভাবে আত্মসমার্পণ কর!" পরিস্কার, স্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হলো কথাগুলো – যেন অনেকবার অনুশীলন করা হয়েছে।

পাই করে ঘুরল বায়রান, "কে তুমি?"

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শনা এক তরুণী, পরনে কালো লেদারের ট্রাউজার্স, কালো ভেস্ট এবং চোখে কালো সানগ্লাস। এমনকি পায়ের বুটজুতো জোড়াও কালো। নিষ্কম্প ডান হাতে ধরে আছে একটা মাঝারি আকৃতির অটোমেটিক পিস্তল, লক্ষ্য বায়রানের বুকে স্থির। "আমার নাম অরণী মোরেস," বলল সে, "আমি সাদা হাতের একজন ফিল্ড এজেন্ট। বেশ কিছুদিন ধরেই

তোমার নানা কুকীর্তির কথা আমাদের গোচরে এসেছে। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে বন্দি করে স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে সোপার্দ করার জন্যে।"

"আচ্ছা!" একটা ভুরু উঁচু করল বায়রান, ঠোঁটের কোণে খেলে গেলো বিদ্রুপাত্মক এক চিলতে বাঁকা হাসি, "তা খুকি," কৌতুক মেশানো স্বরে বলল সে, "কি করে তোমার ধারনা হলো যে আমাকে বন্দি করার সামর্থ্য তোমার আছে?"

অরণীর ফর্সা মুখটা নিমিষে লাল হয়ে গেলো, কেউ তাকে খুকি বা ওই জাতিয় কিছু বললে মোটেও সইতে পারে না সে। "খবরদার আমাকে খুকি বলবে না!" পিস্তলটা নাচাল সে, "আর এই হচ্ছে আমার সামর্থ্য! চলবে?"

হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বায়রান, "মেয়ে বলে কি? তুমি তো আমার নাতনীর বয়সি হে – মানে যদি আমার নাতনী থাকত আর কি! খুকি ছাড়া আর কি বলব? আর ওই খেলনা দিয়ে বায়রানকে ভয় দেখাতে চাচ্ছ?! নাহে, তুমি ঠিকমত হোমওয়ার্ক করনি, খুকি!" ইচ্ছা করেই খোঁচা মেরে আবার ওকে খুকি সম্বোধন করল সে।

জবাবে বাম হাত দিয়ে নিজের বেল্ট থেকে অদ্ভুত দর্শন একটা সরু হ্যান্ডকাফ খুলে নিলো অরণী। "বকবক বন্ধ করে এটা পরে নেও, নাহলে গুলি করতে বাধ্য হব। আমি জানি তোমার থ্রেট লেভেল সবুজ, কিন্তু এটাও সত্যি যে তুমি মানুষ। তাই বুঝতেই পারছ, বন্দুকের সামনে তোমার জারিজুরি খাটবে না।"

"তাই মনে হয় তোমার?" বায়রানের গলাটা বদলে গিয়ে ঠাণ্ডা শোনাল।

জবাবে পিস্তলটা সামান্য একটু সরিয়ে ওর ঠিক হৃপিণ্ডের দিকে তাক করল অরণী। ওর পাতলা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে সেটে আছে পরস্পরের ওপর, ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেছে রাগে, নাকের নিচে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মারদাঙ্গা পোশাকআশাক আর হাতে অস্ত্র না থাকলে মনে হতে পারত যে প্রেমিকের ওপর রেগে গেছে সে কোন তির্যক খুনসুটির কারণে।

ব্যাঙ্গাত্মক একটা হাসি খেলে গেলো বায়রানের ঠোঁটে, "তোমাদের সমস্যাটা কি জান?" নিরুত্তাপ কণ্ঠে সুধালো সে, তারপর জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই উত্তর দিলো, "হাতে কলমে না দেখালে কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না তোমরা!" হাতে ধরা ছড়িটা নাড়াল সে, একই সাথে উচ্চারণ করল দুর্বোধ্য একটা শব্দ, ভোজবাজির মত বদলে গেলো ছড়িটা।

নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করত না রাশেদুন যে এরকম কিছু সম্ভব, এমন কি দেখেও ব্যাপারটার সত্যতা নিয়ে সন্দিহান বোধ করল সে। যে জিনিসটা ফুট তিনেক লম্বা একটা দন্ড ছিল মূহুর্ত খানেক আগে, হঠাতই সেটা পরিণত হয়েছে একটা ত্রিশূলে!

"খবরদার!" চেঁচিয়ে উঠল অরণী, একই সাথে টিপে দিলো পিস্তলের ট্রিগার। সময় যেন ধীর হয়ে গেছে, বুলেটাকে স্পস্ট দেখতে পেলো রাশেদুন, কি করে কে জানে! তীব্র গতিতে ওটা ধেয়ে গেলো বায়রান নামের লোকটার দিকে এবং তার শরীর থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে এসে যেন ব্রেক কশে থেমে গেলো, টুপ করে মেঝেতে খসে পড়ল ওটা।

"কি? সখ মিটেছে?" বায়রানের কণ্ঠে বিদ্রুপ, "নাকি আবার চেষ্টা করতে চাও, খুকি?"

ততক্ষণে আরও বেশ কয়েকবার ট্রিগার টেনেছে অরণী নামের মেয়েটা, কিন্তু প্রত্যেকটা গুলিরই একই দশা হলো। অসহায় ভঙ্গিতে নিজের হাতের অস্ত্রটার দিকে তাকালো সে, তারপর বায়রানের দিকে।

ওদিকে নিজের জায়গা থেকে এক চুলও নড়েনি বায়রান। "এবার তাহলে আমার পালা," অরণী গুলি করা থামাতে বলল সে।

কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেলো কিছুই বুঝতে পারল না রাশেদুন, শুধু দেখল শুন্যে প্রায় তিন ফুট উঠে গেছে অরণীর দেহ, এবং ওর গলার কাছে ভাসছে ত্রিশূলটা। বায়রান তখনও নড়েনি। "তোমার মত সুন্দরি একটা মেয়েকে সময় নিয়ে মারতে পারলে খুশি হতাম," কুৎসিত, ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে বলল বায়রান, "কিন্তু হাতে অনেক কাজ! তাই ফরমালিটি করতে পারছি না!" একটা আঙ্গুল সামান্য নাড়ল সে, কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে স্থির হলো ত্রিশূলটা। "তাহলে বিদায়, খুকি? শেষ ইচ্ছা কি তা আর জিজ্ঞেস করলাম না!" তুড়ি বাজানোর ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেলো অরণীর শরীরে, তখনো পর্যন্ত হাতে ধরে থাকা পিস্তলটা ছেড়ে দিলো সে, ওটা মেঝে স্পর্শ করার আগেই দুই হাত আড়াআড়ি ভাবে নিজের সামনে নিয়ে এলো, স্পস্ট গলায় উচ্চারণ করল একটা শব্দ, "শ্যা-রণ!" পরক্ষণে ঝুপ করে মেঝেতে নেমে এলো সে, কিছুটা অবিন্যস্ত অবস্থায় – তবে নিজের পায়ে খাড়া থাকতে পারল। পড়তে পড়তেই ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে দুটো চকচকে ছুরি সাদৃশ্য অস্ত্র!

তুড়ি বাজাল বায়রান, তীব্র বেগে ত্রিশূলটা ধেয়ে এলো অরণীকে লক্ষ্য করে, কিন্তু শেষ মূহুর্তে হাতের ইস্পাত দুটো দিয়ে ওটাকে প্রতিহত করতে পারল মেয়েটা। তাজ্জব হবার শেষ সীমায় পৌছে গেছে রাশেদুন, মনে হচ্ছে হলিউডের কোন সিনামার শুটিং দেখছে সে – পার্থক্য হচ্ছে, এই শুটিংয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বেমালুম ভুলে গেছে কতৃপক্ষ।

ঝটকা মেরে সামনে এগলো অরণী, ওর ডান হাতের ইস্পাতটা হঠাতই লাল হয়ে উঠল, যেন এইমাত্র তুলে আনা হয়েছে আগুনের মালসা থেকে। নিপুণ হাতে ওটা ছুঁড়ে দিলো সে, লক্ষ্য বায়রানের গলা।

এবার আর আগের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল না বায়রান, বরং দুই হাতজোড় করে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি নিলো এবং নিচু স্বরে একটা শ্লোক জাতিয় কিছু আওড়াতে শুরু করল। ওর চারপাশের বাতাসে কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো – সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না রাশেদুন। যেন হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে উঠেছে ঘরের বাতাস! ছুরির মত জিনিসটা ছুটে এসে বায়রানের গায়ে বেঁধার ঠিক আগে গতি হারাল, তবে গুলিগুলোর মত অত সহজে ঘটল না ব্যাপারটা। ওটার চারপাশে কয়েকবার স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠল। ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল কেমন একটা গন্ধ। পুরানো ফটোকপির মেশিনে অনেকটা ওরকম গন্ধ পাওয়া যায়। রাশেদুন শুনেছে, "ওজন" নামের কি একটা গ্যাস এর কারণ।

"তুমি দেখছি মানার ব্যবহার ভালোই জানো!" বায়রানে কন্ঠে প্রশংসা, "আফসোস, সাধারণ চোর বাটপাড়ের পিছে লেগে থাকলে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল। আমার কাছে কেন এলে

মরতে?” দুর্বোধ্য আরেকটা শব্দ উচ্চারণ করে ঝটকা দিয়ে ডান হাতটা সামনে বাড়াল সে। রাশেদুনের মনে হলো ঘরের ভেতরে একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে। তীব্র একটা দমকা বাতাস, কিন্তু আদপে বাতাস নয়! বরং একটা অদৃশ্য শক্তি অরণীকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে ফেললো একপাশের দেয়ালের ওপর। আবার হাত তুলল বায়রান, এবার আর হেলাফেলা করছে না, ছোবল দিতে উদ্যত সাপের মত হিশ্ জাতিয় একটা আওয়াজ বের হলো তার গলা থেকে, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে সে হাতটা, আঙ্গুলগুলো ছড়ানো। স্পস্ট দেখতে পাচ্ছে রাশেদুন, অরণীর শরীরের ওপর প্রচন্ড চাপ ফেলছে অদৃশ্য কোন শক্তি। দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে যেন মেয়েটা, লাল হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ! তবে সাধারণ লাল নয়, বরং খুব জোরে চেপে ধরার পর হঠাৎ ছেড়ে দিলে হাত যে রকম লাল হয়ে যায় অনেকটা সেরকম – কিন্তু অনেক বেশি গাড়!
তারপর ওর কষ গড়িয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখল রাশেদুন – তাজা, টকটকে লাল! ছটফট করছে মেয়েটা, শরীর মুচড়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে – কিন্তু বৃথা! ছটফট করছে রাশেদুনও কিন্তু সে কেবল ভেতরে ভেতরেই, এমনিতে নড়ার ক্ষমতাও নেই ওর।
চাপা গোঙানি থেকে শুরু করে ক্রমে আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে শুরু করল অরণীর গলা চিড়ে, এখন নাক দিয়েও গড়াচ্ছে রক্ত। ওদিকে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে একই ভাঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বায়রান, একাগ্রতায় কুঁচকে গেছে তার ভুরু। ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে দাঁত। বোঝা যাচ্ছে যে এই অদ্ভুত চাপ প্রয়োগ করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। কখন যেন তার বাহাতে ফিরে গেছে ত্রিশূলটা, ওটার ওপর শক্ত হয়ে তার চেপে বসেছে আঙ্গুল, রক্ত সরে গিয়ে সাদা দেখাচ্ছে গাটগুলো।
বেশ বুঝতে পারল রাশেদুন, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মারা যাবে মেয়েটা – এরকম সর্বগ্রাসি চাপ সহ্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর তারপরই ওর পালা!

যেন বাজ পড়ল! কানে তালা লেগে যাবার মত শব্দ, মিনিট খানেকও হয়নি বেশ কয়েকটা গুলি ছুঁড়েছে অরণী নামের মেয়েটা, কিন্তু সেগুলোর তুলনায় এটার আওয়াজ বহুগুন বেশি জোড়ালো। বায়রানের বুকের ডানপাশে যেন কেউ একটা তারাবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে – স্ফুলিঙ্গের নাচন শুরু হয়ে গেছে ওখানে। আবার শোনা গেলো কানে তালা লাগানো শব্দ, এবার স্ফুলিঙ্গ ছুটল বায়রানের মাথার কাছে। মুখ খিস্তি করে দরজার দিকে ঘুরল বায়রান, ধপ করে দেয়াল থেকে মেঝেতে পড়ল অরণী, সরে গেছে চাপটা।

দোরগোরায় দাঁড়িয়ে আছে একলোক, পরনে ঢোলা জিন্স আর বুক খোলা শার্ট, নিচে অবশ্য একটা টিশার্ট রয়েছে। পেশিবহুল অ্যাথলেটদের মত সুগঠিত শরীর আগন্তুকের, মুখে চাপ দাঁড়ি, সব মিলে বেশ আকর্ষণীয় চেহারা। তবে কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুরতা রয়েছে, যে কারণে কেমন এক অজানা ভয় জাগে তাকে দেখলে, বায়রানকে দেখেও অনেকটা এমনই বোধ করেছিল রাশেদুন, কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। বায়রানের ক্ষেত্রে অনুভূতিটা ছিল ভয় আর ঘৃণার

মিশ্রণ; কিন্তু এর বেলায় ভয়ের সাথে কেমন একটা শ্রদ্ধা বোধ হচ্ছে, কেন কে জানে? হয়ত বা পরিস্থির কারণেই।

লোকটা সশস্ত্র, ডান হাতে ধরে রেখেছে বিরাট একটা পিস্তল, ওটার গুলির আওয়াজই শুনেছে রাশেদুন। বায়রান ঘুরতেই আবার গুলি করল লোকটা। আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল, তবে এবার এক পা পিছিয়ে গেলো বায়রান।
তার কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বোঝা যাচ্ছে ভারী পাল্লার ওই মিনি কামানকে প্রতিহত করতে বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।
ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা, এতক্ষণে খেয়াল করল রাশেদুন, তার অন্য হাতে একটা ছাতা রয়েছে। কিন্তু একি, চমকের পর চমক! ঝটকা মেরে ছাতার ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর চেহারার একটা মাঝারি আকারের তলোয়ার বের করে আনল লোকটা। সাই করে মারাত্মক অস্ত্রটা চালাল বায়রানের গলা লক্ষ্য করে।

নিজের ত্রিশূল দিয়ে আঘাতটা প্রতিহত করল বায়রান। এবং একই সাথে হাত একটা তুলে ইশারা করল, একটু আগে যা ঘটেছিল অনেকটা সেরকমই এবারের আক্রমণটাও – তবে অতটা ছাড়ানো নয়। একই পরিমাণ শক্তি অনেক কম জায়গাতে একত্রিত করেছে এবার বায়রান, যার ফলে আঘাতের তীব্রতা বেড়ে গেছে বহুগুন। স্বোঝা যাচ্ছে এখন আর শিকার নিয়ে খেলছে না সে। অদৃশ্য হলেও আঘাতটা কোথায় লাগবে কি করে যেন তা বুঝে ফেলল আগন্তুক। লাফিয়ে সরে গেলো সে। প্রচন্ড শক্তি গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালের ওপর। ছিটকে উঠল চুন সুরকি!
রাশেদুন ধারনা করল প্রথম যে লাশটা ঘরে এসে পড়েছে, এই কায়দাতেই সেটার ওই দশা করেছে বায়রান নামের ওই মানুষরূপি দানবটা।
আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে – পরিস্থিতির তুলনায় অস্বাভাবিক ভালো কাজ করছে রাশেদুনের মস্তিষ্ক। যদিও কি ঘটছে তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছে না, বরং মনে হচ্ছে এসবই একটা অতি জটিল আর দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন; কিন্তু প্রত্যেকটা ঘটনাকে আলাদা ভাবে উপলব্ধি করতে পারছে সে। হয়ত শারীরিক স্থবিরতাই ওর মানসিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
ঘরের মাঝে জমে উঠেছে লড়াই, ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ঠোকাঠুকি, তার সাথে যোগ হয়েছে বায়রানের তরফ থেকে একের পর এক প্রাণঘাতি শক্তিশেল। হ্যাঁ, ওই জিনিসের জন্যে এটাই উপযুক্ত নাম, ভাবল রাশেদুন।

হঠাৎ বাউলি কেটে সামনে এগিয়ে একেবারে কাছে থেকে বায়রানের কপাল লক্ষ করে গুলি করল আগন্তুক। এবার এত বেশি স্ফুলিঙ্গ ছিটল যে মূহুর্তের জন্যে ঢাকা পড়ে গেলো বায়ারানের মাথা। টলে উঠে পিছিয়ে গেলো সে, এবং একই সাথে এগিয়ে এলো আগন্তুক। তলোয়ার চালাল বায়রানের পেট লক্ষ্য করে। এই প্রথমবারের মত কোন অদৃশ্য প্রতিরোধ দেখা দিলো না।

একেবারে শেষক্ষণে বাউলি কেটে সরে যেতে পারল বটে বায়রান, কিন্তু তলোয়ারের সুতীক্ষ্ণ ফলা তার পাঁজরে লম্বা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করল।

আগন্তুক এর আগমনের পর এই প্রথম মুখ খুলল বায়রান, "তোমার মরণ ঘনিয়েছে!" ভয়ঙ্কর খসখসে শোনাল কণ্ঠটা, একটু আগের মেকী ভদ্রতার লেশ মাত্র অবশিষ্ট নেই।
"নিজেরটা চিন্তা কর!" আগন্তুকের গলাটা বরফের মত শীতল। ব্যস ওইটুকুই বিরতি। আবার গুলি করার জন্যে পিস্তল তুলল সে, কিন্তু ততক্ষণে একটা শক্তিশেল ছুঁড়ে দিয়েছে বায়রান। অল্পের জন্যে ওটা তার গায়ে না লেগে দফারফা করল পেছনের টেবিলটার। কিন্তু এই সুযোগে এগিয়ে এসে ত্রিশূল দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করল যাদুকর। হ্যাঁ, এছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে ওই রকম একটা চরিত্রকে? ভাবল রাশেদুন।
কোনমতে ত্রিশূলের আঘাতটা এড়াতে পারল বটে আগন্তুক, কিন্তু বাড়ি লেগে পিস্তলটা পড়ে গেলো তার হাত থেকে। ওদিকে থেমে নেই বায়রান, শক্তিশেল ছোড়ার লক্ষ্যে হাত তুলেছে। দ্রুত সামান্য পিছিয়ে গেলো আগন্তুক, সে নিজেও তুলে ধরেছে তার মুক্ত হাতটা। তাহলে এও কি যাদুকর নাকি? নিজেকেই প্রশ্ন করল রাশেদুন।

"হুবড়িজাহ নোজাহ!" চাপা গলায় গর্জে উঠল লোকটা। ওর বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা নিলচে আলোর গোলক। প্রায় একই সময় শক্তিশেল ছুঁড়েছে বায়রান এবং এবারেরটা আগেরগুলোর থেকে অনেক বেশি জোড়াল। কিন্তু আগন্তুকের আক্রমণের সামনে ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত উড়ে গেলো বায়রানের শক্তিশেল। খুব সম্ভব চতুর যাদুকর বুঝতে পেরেছিল যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে যাচ্ছে তার প্রতিপক্ষ। তাই শক্তিশেল ছুঁড়েই হাতজোড় করে সেই প্রতিরক্ষামূলক ভঙ্গিটা নিয়েছে।
কিন্তু কাজ হলো না তাতেও। আলোর গোলকটা ওজনের গন্ধ ছড়িয়ে, স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দুর্বার গতিতে আঘাত করল তাকে। শেষ মূহুর্তে ত্রিশূলটা দিয়ে ফেরানোর চেষ্টা নিলো সে ওটাকে। এবং সেকারণেই বোধহয় প্রাণে বেঁচে গেলো।

ধাক্কার চোটে উড়ে গিয়ে অন্যপাশের দেয়ালে বাড়ি খেলো বায়রান। এতই জোরে যে প্লাস্টার খসে পড়ল দেয়াল থেকে। হাতের ত্রিশূলটার অর্ধেক গলে গেছে। ঝলসে গেছে দুই হাত। যেভাবে বাড়ি খেয়েছে, নিদেনপক্ষে কয়েকটা হাড় যে ভেঙ্গেছে তা নিশ্চিত। এবার খোলা তলোয়ার হাতে তার দিকে এগিয়ে গেলো আগন্তুক।

এমন সময় হুরমুর করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল আরেক লোক, বেশ লম্বা সে, তবে দেহের গড়ন চিকন। এক হাতে শোভা পাচ্ছে একটা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র - ওটাকে ঠিক কি বলে জানে না রাশেদুন তবে ইংরেজি ছবিতে ওগুলো হরহামেশা দেখা যায়। অন্য হাতটা তার সিলিংয়ে ঝোলানো। "অবলাল! কি হচ্ছে এখানে?" কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

“মেয়েটার দিকে দেখো!” বলে মাথা নেড়ে মেঝেতে বেকায়দায় পড়ে থাকা অরণীর দিকে ইঙ্গিত করল অবলাল নামের লোকটা। মূহুর্তের ভগ্নাংশের জন্যে মনোযোগ সরিয়েছিল সে, কিন্তু তার মাঝেই স্যাৎ করে কোথেকে আবির্ভাব ঘটল একটা ছায়ার। একটা কালো ঘূর্ণির মত কি যেন দেখতে পেলো রাশেদুন। ক্ষণিকের জন্যে সেটা ঘিরে ধরল বায়রানের দেহটাকে। পরক্ষণে বেমালুম গায়েব! ঝট করে ওটার দিকে এগোতে গিয়েছিল অবলাল, কিন্তু কাছে পৌছানোর আগেই নেই হয়ে গেছে ওটা। নিস্ফল আক্রোশে পা দাপাল একবার সে। তারপর ঘুরে তাকলো অন্য লোকটার দিকে।

“কেমন বুঝছ, কায়েস?” বলতে বলতে কায়েস নামের লোকটা যেখানে ভূপতিত অরণীর ওপর ঝুঁকে নাড়ি দেখার চেষ্টা করছে সেদিকে এগিয়ে গেলো সে।

“দেখি সর, আমি দেখছি!” বলে একরকম ঠেলেই কায়েসকে সরিয়ে দিলো অবলাল। ভালো করে তাকালো পড়ে থাকা দেহটার দিকে। পরক্ষণেই আঁতকে উঠল। “রক্তের রঙ!” প্রায় কাতর শোনাল ওর কন্ঠটা, “অরণী?!”

ষোল

কায়েস আর অবলাল রওনা দিয়েছিল হাসপাতালের দিকে, উদ্দেশ্য রাশেদুনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। গতরাতের গন্ডগোলের পর একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে রাশেদুনকে। ওর কেবিনের দরজায় সার্বক্ষনিক পাহারার ব্যাবস্থাও করা হয়েছে। সকালে ফোনে এসব তথ্য জানতে পেরেছে রবিউল আলমের কাছ থেকে, কিন্তু মোটেও নিশ্চিত বোধ করছে না কায়েস। কারণ শত্রুদের যে ধরন ইতিমধ্যে দেখেছে – তাতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে দু'চারজন গার্ড রেখে ওদের ঠেকানো সম্ভব না। এক অবলাল না থাকলে ও নিজেই এতক্ষণে ইতিহাস হয়ে যেত!

বেশ চিন্তিত মনে গাড়ি চালাচ্ছিল অবলাল, আলাপ জমানো চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো কায়েস। কিছুটা বাধ্য হয়েই শেষে নিজের দিকে মনোযোগ দিলো সে, অকেজো ডান হাতটা সকালে একটা সিলিংয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে অবলাল। এমতাবস্থায় তেমন কিছু করার সাধ্য নেই ওর, চিন্তা ছাড়া – কিন্তু ভেবে ভেবেই সারা হচ্ছে সে, কোন কুল কিনারা দেখছে না। সমস্যা ক্রমশ ডালপালা মেলে চলেছে কিন্তু জট খোলার মত কোন সুত্রই নেই হাতে। দু'দুটো আক্রমণ এসেছে এবং পরেরটার লক্ষ্য ছিল ও নিজে! কিন্তু কেন ঘটছে এসব সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারনা এখনো পায়নি। অবলালও তেমন কোন তথ্য বের করতে পারেনি – একটা বন্ধনী দিতে চেষ্টা করা হয়েছে! বলেছে সে, আল্লাহ্ জানেন এর মানে কি! আর ওই যক্ষের ব্যাপারটা?! বেশ বুঝতে পারছে কায়েস যে অতিসয় ভয়ঙ্কর কিছু হবে এই যক্ষ, কিন্তু তা ঠিক কি ধরনের সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলছে না অবলাল। মেজাজটাই খিঁচরে গেছে কায়েসের, গত রাতে ব্যাটা বলেছিল যে সব খুলে বলবে, কিন্তু কিসের কি?! যেই লাউ সেই কদু! আসলে স্বভাব মরলেও যায় না! তিক্ত মনে ভাবল সে।

ক্লিনিকটা একটা গলির ভেতরে, একটু নিরিবিলি জায়গায়। গেটের সামনে এসে ব্রেক কশে গাড়ি দাঁড় করাল অবলাল, এবং প্রায় একই সময় শোনা গেলো গুলির শব্দ, ক্লিনিকের ভেতর থেকে আসছে। বিদ্যুৎ খেলে গেলো অবলালের শরীরে। পাশে রাখা ছাতা রূপী তলোয়ারটা তুলে নিয়ে এক ঝটকায় বেরিয়ে গেলো সে গাড়ির দরজা খুলে। পিছু নিতে গেলো কায়েসও, কিন্তু সহসাই ওর মনে হলো যদি কোন অতিপ্রাকৃত শত্রুর সামনে পড়ে যায় তাহলে বর্তমান অবস্থায় কিছুই করতে পারবে না ও, একহাতে এমনকি পিস্তল রিলোড করাও অসম্ভব। তাই কিছুটা প্রস্তুতি দরকার। গাড়ির পেছনে এসে বনেট খুলে একটা উজি সাবমেশিনগান বের করে নিলো সে, তারপর ছুটলো অবলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তবে একহাতে এসব করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলো তার এবং সে কারণেই সীনে পৌছে দেখল সব শেষ।

ঘরটার মধ্যে দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছেঃ দরজার একটা কব্জা ভাঙ্গা, হুরকো ছুটে কোথায় গেছে কে জানে! দেয়ালের বেশ কয়েক জায়গাতে প্লাস্টার খসে গিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে ইট। একটা টেবলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে, কাঠগুলো অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঘরময়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হচ্ছে একটা থেঁতলানো মানব দেহ - যা কিনা বলতে গেলে রক্ত মাংসের পিন্ডে পরিণত হয়েছে – পড়ে আছে বেঢপ ভঙ্গিতে, খাটের পায়ার কাছে। জীবিতদের অবস্থাও সুবিধার নয়, খাটে শোয়া রাশেদুনের চেহারা ফ্যাকাশে। চোখ পিট পিট করছে সে ভীত ভঙ্গিতে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এত কিছু ঘটে যাওয়া সত্তেও ওর স্যালাইন স্ট্যান্ডটার কোন ক্ষতি হয়নি। ওপরদিকে মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটা – যাকে অবলাল চেনে বলে মনে হচ্ছে, বেঁচে আছে কিনা কে জানে? নাড়ি দেখার সুযোগ পায়নি, তার আগেই সরিয়ে দিয়েছে ওকে অবলাল।

কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা বিস্ময় নিয়ে অবলালকে লক্ষ্য করল কায়েস। মেয়েটা জীবিত কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ আর বিস্ময়ের কারণ মেয়েটাকে কাছ থেকে দেখার পর অবলালের প্রতিকৃয়া। এটা সত্যি যে অবলাল তার অতীতের ব্যাপারে মুখ খোলেই না, কিন্তু গত ক'বছরে এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছে কায়েস যে খুবই কঠিন মানুষ অবলাল। এবং শুধু শারীরিক বা ব্যবহারিক দিক থেকেই নয়, মানসিক ভাবেও বটে। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখেও বরফের মত শীতল, উত্তজনা কাকে বলে জানেই না যেন। রোবটের মত দক্ষ এবং নিরুত্তাপ, মাঝে মাঝে কায়েসের সন্দেহ হয় এলোক আসলে মানুষ না অন্য কিছু? এবং ওকে যা করতে দেখেছে তারপর এহেন সন্দেহ খুব একটা অমূলকও নয়।
কিন্তু এইমাত্র ওর কন্ঠে যেন আবেগের ছোঁয়া পাওয়া গেলো? খানিকটা ইতস্তত করল কায়েসে, তারপর এগিয়ে গিয়ে ফের ঝুঁকে পড়ল মেয়েটার ওপর। খুব সাবধানে দেহটাকে কিছুটা তুলে ধরেছে অবলাল, যেন ওটা কাঁচের তৈরি, সামান্য নাড়া লাগলেই গুড়িয়ে যাবে! কায়েস কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে এমন সময় অনেক লোকের সারা পাওয়া গেলো দোরগোড়ায়।

"কি হচ্ছে এখানে?" বাজখাই গলায় গর্জে উঠল কে যেন, পর মূহুর্তে স্বরটা বদলে গেলো, "ইয়া আল্লাহ্, মাবুদ!" এরপর সম্মিলিত কন্ঠের বিস্ময় আর ভয় মেশানো গুঞ্জন। কয়েকজন নার্স, জনা দুই ডাক্তার আর পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একলোক হুড়োহুড়ি করে ঢুকে পড়ল আধভাঙ্গা দরজা ঠেলে।
"আরে জহির!" বলে উঠল কায়েস।
"কায়েস ভাই, কি হচ্ছে এখানে?" হতবিহ্বল গলায় প্রশ্ন করল সাব ইন্সপেক্টর জহির।
এমন সময় সবাইকে ছাপিয়ে শোনা গেলো অবলালের গলা, "এখানে একজন ডাক্তার লাগবে, জলদি!"
আবার অনুভব করল কায়েস, অদ্ভুত কি যেন আছে অবলালের কন্ঠের মাঝে, মানুষকে প্রভাবিত করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা! ওর মনে হলো এই মূহুর্তে একজন ডাক্তারকে খুঁজে বের করাই

বোধহয় গোটা জগৎ সংসারে সবথেকে জরুরি কাজ! যদিও কায়েস বুঝতে পারছে ব্যাপারটার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে – কিন্তু তবু একে উপেক্ষা করার ক্ষমতা যে ওর নেই তাও বিলক্ষণ অনুধাবন করতে পারল।

সৌভাগ্যক্রমে দু'জন ডাক্তার উপস্থিতই ছিলেন, দ্রুত এগিয়ে গেলেন তাঁরা। ত্বরাবোধটা যেমন হঠাৎ উদয় হয়েছিল তেমনই চট করে বিদায় নিলো।
ডাক্তারদের একজন নার্সদের উদ্দেশ্য বললেন মেয়েটাকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবার জন্য স্ট্রেচার আনতে, অন্যজন ওর নাড়ি টিপে এবং আরও কয়েকভাবে পরিক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন।

"বেঁচে আছে, তবে অবস্থা সঙ্গিন!" মিনিট দুয়েক পর বললেন ভদ্রলোক, "ইন্টারনাল হ্যামোরেজ হয়ে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা করতে হবে, তবে আশার কথা আমরা সময় মত শুরু করতে পেরেছি।"

লম্বা করে শ্বাস নিলো অবলাল, ওর মুখ থমথম করছে, তবে প্রাথমিক দিশেহারা ভাবটা - যা কায়েস ক্ষনিকের জন্যে লক্ষ্য করেছিল - কাটিয়ে উঠেছে। "আচ্ছা, আপনারা দেখুন, কোন ত্রুটি যেন না হয়। খরচ নিয়ে ভাববেন না, আমি পরে খোঁজ নেব।" অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল ও, যেন জোর মন থেকে কিছু তাড়াতে চেষ্টা করছে। তারপর এগিয়ে গেলো রাশেদুনের বিছানাটার দিকে, "কায়েস, এদিকে এসো তো!"

###

যে কোন কাজের বেলাতেই প্রথম ভাবমূর্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, অন্তত তরন্দিদেব তাই মনে করে। এটা সত্যি যে তার ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন প্রায় কখনোই পড়ে না, এবং বেশির ভাগ কাজ শুরু হতে না হতেই শেষ করে ফেলে সে, কিন্তু তাই বলে কাজ নিয়ে - তা যত সামান্যই হোক না কেন - কখনো হেলা ফেলা করে না তরন্দিদেব। হ্যাঁ সে মানুষটা খুব খারাপ – অবশ্য যদি এখনো তাকে মানুষ বলা যায় আর কি! কিন্তু তবু, তান্ত্রিক তরন্দিদেবের কিছু নীতি রয়েছে, যা সে কখনোই ভঙ্গ করে না, করবেও না। খুব সম্ভব দীর্ঘদিন কঠোর নিয়ম মেনে সাধনা করায় তার স্বভাবে একগুয়ে ভাবটা বড্ড বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্তু তরন্দিদেবের মতে একগুয়েমি ক্ষেত্র বিশেষে দোষ নয়, বরং গুণ।
সে যাই হোক, গতরাতে ডেরা থেকে ঢাকার পথে রওনা দেবার সময় একটু স্নায়ুবিক চাপে ভুগছিল তরন্দিদেব, কারণ প্রায় আট বছর হতে চলল, কোন ছোট শহরেও যায়নি সে, আর ঢাকা তো মহানগরী! তরন্দিদেব সাধারণ মানুষ নয়, অশুভ ক্ষমতার যে স্তরে সে পৌছেছে তাতে করে আরও অনেক কিছুর সাথে সাথে চলাফেরাও অনেকটাই বদলে গেছে তার। পায়ে হাঁটা বা ক্ষেত্র বিশেষে যান বাহন অপেক্ষাও অনেক সাবলীল তার গতিবিধি। যদিও সেটা করার জন্যে

কিছুটা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা - যাকে সবাই মানা বলে চেনে – ব্যবহার করতে হয় তাকে, কিন্তু মানার কোন স্বল্পতা নেই তরন্দিদেবের।

মাঝারি পাল্লার দুরুত্ব খুব সহজেই পাড়ি দিতে পারে সে – তবে তার গন্তব্য স্থানটা অন্ধকার হওয়া বাঞ্ছনীয় বা নিদেনপক্ষে ছায়া থাকতে হবে সেখানে। রাতের বেলা তাই যেকোন জায়গায় যাওয়া তার জন্যে খুবই সহজ। ওর ডেরা লোকালয় থেকে বেশ দূরে হওয়া স্বত্বেও এই ক্ষমতার বলে খুব দ্রুতই ঢাকায় পৌছে গেলো তরন্দিদেব। ভোরের আলো ফোটার কিছুক্ষণের পরে গাবতলির কাছে এক বাসের কন্ট্রাকটর আবিস্কার করল যে পেছেনের সিটের জনৈক যাত্রী বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে! অনেক ভেবেও ব্যাপারটা কি করে ঘটেছে সে ব্যাখা বের করতে পারল না বেচারা। ওদিকে তরন্দিদেব উপস্তিত হয়েছে রাস্তার ধারের ছায়া ঢাকা এক কোণে। মুখে তার আত্মতুষ্টির হাসি, এই ছেলেমানুষী কায়দায় লোকজনকে ধোকা দেয়াটা বেশ উপভোগ করে সে। সুস্ময় ভট্টাচার্য্য যেখানে দেখা করতে বলেছে তা চেনে না তরন্দিদেব, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়। কারণ তাকে পথ চিনে আসার সুযোগ করে দিতে সুস্মময় কিছু সময়ের জন্যে নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করবে বলেছে।

সকল জীবেরই মানা রয়েছে – কারো কম আবার কারো বা বেশি; কেউ এর ব্যবহার জানে, কেউ জানে না। যারা উঁচুদরের অতিপ্রাকৃত কর্মকান্ডে জড়িত, তারা চাইলে অনেকদূর থেকে স্বভাবিক অপেক্ষা শক্তিশালী মানা ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করতে পারে। এ কারণেই আবার শক্তিশালী অতিপ্রাকৃতরা বেশিরভাগ সময় নিজেদের মানাকে গোপন করে রাখে। পাছে কোন শত্রু তাদের অবস্থান না জেনে যায়! কিন্তু ঝামেলাটা হয়েছে অন্যখানে, শহরের ভির-ভাট্টা তরন্দিদেবের কাছে শুধু অসহ্যই না, একেবারে অসহনীয় ঠেকে। তাও যদি কোন নির্জন কোণ খুঁজে পাওয়া যেত, ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারত সে। কিন্তু দিনের বেলায়, রাস্তার মাঝে সেরকম জায়গা কোথায় পাবে? হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে খুব সহজেই কারো বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে সে, কিন্তু লোকের দৃষ্টি আকর্ষন করবে এমন কিছু করতে বিশেষ ভাবে বারণ করে দিয়েছে সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। বাসের মাঝে এক-আধজন কন্ট্রাকটরকে চমকে দেয়া এক কথা আর হুট করে কারো বাড়িতে ঢুকে পড়া সম্পূর্ণ আরেক।

সকাল এগারোটায় সুস্ময় তার উপস্থিতি প্রকাশ করবে বলেছে, তার আগ পর্যন্ত কিছুই করার নেই! এতটা সময় কাটাবে কি করে? বিরস বদনে বসে বসে সে কথাই ভাবছিল তরন্দিদেব।

যদিও জানে যে লাভ নেই, ইচ্ছে করে দেখা না দিলে উঁচুদরের কোন মানা ব্যবহারকারীকে সনাক্ত করা অসম্ভব একটা ব্যাপার, তবু শুধু বিরক্তি কাটাতে একটু পরপর মনসংযোগ করে আশেপাশে কয়েক মাইলের মাঝে কোন অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছিল তরন্দিদেব। আরও একটা কারণ ছিল, সাধারণত দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকে সে,

কবরের মাঝে। জেগে ওঠে শুধু রাতে, আর রাতে সময় বোঝার জন্যে তারার অবস্থানকে কাজে লাগায়। কিন্তু দিনের বেলা শুধু সূর্য দেখে যথাযথ সময় নির্ধারন করা ওর জন্যে একটু কঠিন। কারো থেকে একটা ঘড়ি ছিনিয়ে নেবে কিনা ভাবল একবার, কিন্তু পরে নাকচ করে দিল চিন্তাটা, ইচ্ছে করছে না। তার থেকে একটু পর পর একবার করে সুস্ময়কে খোঁজা যাক - সময়ও কাটবে, আবার কাজও হবে।

এমন করতে গিয়েই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে আবিস্কার করল তরন্দিদেব, যে মাইল কয়েকের মধ্যেই সঙ্ঘাত ঘটেছে অত্যন্ত শক্তিশালী দু'টো শক্তির। তা ঘটুকগে! আমার কি? ভাবতে গিয়েও থমকে গেলো তরন্দিদেব। শহরে না এলেও বোকা নয় সে, জানে অতিপ্রাকৃতেরা সাধারণত লোকালয় এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে। যদি বা কখনো ঘনবসতিপূর্ণ জায়গাতে তৎপরতা চালায়ও, চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব নিজেদের উপস্থিতি গোপন রাখতে। তথাকথিত ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন, এই একটা ব্যাপার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে এমন যেকেউ প্রায় অলিখিত আইনের মত মেনে চলে, বিশেষ করে যারা একটু উঁচুস্তরের। কারণ কে না জানে, বাপের ও বাপ আছে! বেশি বেলাইনে চলে গেলে ব্যবস্থা নেবে অতিপ্রাকৃত সমাজের মহারথীরা, আর তাদের রোষানলে পড়ার ঝুঁকি কেউই নিতে চায় না।

যারা এমূহুর্তে লড়ছে তারা আর যাই হোক নিম্নশ্রেণীর কেউ নয়, তারপরও দিনের বেলা একটা বড় শহরে এমন যথেচ্ছা মানা ব্যবহার কেন করছে সেটা কৌতুহল জাগাল তরন্দিদেবের মনে, তাছাড়া ওর বর্তমান কাজের সাথে এর কোন সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে। সুস্ময়ের বার্তা থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে বড় কোন কাজে নামতে যাচ্ছে ওরা, এবং সেরকম কিছু হলে বাঁধা আসা স্বাভাবিক। হয়ত তা নিয়েই কোন গন্ডগোল বেঁধেছে ?

যেকোন কাজে প্রথম ভাবমূর্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই একটু আগবাড়িয়ে ব্যাপার ভালো করে দেখে নিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই – বিশেষ করে হাতে যখন সময় রয়েছে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল তরন্দিদেব, জায়গাটা বেশ দূরে, মোট ছ'বার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করতে হলো ওকে পৌঁছুতে। কাছাকাছি আসার পর গুলির শব্দও কানে এলো তার। সরেজমিনে দেখার লক্ষ্যে একেবারে কাছে চলে এলো তরন্দিদেব, উদয় হলো তিনতলার একটা কার্নিশের ছায়ায়। তারপর জানালা দিয়ে শান্তপর্ণে উঁকি দিলো।

ঘরটার ভেতরে যেন নরক গুলজার বয়ে যাচ্ছে, আর তার মাঝে যুঝছে দু'জন লোক। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, এদের উপস্তিতিই টের পেয়েছে তরন্দিদেব। একজনের একহাতে হাতে খোলা তলোয়ার অপর হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন এক পিস্তল, অন্যজনের বাগিয়ে রয়েছে একটা

ত্রিশূল। বাহ ভালো জমেছে, ভাবল সে। কিন্তু ত্রিশূল ধারী লোকটার দিকে আরেকবার তাকাতেই চমকে উঠল। আরে? এযে ডমিনিক বায়রান!

বহু বছর আগে এই আধা বৃটিশ লোকটার সাথে পরিচয় হয়েছিল তরন্দিদেবের। পাকিস্থান আমলের গোড়ার দিকের কথা, বায়রান একজন বৃটিশ চাকুরের সন্তান, যে কিনা এদেশী যাদুর চর্চায় খুবই উৎসাহী ছিল, এতটাই যে এখানেই থেকে গেছে। একই গুরুর কাছে কালো যাদুর মৌলিক বিষয়গুলো শিখেছিল ওরা – এবং সে সময় ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওদের মাঝে। পরে তরন্দিদেব যখন সাধনার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে লোকলয় ত্যাগ করে তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

"হুবড়িজাহ নোজাহ!" এতদিন পর পুরানো দোস্তকে দেখে ক্ষণিকের জন্যে মনযোগ সরে গিয়েছিল তরন্দিদেবের, চাপা গর্জনটা ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। বিস্মিত হয়ে দেখল, প্রচন্ড শক্তিধর একটা আঘাত হেনেছে অপরিচিত লোকটা। বায়রনকে চেনে তরন্দিদেব, জানে ওর ক্ষমতা। অবশ্য সে বুহুকাল আগের কথা, কিন্তু বেঁচে যখন রয়েছে অন্ততপক্ষে আগের চেয়ে দুর্বল সে হয়নি; কারণ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সময় এবং চর্চার সাথে সাথে বাড়ে, কমে না। তাই বায়রান যখন একই সঙ্গে তীব্রক্ষমতাধর প্রতিআক্রমণ চালাল, অবাক হল না সে। বরং সত্যি বলতে একটু হতাশই বোধ করল, কারণ আগের সেই ধারা বজায় রাখলে এত বছর পর বায়রানের আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার কথা।

অন্যদিকে ওই অচেনা লোকটার ক্ষমতা তাজ্জব করে দিয়েছে তরন্দিদেবকে। নিজের শক্তি নিয়ে বেশ গর্ববোধ করে তরন্দিদেব, জানে ওর মত ক্ষমতার এত উঁচু স্তরে খুব কম লোকই পৌছতে পারে, কিন্তু মাত্র যা দেখল সেই রকম একটা আঘাত করা এমনকি ওর পক্ষেও খুবই কঠিন হবে। শিক্ষানবিশ থাকতে বায়রান কখনোই ওর সাথে পাল্লা দিতে পারত না, আর ভাবে যা বোঝা যাচ্ছে ওর মত অতটা উন্নতিও হয়নি তার। তাই অমন ভয়ঙ্কর একটা আক্রমণের পর ফলাফলটা অবাক করল না তাকে।
একবার ভাবল নিজে যোগ দেবে কিনা লড়াইটাতে, কিন্তু নাকচ করে দিলো চিন্তাটা। প্রথমত আরও লোকজন চলে আসছে, তাছাড়া ওই অচেনা প্রতিপক্ষ যা দেখাল তারপর তাকে হেলাফেলা করা চলে না।

আর সবচাইতে বড় কথা, এটা ওর লড়াই নয়, সুস্ময় ভট্টাচার্য্য বা তার কাজের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা এখনো জানে না ও, তাই আগ বাড়িয়ে নাক গলানোর কোন মানে হয় না।

তবে একেবারে হাত গুটিয়ে বসেও থাকল না সে, তান্ত্রিক তরন্দিদেব খারাপ লোক হতে পারে, কিন্তু তাই বলে পুরানো বন্ধুকে বিপদের সময় সাহায্য করবে না – অত খারাপ নয়! আবার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করল সে, উদয় হলো ঘরের ভেতরের একটা ছায়াতে, এবং বায়রানের ভূপতিত দেহটা এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো একই কায়দায়।

সতের

অরণীকে ইমার্জেন্সিতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, রাশেদুনকেও অন্য একটা ঘরে সরিয়ে নেবার তোরজোর চলছে। একটু আগের গোলাগুলি এবং সঙ্ঘর্ষের ফলে অন্যান্য রোগীদের বেশ সমস্যা হয়েছে, কায়েস জহিরকে ওইদিকটা সামলনো দায়িত্ব দিলো। তাছাড়া রবিউল আলমকে কি ঘটেছে জানাতে বলে রাশেদুনের বিছানার কাছে, অবলালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। "কি ব্যাপার?"

"ওর সাথে আলাপটা সেরে নেয়া যাক," তর্জনি দিয়ে রশেদুনের দিকে ইংগিত করল অবলাল।

"আপনারা কারা?" প্রশ্ন করল রাশেদুন, ওর গলাটা ভাঙ্গা শোনাল, অবশ্য কোমা থেকে জেগে উঠেই এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে পড়ার পর কথা যে বলতে পারছে এই তো বেশি।

অবলাল কিছু বলার জন্য মুখ খুলল কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলো কায়েস, "আগে আমি অফিসিয়াল কাজটা সেরে নেই তারপর তুমি কথা বল।"

"আপনার ওপর এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা হামলা হয়েছে," রাশেদুনকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। "আমি কায়েস হায়দার, ইন্সপেক্টর – স্পেসাল ব্র্যাঞ্চ, এই কেসটা তদন্ত করছি। ভিকটিম হিসেবে আপনি যা জানেন দয়া করে বলুন। খুঁটিনাটি কোন কিছুই বাদ দেবেন না, যেকোন তথ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

"আগে আপনি বলুন এখানে হচ্ছেটা কি?!" তীক্ষ্ণ স্বরে প্রায় ককিয়ে উঠল রাশেদুন।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কায়েস, "কি হচ্ছে তা আসলে আমরা আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না," একটু আগের আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিটা বিদায় নিয়েছে ওর কণ্ঠ থেকে। "কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রয়েছেন আপনি। হাসপাতালে আনার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত হামলা হলো আপনার ওপর, এবং সত্যি বলতে কপাল জোরে বেঁচে গেছেন দু'বারই।" একটু থামল সে, "এমনতি এই শারীরিক অবস্থাতে আপনাকে জিজ্ঞেসাবাদ করার প্রশ্নই আসত না, কিন্তু এখন পরিস্থিতি আর যাই হোক স্বাভাবিক না।"

"বুঝতে পারছি।" শুকনো গলায় বলল রাশেদুন, "কি জানতে চান?"

"আপনি যা জানেন সব খুলে বলুন। গোড়া থেকে, কিছু বাদ দেবেন না।"

"আসলে আমি তেমন কিছুই জানি না, কাল রাতে..."

"কাল নয়, পরশু, আপনি একদিন অজ্ঞান ছিলেন।" ওকে সুধরে দিলো কায়েস।

এক মূহুর্ত চুপ করে থাকল রাশেদুন, তারপর ফের শুরু করল, "আচ্ছা, তাহলে পরশু রাতে আমি বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ব্যাক ভিউ মিররে ভয়ঙ্কর একটা ছায়া দেখতে পাই।"

ঘটনাটা মনে করেই বোধহয়, শিউরে উঠল সে। স্পষ্ট দেখতে পেল কায়েস, ওর হাতের রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে।

কথা চালিয়ে গেলো সে, "ঠিক কি রকম সেটা বলে বোঝাতে পারব না, তবে বীভৎস! জ্যান্তব এবং বিভীষিকাময়। এর আগেও দু'বার ওটাকে দেখেছি আমি কিন্তু এতটা স্পষ্ট আর কখনো

ছিল না।" থামল সে, হাঁফাচ্ছে। দুর্বল শরীরি টানা কথা বলা এবং ভয়াল স্মৃতিচারণ করতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে বেচারার, বুঝতে পারছে কায়েস। কিন্তু কিছু করার নেই।
"আগে যখন দেখেছেন কি করেছিলেন তখন?" প্রশ্নটা অবলালের।
"প্রত্যেকবারই আমি গাড়ি চালানোর সময় উদয় হয়েছে ওটা। আর তারথেকেও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, ওঠাকে দেখার সাথে সাথে নয়, বরং একটু পরে একটা সর্বগ্রাসী ভয় ধাক্কা মারে আমাকে। প্রথমবার জ্বর এসে পড়ে। দ্বিতীয়বার গাড়ির নিয়ন্ত্রন হারিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছিলাম। আর এবার যখন আরও স্পষ্টভাবে ওটাকে দেখলাম তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। কোনমতে বাসায় পৌছানোই তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।"
"এই ব্যাপারটা নিয়ে কারো সাথে আলাপ করেছিলেন?" জানতে চাইল কায়েস।
"ঘটনাটা প্রথমবার ঘটার পর আমার স্যার, মানে ডক্টর সোবাহানকে বলেছি কিন্তু উনি আমল দেননি। বলেছিলেন অতিরিক্ত গরমে আমার মতিভ্রম হয়েছিল। এবং বাস্তবিকই সেদিন খুব গরম পড়েছিল বলে আমি ওনার ব্যাখ্যা মেনে নেই। আর দ্বিতীয়বার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলায় ওটা চাপা পড়ে যায়। পরে আর আলাপ করা হয়নি কারো সাথে। এমনিতে আমার সাহসী বলে মোটামুটি নাম ডাক আছে, সেই আমি এমন একটা ছেলে মানুষী বিষয়ে ভয় পেয়ে কাবু জানলে লোকে হাসাহাসি করতে পারে মনে করে আর আমিও আগ বাড়িয়ে কাউকে বলতে যাইনি।"
"আচ্ছা, তারপর কি হলো?"
"কি করে যে গাড়ি চালিয়েছি তা আমি নিজেও জানি না, ভয়টা উত্তোরোত্তর বেড়ে চলেছিল; তবে নিরাপদেই পৌছাতে পারি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সদর দরজাটা বন্ধ ছিল। শাহেদকে যে ফোন করব সে উপায়ও ছিল না কারণ ফোনের চার্জে শেষ হয়ে গিয়েছিল..." কি মনে হতে থেমে গেলো সে, "আচ্ছা ইন্সপেক্টর সাহেব, শাহেদ কোথায়?"

###

কাজে বাঁধা আসবেই - এটাই স্বাভাবিক, জানে সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। কিন্তু এবারের কাজটার যে গুরুত্ব তাতে ভুল করার সুযোগ নেই। এত বড় কাজ আগে কখনো হাতে নেয়নি সে। সফল হতে পারলে কি ঘটবে চিন্তা করে রীতিমত পুলক অনুভব করল সে! যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে তখন! এমন সুযোগ বারবার আসে না। সেকারণেই ছোট কোন ভুলও যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর রেখেছে সে শুরু থেকেই। ডমিনিক বায়রানকে সে বহু বছর ধরে চেনে। যথেষ্ট যোগ্য লোক, একটু ছটফটে আছে বটে কিন্তু নিজের কাজ সে ভালোই বোঝে। অন্য যাদেরকে দলে টানা হয়েছে তারাও নানা ঘাটে পানি খাওয়া চিজ।
মানুষ বা অতিপ্রাকৃত যাই হোক না কেন। কিন্তু ওই এক সোবাহান সব ঘোট পাকিয়ে ফেলেছে। শাস্তি স্বরূপ অনেক আগেই ওকে মেরে ফেলত সুস্ময় কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে একটা বিশেষ কারণে।

যাই হোক, বায়রানকে পাঠিয়ে মোটামুটি নিশ্চিত বোধ করছে সে। বলির ওই ছোকড়াকে দিয়ে কাজ হলে ভালো – নাহয় তার লোক খবর এনেছে, বিক্রমপুরের এক গ্রামে বলির উপযোগী একটা মেয়েকে নাকি পাওয়া গেছে। এবার আর বেশি সময় নেই হাতে, তাই প্রয়োজনে রাকঢাক না করে সরাসরি ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে। আর যদি কোন কারণে এই পথে কাজ সমাধা না হয়, সেজন্যেই বিকল্প রাস্তার কথা ভেবে তরন্দিদেব নামের ওই তান্ত্রিককে খবর দিয়েছে।

সুস্ময় ভট্টাচার্য্য নিজেও একজন তান্ত্রিক। তবে শুধু তান্ত্রিক বললে তার পূর্ণ পরিচয় দেয়া হবে না। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকা অনেক কিংবদন্তির ভিড়ে হয়ত লোক শোণিত মন্দিরের নাম মনে রাখেনি, কিন্তু যারা অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে তারা আজও ওই নাম সমীহের সাথে উচ্চারণ করে। মোঘল আমলে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত শোণিত মন্দির চিল খুব সম্ভব উপমহাদেশের সব চাইতে ক্ষমতাধর অতিপ্রাকৃত ঘাঁটি।
না না, মন্দির মানে কোন দেবতা বা দেবীর মন্দির নয় ওটা। নয় হিন্দু, বোদ্ধ বা অন্য কোন ধর্মের উপাসনালয়ও - শোণিত মন্দিরে পূজা করা হত শুধু মাত্র রক্তের! ঠিক কোথায় তা অবস্থিত ছিল সেটাও এক রহস্য; তবে ধারনা করা হয় বর্তমান পশ্চিম বাংলার কোন এক জঙ্গলে বহু শতাব্দী আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওই মন্দির।

অতিপ্রাকৃত সমাজের বড় সমস্যা হচ্ছে কোনটা তথ্য আর কোনটা গুজব তার মাঝে পার্থক্য করা খুব কঠিন। যারা জানে তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অবশ্য কোন উপদেবতা বা অমর দানব সেধে অ্যাস্ট্রাল থেকে এসে তথ্য দিয়ে যাবে এমনটা আশা করারও কোন কারণ নেই। সাধারণ যারা আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে লিপ্ত তারা নিজেদের গন্ডিই ঠিক মত সামলাতে পারে না, ইতিহাস রক্ষণাবেক্ষণ তো বহু পরের কথা। এসব কারণেই ঠিক কে বা কারা, কবে শোণিত মন্দির তৈরি করেছিল তা উদ্ঘাটন করা আজ প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সুস্ময় তার বাবার মুখে শুনেছে সম্রাট অশোকের আদেশে নাকি গড়ে তোলা হয়েছিল ওই মন্দির। কিন্তু খুব নাম করা আর ক্ষমতাশালী অন্য এক তান্ত্রিক আবার বলেছে যে শোণিত মন্দির নাকি আরও প্রাচীন। সে যাই হোক, উৎস নিয়ে সুস্ময় ভট্টাচার্য্যের কোন মাথা ব্যথা নেই। সে জানে যে শোণিত মন্দির থেকে বিতারিত হয়েছিল তার এক পূর্বপুরুষ, ওইটুকুই যথেষ্ট।
তা প্রায় ছয়'শ বছর আগের কথা। অতীব শক্তিশালী বহু ক্ষমতা ছিল শোণিত মন্দিরের পুরোহিত এবং সন্যাসিদের। তারা জানত অনেক গোপন বিদ্যা, অনেক যাদু, মানার এমন অনেক ব্যবহার যা খুলে দিতে পারে অকল্পনীয় সব সম্ভাবনার দুয়ার। কিন্তু সে সব বিদ্যা ব্যবহারের বেলায় স্বভাবতই অনেক বিধি নিষেধও ছিল। তেমনই এক নিষিদ্ধ বিদ্যা, জীবন

এবং যৌবনকে প্রলম্বিত করার একটা কৌশল অপব্যবহারের অপরাধে সুস্ময়ের পূর্ব পুরুষকে বহিস্কার করা হয়। সেই বিদ্যা আজও বংস পরম্পরায় ব্যবহার করে যাচ্ছে ওরা।
মাঝের কয়েক প্রজন্ম একটু ঝিমিয়ে পড়লেও বরাবরই তারা তান্ত্রিক গোষ্ঠী। বাপ দাদার মত ভুলে থাকতে পারেনি সুস্ময়, শোণিত মন্দিরের পুরোহিতের রক্ত বইছে ওর শরীরে, হোক না সে বহিষ্কৃত পুরোহিত। তাই আর দশটা সাধারণ তান্ত্রিকের সাথে তাকে এক কাতারে ফেলা যায় না। শোণিত মানে রক্ত, আর সেই রক্তের ধারা যখন রয়েছে – কিছু ক্ষমতাও রয়ে গেছে তার মাঝে। এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে দীর্ঘদিন সাধনা করেছে সে, এবং নিরাশ হতে হয়নি। তবে এইটুকুই যথেষ্ট না, আরও অনেক অনেক ক্ষমতা দরকার সুস্ময় ভট্টাচার্য্যের। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নেই। আর সেজন্যেই এই কাজটার সঠিক সমাধা খুব জরুরী।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই এগারোটা বাজার অপেক্ষা করছিল সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, কারণ তখন তাকে তার উপস্থিতি প্রকাশ করতে হবে, বা সহজে করে বললে নিজের মানা কিছুক্ষণের জন্যে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে। কাজটা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ, তার মত ক্ষমতাধর কারো মানা অনেকেরই নজরে আসতে পারে, এবং এই মূহুর্তে কোন উচ্চতর শক্তিশালী পক্ষের কাছে জবাবদেহী করতে একেবারেই নারাজ সে। আর সেকারণেই কাজটা করতে হবে শুধু মাত্র এক মূহুর্তের জন্যে, এবং তাও সবটা দেখানোর দরকার নেই, শুধু ওই তান্ত্রিক পথ চিনে আসতে পারার মত হলেই চলবে।

কিন্তু হঠাৎই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চিন্তায় ছেদ পড়ল সুস্ময়ের। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির মালিক সেই অতিরিক্ত সচিব। কাচু মাচু ভঙ্গিতে হাত জোর করে সে বলল, "হুজুর, একটা সমস্যা হয়েছে।"
"সমস্যা?" বাজখাই গলায় গর্জে উঠল সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, এমনিতেই ঝামেলার শেষ নেই! আবার কি হলো? ভেবেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেলো তার।
"জ্বি হুজুর। বড় ধরণের সমস্যা!" বলতে বলতে চেহারা কুঁচকে ফেলল বেচারা অতিরিক্ত সচিব, ভীষণ ভয় পাচ্ছে সে কারণ বেটে এই তান্ত্রিকের ক্ষমতা এবং মেজাজের বহর বেশ দেখেছে গত ক'দিনে। কখন যে কি করে বসবে, কে জানে?
"কি হয়েছে...?" কথা শেষ করতে পারল না সুস্ময়, তার আগেই অতিরিক্ত সচিবকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল লম্বা এক লোক।
গায়ের রঙ তার ফ্যাঁকাসে সাদা, যেন সূর্যের মুখ দেখে না বহুদিন। হালকা পাতলা শরীর, সুদর্শন চেহারা; তবে চোখের দৃষ্টি স্থির এবং ঠাণ্ডা, কেমন যেন মরা মানুষের চোখের মত – প্রাণহীন।

একা নয় সে, তার কাঁধের ওপর ঝুলছে একটা মানব দেহ। লোকটাকে দেখে মনে হয় না গায়ে জোর আছে কিন্তু যেভাবে অবলীলাক্রমে ওজনটা বইছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট শক্তি ধরে সে ওই শীর্ণ শরীরে।

"কে তুমি, কি চাও?" খেঁকিয়ে উঠল সুস্ময়, কিন্তু পরক্ষণে ভালো করে আবার তাকাতেই চিনতে পারল সে লোকটাকে। এর সাথেই স্বপ্নালাপ করেছে সে দু'দিন আগে – তরন্দিদেব। কিন্তু ওর কাঁধে ওটা কার দেহ? বায়রান না?

আঠার

শুকনো মুখে একে অপরের দিকে তাকালো কায়েস আর অবলাল। এই রকম একটা কিছুর ভয়ই করছিল ওরা। ছেলেটা মাত্র কোমা থেকে জেগেছে – শারীরিক দুর্বলতার পাশাপাশি মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত সে, এই অবস্থায় ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ সহ্য করতে পারবে কিনা কে জানে?

"কি ব্যাপার?" রাশেদুনের গলায় শঙ্কা, "কথা বলছেন না কেন? শাহেদ ভালো আছে তো?"

"রুদ্রদা!" ডেকে উঠল একটা উত্তেজিত কণ্ঠ, পই করে ঘুরল অবলাল, ওর চোখে স্পষ্ট তিরস্কারের দৃষ্টি দেখতে পেলো কায়েস। ঘরে প্রবেশ করেছ লম্বামত সুদর্শন এক ছেলে, বয়স হবে সতের আঠার। খুব সম্ভব দৌড়ে এসেছে বলেই হাঁফাচ্ছে।

"তোকে আমি বেশ কয়েকবার সতর্ক করেছি সাদিব," মাত্রাতিরিক্ত শীতল শোনাল অবলালের গলা।

জিভ কাটল ছেলেটা, "মনে ছিল না, আসলে..."

"প্রকাশ্য দেখা করার ব্যাপারে নিয়মটা কি?"

"আসলে স্যার, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে প্রটোকল মানার উপায় নেই!"

"হচ্ছেটা কি এখানে? এই ছেলে, কে তুমি?" বিরক্ত হয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল কায়েস।

ওর দিকে ফিরল অবলাল, "আচ্ছা তুমি রাশেদুনকে সব বুঝিয়ে বল, আমি একটু আসছি!" ভাবখানা এমন যেন পিয়নকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবার কথা বলছে, কিন্তু কায়েসকে কোন উচ্চবাচ্চ করার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে, পিছু নিলো নবাগত ছেলেটা।

ক্লিনিকের সামনে লোকজনের ভিড়, পুলিশ, সাংবাদিক আর অতিউৎসাহী জনতা বিরাট জটলা পাকিয়ে ফেলেছে। সোরগোলটা পাশ কাটিয়ে বের হতে বেগ পেতে হলো ওদের। এগিয়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল অবলাল, সাথে সাদিবও। দরজা লাগিয়ে কাঁচ তুলে দিতে গাড়ির ভেতরটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বাইরের জগৎ থেকে। এবার সাদিবের দিকে ফিরল অবলাল, "বার বার বলেছি যে কোন অবস্থাতেই পাবলিকালি দেখা করা যাবে না। বলিনি?"

"কিন্তু রুদ্রদা ঘটনাটা কি? কি হচ্চিল..."

"মারব এক থাপ্পর!" ধমকে উঠল অবলাল, "দেখা করলি তো করলি আবার ওই নামে ডাকছিস! মাথা ঠিক আছে তোর? আমার নাম কি? বল, আবার শুনি..."

"ইয়ে মানে," ইতস্তত করল সাদিব, "সবার সামনে অবলাল!"

"এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিস যেন এটা ভুয়া নাম!" মুখ বাঁকাল অবলাল।

"না না তা হবে কেন, তবে পুরোপুরি সঠিক নামও তো না – আধা ভুয়া!" চোখ টিপল সাদিব, পরিবেশটা হালকা করতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

"এখন বল ঘটনা কি?" কথা ঘোরাল অবলাল।

"আরে আগে তোমার এখানে কি হচ্ছে সেটা বল"।

"বেশি পাকামো না দেখিয়ে যা বলছি কর। আমার কথা পরে বলছি!"

“ঘটনা তো বেশ পেঁচিয়ে গেছে, তুমি ছিলে কোথায়? কোন যোগাযোগ করতে পারছি না!”
“পারার কথাও তো না,” পাইপে তামাক ঠুশছে অবলাল, “আমাকে যে ফোনে পাওয়া যায় না জানিসই তো।”
“আচ্ছা এই কাজটা কেন কর বলত? সাথে একটা ফোন রাখতে সমস্যাটা কোথায়, এমন তো না যে তুমি প্রতিনিয়ত লড়াই করছ, হুট হাট শক্তিধ্বনি উচ্চারণ করতে হবে।”
“কখন ঝামেলা বাধে তার কোন ঠিক আছে? বার বার সেট নষ্ট হয়ে যায়। জানিসই তো আমার মানার নিয়ত্রন ভালো না, বড় রকমের কোন মন্ত্র ব্যবহার করলে সাথের ইলেক্ট্রনিক জিনিস চাপ নিতে পারে না।”
“এই রুদ্রদা, নিজের ফুসফুসের যত খুশি ক্ষতি কর কিন্তু আমারটার বারোটা বাজানোর কোন অধিকার নেই তোমার!” নাক কুঁচকাল সাদিব, ধোঁয়ায় অস্বস্তি বোধ করছে। “আর এমন তো না যে তুমি গরিব মানুষ, টাকা পয়সার সমস্যায় ভুগো, নতুন সেট কিনতে পারবে না। হলো নাহয় দু’চারটা নষ্ট কিন্তু সাথে একটা ফোন রাখলে এই ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আগেও অনেকবার বলেছি।”
“হয়েছে আর মাতব্বরি করতে হবে না!” ওর মাথায় একটা চাটি মারল অবলাল।
“হুহ! যুক্তিতে না পারলেই বড় ভাইগিরি দেখাও, আমার কথাটা যে ঠিক তা মানতে কি সমস্যা?”
“আচ্ছা হয়েছে, বুঝলাম তোর কথায় যুক্তি আছে। এখন থেকে রাখবনে একটা ফোন।” হাল ছেড়ে দেবার সুরে বলল অবলাল, “তা এইবার যা ঘটেছে খুলে বল।”
“আচ্ছা,” শুরু করল সাদিব, “পরশু তো বললে যে হেড অফিস থেকে কল আসবে এবং ওরা জানাবে কোন এজেন্টকে পাঠানো হচ্ছে। তুমি তো বেরিয়ে গেলে, আমি কল পেলাম কাল মাঝরাতে, ওরা কি বলল জানো?”
“প্রশ্ন না করে বলে যা!”
“বিশ্বাস করবে না রুদ্রদা, ওরা যখন এজেন্টের নামটা বলল আমি চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। আন্তাজ করতে পারো কে?”
“বললাম না প্রশ্ন না করতে!” গম্ভীর গলায় প্রায় ধমকের সুরে বলল অবলাল।
মুখ বাঁকালো সাদিব, “আচ্ছা, তো আমি এজেন্টকে আনতে গেলাম, উনি আবার তোমার নামই শুনতে চান না! যাই হোক, পরে তাঁকে তাঁর জিনিসপত্র, মানে অফিসিয়াল গ্যাজেট সংগ্রহ করে একটা হোটেলে পৌছে দিয়েছি। উনি কোনমতেই সেফ হাউজে যাবেন না, বললেন তোমার সাথে দেখা হওয়া যে কোন মূল্যে এড়াতে চান!”
“হুহ! তারপর?”
“সে তো গতকাল সকালের কথা। এরপর আমি তোমাকে খবরটা জানানোর জন্যে দুপুরে দুই নং-এ ঢু মেরেছিলাম কিন্তু তুমি আসো নাই।”
“তো ফোন ফোন করে এত পাড়া মাথায় তুলছিস, একটা এসএমএস পাঠালেই তো পারতি। জানিসই তো আমি প্রতিদিন দুপুরে চেক করি।”

“আসলে আমি তোমাকে সামনা সামনি বা নিদেনপক্ষে মুখে বলতে চেয়েছিলাম ব্যাপারটা। যাই হোক, কালরাতেও যখন তোমার দেখা পেলাম না, বুঝলাম কোন সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছ। তবে তোমার মত ঝামেলাবাজ লোকের জন্যে সেটা খুবই স্বাভাবিক, তাই আমল দেইনি।”
“বটে! আমি ঝামেলাবাজ লোক?”
“লজ্জা পাও কেন? ঝামেলাবাজ নয়ত কি, সাধু সন্ত?”
“বিটলা পোলা!” বিড়বিড় করল অবলাল, “তা এই রকম হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলি কি জন্যে আর ওমন সবার সামনে দেখাই বা করতে গেলি কেন?”
“তোমার সবটাতেই বেশি বেশি, এই কায়েস সাহেবকে তো কমদিন চেন না। তার সঙ্গেও এত গোপনীয়তা মেনে চলার কি আছে? আর কেন হাজির হলাম জিজ্ঞেস করছ? আড়াই বছর হয়ে গেলো সাদা হাতে যোগ দিয়েছি তোমার শিক্ষানবিশ হিসেবে, কম তো দেখলাম না! কিন্তু আজকের ধারেকাছে কিছু কখনো ঘটেছে বলে মনে করতে পারছি না। কি সাঙ্ঘাতিক তীব্র মানা! আর তুমি বলছ উদ্বিগ্ন না হতে?”
“বুঝলাম। কিন্তু তোর উচিৎ ছিল কথাটা পেটে চেপে না রেখে আমাকে আগেই জানানো যে অরণী এসেছে।” এইবার অবলালের কন্ঠে অভিযোগের সুর, তামাশার ভাবটা সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে ওর চেহারা থেকে।
ঢোক গিললো সাদিব, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, “তুমি জানো?”
“হ্যাঁ জানি,” ওকে হঠাৎ খুব ক্লান্ত দেখাল, “কাজটা ভালো করিসনি। ও মারাও যেতে পারত, এখনো বিপদমুক্ত নয়!”
রাগের চোটে ঠিক মত কথাও বলতে পারছে না সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। প্রচন্ড ক্রোধে তার সারা গা চিড়বিড় করছে। একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে বায়রানের, এখনো বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে সে।
“এমনকি তুমিও বিফল হয়ে ফিরে এলে! ভরসা করার মত কেউই কি নেই আমার আসেপাশে?” ঘরময় পায়চারী করতে করতে তিক্ত স্বরে বলে চলল সে, “তরন্দিদেব ঘটনাচক্রে ওখানে না গেলে তো মারাই পড়তে! এত বছর ধরে, এত সাধনা করে, কি ঘোড়ার ডিমটা শিখেছ শুনি?!”
“সুস্ময়দা,” ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল বায়রান, “পরিস্থিতি না জেনে আমাকে দোষ দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না।”
“আরে রাখো তোমার পরিস্থিতি!” গর্জে উঠল সুস্ময়, হাবভাব এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে তাঁকে দেখে ঘরের কোণে দাঁড়ানো সোবাহান রীতিমত থরথর করে কাঁপছে।

“আমাকে পরিস্থিতি শেখাতে এসেছে! কি এমন পালোয়ান সে লোক যে এরকম কুকুরের পিটিয়ে দিয়েছে তোমাকে?”
“কে আমি জানি না, তবে যতদূর মনে হয় সে সাদা হাতের হয়ে কাজ করে। খুব সম্ভব এখানকার ইনচার্জ হবে।” ঠাণ্ডা গলায় বলল বায়রান।

সাদা হাত! নামটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্য্যপূর্ণ কারণ শব্দ দুটো শোনা মাত্র থমকে গেলো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। "কি বললে, সাদা হাত?"
"আচ্ছা! ব্যাটা তাহলে সাদা হাতের লোক। ওই নাক গলানো, গায়ে মানে না আপনে মোড়লের দল!" ঘৃণা মেশানো কণ্ঠে ঘোষণা করল সুস্ময়, ভুরু কুঁচকে গেছে তার, "বিরাট ঝামেলা হয়ে গেলো দেখছি! সাদা হাত পেছনে লেগেছে, আগের মত নির্বিঘ্নে আর কাজটা করা যাবে না মনে হয়।"
"ইয়ে মানে বাবা," ক্ষীণ, প্রায় ধরা গলায় প্রশ্ন করল সোবাহান, "এই সাদা হাত জিনিসটা কি?" তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো সুস্ময়, মূহুর্তের জন্যে মনে হলো এই বুঝি ফেটে পড়বে সে। কুঁকড়ে গেলো বেচারা ডাক্তার, কিন্তু যখন কথা বলল, শান্ত শোনাল সুস্ময়ের গলা। "বুঝেছি, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বিশদ আলাপ করা দরকার। তুমি সবাইকে ডেকে আনো, তারপর দেখছি কি করা যায়।"
মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো সোবাহান, অন্যান্য বারের মত তুই বলে সম্বোধন করেনি তাকে সুস্ময়, ব্যাপারটা অবশ্য স্বস্থির বদলে ভীতিকর বোধ হলো ডাক্তারের কাছে। দরজাটা টেনে দেবার সময় শুনতে পেলো সে, পেছনে গজ গজ করছে বেঁটে বুড়ো, "যত্তসব অপদার্থের দল!"

মিনিট দশেক পর, একই ঘরে অবস্থান করছে এখনো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, তবে একটা আরাম কেদারা নিয়ে আসা হয়েছে তার জন্যে। বেঢপ দেহ নিয়ে ঋজু যে ভঙ্গিতে তাতে বসে আছে সে, হাস্যকর দেখানোর কথা, কিন্তু তার থমথমে মুখের দিকে তাকালে অতি বড় সাহসিরও বুক কেঁপে উঠবে।

পেছেন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তরন্দিদেব, সতর্ক চোখে লক্ষ্য করছে সুস্ময়কে। সাধারণত যাদের জন্যে সে কাজ করে তারা নিজেরা তেমন ক্ষমতাশালী হয় না, কিন্তু এই বেলা ব্যতিক্রম। বায়রানকে উদ্ধার করার পর কোথায় যাবে ভেবে পাচ্ছিলনা সে, কিন্তু কয়েক মূহুর্তের জন্যে হুঁশ ফিরতে বায়রান তাকে এই বাড়ির দিকনির্দেশনা দেয়। সেই স্বল্প সময়তেই তার প্রতিকৃয়া থেকে বুঝতে পেরেছে যে খুব সম্ভব সে যতটা ভেবেছে তারচেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাধর এই লোক। বেঁটে বুড়ো যে আসলে ঠিক কি তাই এখনো বুঝে উঠতে পারছে না সে, প্রথমে ভেবেছিল ওর মতই আরেক তান্ত্রিক।
কোন বিশেষ সাধনা করে ক্ষমতা পেয়েছে – কিন্তু এখন আর অতটা নিশ্চিত না। তান্ত্রিক তো অবশ্যই, কিন্তু আরও অনেক কিছু এই লোক, কিছু একটা আছে তার ভেতরে, অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর কোন কিছু! কিন্তু ঠিক কি তা বুঝতে পারছে না তরন্দিদেব।
ঘরটায় এখন জড়ো হয়েছে জনা কয়েক অদ্ভুত চরিত্র, তাদের কারো সাথে কারো মিল নেই। সবাই এমনকি মানুষও নয়! বেশ একখান দল যা হোক! ভাবল তরন্দিদেব। সুস্ময় ভট্টাচার্য্য এবং ডমিনিক বায়রান ছাড়াও রয়েছে সোবাহান নামের লোকটা, যে কিনা সারাক্ষণই তটস্থ।

এছাড়া আরেক বেকুব মার্কা লোককে চোখে পড়ছে, দেখে মনে হয় না দুনিয়ার কিচ্ছু বোঝে ব্যাটা – খুব সম্ভব এই বাড়িটার মালিক সে।
মানুষ বলতে ওরা কয়জনই, এছাড়া দুটো বহুরূপী পিশাচ রয়েছে – চেহারা গোপন করার ব্যাপারে দুটোই বেশ চালু কিন্তু ওর মত অভিজ্ঞ তান্ত্রিকের চোখকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ না! আর আছে একটা চুড়েল। গন্ড গ্রাম আর শ্মশান ছেড়ে এই রকম ব্যস্ত শহরে কোন চুড়েলের আসার কথা জিন্দেগিতেও শোনেনি তরন্দিদেব। চুড়েলটা আবার আহত, কনুইয়ের কাছ থেকে একটা হাত হারিয়েছে। এমনকি অতিপ্রাকৃতদের পক্ষেও বেশ মারাত্মক একটা ক্ষত। তবে ওকে সবচেয়ে অবাক করেছে আরেকটা চরিত্র, একে কোনমতেই কোন ছাঁচে ফেলতে পারছে না সে। বয়স তো কম হলো না, বহু বছর ধরে সাধনা করছে, বহু ঘাটের পানি খাওয়া তান্ত্রিক তরন্দিদেব – এই অঞ্চলের অতিপ্রাকৃতের ব্যাপারে চুল চেরা জ্ঞান রাখে সে, রাখতে হয় পেশাগত কারণেই, কিন্তু দেখা তো দূরে থাক, আগে কখনো এমন কিছুর কথা কারো কাছে শোনেনি পর্যন্ত। জিনিসটার – হ্যাঁ জিনিসই বলা উচিৎ ওটাকে – সারা শরীর ছাই মাখা কাপরে মোরা! অনেকটা মমির মত দেখতে, শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে আছে! কঙ্কাল সার শুকনো দেহ, লিকলিকে, সরু কাঠির মত হাত পা! ওর মানা কেমন তা দেখার চেষ্টা করে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে তরন্দিদেব, একাধিক সত্তার উপস্থিতি আছে ওর ভেতরে, কিন্তু ঠিক কয়টা তা বোঝা যাচ্ছে না। হয় দূরের কোন দেশ থেকে বা অ্যাস্ট্রালের কোন গহীন কোণ থেকে এসেছে এই চিজ আর নাহলে অত্যন্ত বিরল কোন অতিপ্রাকৃত ওটা। এখন পর্যন্ত একটা শব্দও করেনি জিনিসটা, অন্য কেউও ঘাটাচ্ছে না তাকে। এমনকি সুস্ময় – যার তর্জন গর্জনে সবাই দিশেহারা – সেও যেন খানিকটা সমীহের নজরে দেখছে অস্বাভাবিক এই চরিত্রটাকে।
গলা খাকারি দিলো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, "বাজে কথা বলে নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে," শুরু করল সে, "আমি তোমাদের সবাইকে অনেক খুঁজে দলে নিয়েছি যাতে আমাদের উদ্দেশ্য মত কাজটা সমাধা করতে পারি। এর গুরুত্ব কতটা তা তোমরা জানো, পুরস্কার কি তাও বলেছি। সব কিছু ঠিকমত হলে যা চাইবে তাই পাবে!"
কিন্তু কাজটা আসলে কি, তা কিন্তু বলনি বুড়ো ভাম! ভাবল তরন্দিদেব। ওদিকে কথা চালিয়ে যাচ্ছে সুস্ময়, "সবকিছু ঠিকমতই আগাচ্ছিল, কিন্তু এখন ঝামেলা দেখা দিয়েছে।"
বায়রানের দিকে ইশারা করল সে, "দেখতেই পাচ্ছ, ছোটখাট কোন ঝামেলা না! বায়রানের মত লোক যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে, তাও এই দশায়, বুঝতেই পারছ আমাদের শত্রুরা বেশ ক্ষমতাশালী। ঠিক কে বা কারা আমাদের পেছনে লেগেছে তা এখনো সঠিক জানি না, তবে ধারনা করতে পারছি এসব সাদা হাতের কাজ!"
নামটা একটা মৃদু গুঞ্জনের জন্ম দিলো। দুই পিশাচের একটা ঘরঘরে গলায় বলে উঠল, "হুজুর, সাদা হাতের সাথে লড়তে হবে এমন তো কথা ছিল না।"
"চোপ!" ধমকে উঠল সুস্ময়, "কি কথা ছিল আর কি ছিল না, তা আমি বুঝব!" কড়া চোখে উপস্থিত সবার ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল সে, "তোরা সবাই হয়ত জানিস না তাই সাদা হাত কি অল্প কথায় বলছি।" আবার সম্বোধন পালটে ফেলেছে সে, লক্ষ্য করল তরন্দিদেব।

“সাদা হাত একটা ঝামেলাবাজ দল,” বলে চলল সুস্ময়, “নিজেদের না জানি কি মনে করে ওরা। কয়েকজন ক্ষমতাশালী মানা ব্যবহারকারীকে দলে ভিড়িয়ে গায়ে মানে না আপনে মোরল সেজে বসেছে! ওদের কাজ নাকি সাধারণ মানুষের জীবনে যাতে কোন অলৌকিক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা। সোজা কথায় সঙের দল, তবে ওই যে বললাম দু’চারজন আছে ওদের মাঝে যারা বেশ ক্ষমতাধর।”

সাদা হাতের নাম আগেও শুনেছে তরন্দিদেব, জানে ওদের ব্যাপারে, এবং তাই এটাও বুঝতে পারছে যে বেশ কমিয়ে বলছে সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। বাস্তবিক বহু পুরানো একটা সংঘ ওটা, সারা পৃথিবী ব্যাপী কার্যক্রম চালায়, এক এক দেশে এক এক নামে পরিচিত। এখানে সাদা হাত বলা হচ্ছে কিন্তু বিলেতে লোকে ওদের চেনে ‘হোয়াইট হ্যান্ড’ নামে। মধ্য ইউরোপে ‘ভাইজে হান্ড’ – সাদা হাতকে জার্মানে তাই বলা হয়।

পুব দেশে, মানে জাপান বা তার আসেপাশে ‘সিরো তে’ বলে ওদেরকেই বোঝানো হয়। মোদ্দা কথা স্থানীয় ভাষাতে সাদা হাত শব্দ দুটোর যা অনুবাদ দাঁড়ায় তাই ব্যবহার করে ওরা পরিচিতির জন্যে। সাদা হাতের নেটওয়ার্ক খুবই সঙ্গবদ্ধ, প্রত্যেকটা এলাকাতে একজন করে লোকাল ইনচার্জ রয়েছে ওদের এবং বেশ কিছু ফিল্ড এজেন্ট যখন যেখানে দরকার উপস্থিত হয়। তবে ঠিক কোথাথেকে মূল কার্যকলাপ চালানো হয় সযত্নে গোপন রেখেছে ওরা। সাধারণ কেউ ওদের হেডকোয়াটারের হদিশ জানে না।

সুস্ময় অবশ্য অতশত ব্যাখ্যার ধার দিয়ে গেলো না, “ওরা কোন সমস্যা হত না, কিন্তু আমাদের কাজের স্বার্থে গোপনীয়তা খুবই জরুরী আর বড় কোন গন্ডগোল লাগলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। তাই এখন থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে আমাদের। বোঝা গেছে?”

কেউ কোন কথা বলল না, তবে মৌনতাটাকে সম্মতির লক্ষণ বলেই ধরে নিলো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য। “আচ্ছা, এখন কার কি কাজ বলছি, সবাই মন দিয়ে শোন! আগের বলিকে দিয়ে কাজ তো হয়ইনি, তার ওপর জেগে গেছে সে। ওকে মেরে ফেলতে হবে।

কিন্তু তারও আগে নতুন বলি যোগার করা দরকার। আর যে ব্যাটারা ঝামেলা পাকাচ্ছে ওদেরকে শেষ করাটাও জরুরী হয়ে পড়েছে। সাদা হাত যদি একবার আমাদের মূল কাজের খবর পায় তাহলে বিরাট ঝামেলা হবে।”

“কয়েকবারই তো লোক পাঠালেন ওদের মারতে, কিন্তু লাভ তো কিছু হলোই না, উলটো গোটা ব্যাপারটা আরও পেঁচিয়ে ফেলেছেন!” কন্ঠটা এতই অমানুষিক যে এমনকি তরন্দিদেবেরও গা শিরশির করে উঠল। কথাগুলো বলছে সেই অদ্ভুত কাপড় পেঁচানো জিনিসটা।

থমকে গেলো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, ইতস্তত করল একটা মূহুর্ত, “আপনি ঠিকই বলেছেন যংকসুর, কিন্তু এবার আর কাউকে পাঠাচ্ছি না; বরং টোপ ফেলব যাতে ওরা নিজেরাই এসে আমাদের হাতে ধরা দেয়।

উনিশ

কায়েস যা ভেবেছিল সে তুলনায় স্বভাবিক ভাবেই ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করল রাশেদুন, তবে তার মানে এই নয় যে ব্যাপারটা ওর জন্যে সহজ হলো। "দুনিয়াতে আমার আর কেউ রইল না, ইন্সপেক্টর সাহেব" বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ছেলেটা।

প্রিয়জন হারানোর বেদনা কি কায়েস জানে, বিশেষ করে যদি তা অপঘাতে হয়ে থাকে। আর এই কেসটা তো অপঘাতের একেবারে সর্বোচ্চ উদাহরণ! মনে মনে অবলালের গুষ্ঠি উদ্ধার করল সে – দুঃসংবাদ জানানোর অপ্রিয় কাজটা এভাবে ওর একার ঘাড়ে চাপিয়ে কেটে পড়েছে বলে। "আমাকে কায়েস বলেই ডেকো," নরম গলায় বলল সে, "আসলে এই অবস্থাতে শান্তনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই, ভাই।" কাঠখোট্টা মানুষ বলে পরিচিতি আছে কায়েসের কিন্তু এই মূহুর্তে নিজের প্রতিকৃয়া দেখে নিজেই বিস্মিত বোধ করল সে।
"কায়েস ভাই," অস্বাভাবিক দৃঢ় শোনাল রাশেদুনের গলা, "কি ঘটেছে আমাকে খুলে বলুন; আর শাহেদের খুনের জন্যে যারা দায়ী তাদের উচিৎ শাস্তি যেন হয় তা নিশ্চিত করবেন, এটা ছোট ভাই হিসেবে আপনার কাছে আমার অনুরোধ!" কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলে চোখ মোছার চেষ্টা করল সে, এখনো অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো ঠিক মত নাড়াতে পারছে না।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল কায়েস, "কি আর বলব ভাই, আসলে কি যে হচ্ছে তা আমি নিজেও কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।" আঙ্গুল তুলে ঘরের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ইঙ্গিত করল সে, "এখানে যা ঘটেছে তা তো দেখেছই, এরপর নিশ্চয়ই তোমার আর বুঝতে বাকি নেই যে প্রচলিত নিয়মে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা সম্বব না। আর গতকাল থেকে এতকিছু ঘটতে দেখেছি যে নিজেকে পাগল না ভাবাটা ক্রমশ অসম্ভব মনে হচ্ছে।"
এমন সময় বয়স্ক একজন নার্স এসে বললেন যে রোগীকে অন্য কেবিনে সরিয়ে নিতে হবে।
"সিস্টার," বাধা দিল রাশেদুন, "আমাকে রিলিজ নিয়ে দিন।" কথাটা এতই আকস্মিক ছিল যে ঝট করে একই সাথে ওর দিকে ঘুরল কায়েস আর নার্স।
"আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? মাত্র না জ্ঞান ফিরল? রিলিজ তো বহু পরের কথা, স্যারেরা আগে পরীক্ষা করে দেখবেন আই.সি.ইউ.তে নিতে হবে নাকি!"
"কায়েস ভাই," ওকে তাজ্জব করে দিয়ে হঠাৎ উঠে বসল রাশেদুন।
"হায় আল্লাহ্! কি করছেন..." হাহা করে উঠলেন নার্স কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রাশেদুনের।
"কায়েস ভাই," আবার বলল সে, "একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। আপনিই তো বললেন যে পরিস্থিতি সাধারণ নিয়মে বিচার করা যাবে না, তাই আমাদের পক্ষেও সাধারণ ভাবে চলা সম্ভব না, নাকি?"
একই সঙ্গে সন্দেহ আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকালো কায়েস। ঠিকমত বসতে পর্যন্ত পারছে না বেচারা, একটু আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখের সামনে দেখেছে নরক

গুলজার, তারওপর আবার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ হজম করতে হয়েছে। অথচ এত কিছুর পরও ওর গলায় দৃঢ় সংকল্পের ছোঁয়া, বেশ বোঝা যাচ্ছে অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারনা নেই মনে। কিন্তু এতটা মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ কি? প্রতিশোধ স্পৃহা? সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কায়েস। "সিসটার," বলল সে, "আপনি দশ মিনিট পরে আসুন, আমি দেখছি এদিকটা।"
কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিলেন নার্স কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিলো কায়েস, "এটা পুলিশি ব্যাপার!" পকেট থেকে আইডি কার্ডটা বের করে মহিলার নাকের নিচে ধরল সে।
খানিকক্ষণ ইতস্তত করে মাথা ঝাকালেন নার্স, "আচ্ছা ঠিক দশ মিনিট," রাশেদুনের দিকে ফিরলেন তিনি, "আর আপনি শুয়ে পড়ুন, শরীরের এই অবস্থাতে বসে থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। আর ইন্সপেক্টর সাহেব," আবার কায়েসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "পুলিশের ব্যাপার হোক আর যাই হোক, মনে রাখবেন, রোগীর ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু বরদাশত করা হবে না!" বেরিয়ে গেলেন তিনি।
পকেট থেকে মোবাইল বের করল কায়েস, ডায়াল করতে করতে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালো রাশেদুনের দিকে, আবার আধশোয়া হয়ে পড়েছে ছেলেটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন ওর পক্ষে চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু...
"ওসি, মোহাম্মদপুর থানা!"
"হ্যালো, রবিউল ভাই?"
"কায়েস! কোথায় তুমি? একটু আগে যে গোলাগুলি হলো, তোমার কেসের সাথে কি কোন সম্পর্ক আছে? তুমি ঠিক আছো তো? অবলাল কোন ঝামেলা করেনি তো?" এক নিশ্বাসে যে ক'টা পারা যায় প্রশ্ন করে গেলেন রবিউল আলম।
"আরে আস্তে ভাই, আস্তে!" ককিয়ে উঠে সেটটা কান থেকে সামান্য সরিয়ে নিলো কায়েস, "হ্যাঁ, আমি ওই গণ্ডগোলের সীনেই আছি – আমার কেসেরই ঝামেলা এটা। আর না অবলাল সমস্যা করেনি, ও না থাকলেই বরং বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেতে পারত!" হাঁফ ছাড়ল সে, "কিন্তু এখন আগে আমার কথা শুনুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওই যে ছেলেটা কোমাতে ছিল, রাশেদুন নাম, ওকে রিলিজ করিয়ে দিতে বলুন। ডাক্তাররা মানা করলে বলবেন এটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিষয়। না না, কেন তা জানতে চেয়েন না! আমি পরে আপনাকে খুলে বলব। রাখলাম!"
রবিউলকে আর কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিলো কায়েস। তারপর ফিরল রাশেদুনের দিকে, "দাঁড়াতে পারবে তুমি?"
"মনে হয়," দুর্বল ভঙ্গিতে বলল রাশেদুন, কিন্তু বসার চেষ্টা করতেই ওকে কতটা বেগ পেতে হলো, দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো কায়েস। গাড়ি পর্যন্ত একে নেব কি করে? সমস্যাটার কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছেনা সে।
এমন সময় আধ ভাঙ্গা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল অবলাল, পেছনে সেই ছেলেটা। "কায়েস, এ হচ্ছে সাদিব, আমার মামাতো ভাই!" পরিচয় করিয়ে দেবার ঢঙে বলল সে।
অবলালের মত কারো হঠাৎ একজন আত্মীয়ের উদয় হওয়াটা অত্যন্ত বেক্ষাপ্পা একটা ব্যাপার, কিন্তু পরিচয় পর্বে কায়েস যতটা অবাক হলো তার চেয়েও বেশি চমকে গেলো ছেলেটা। চোয়াল

ঝুলে পড়ল ওর, তবে বেশ চালু আছে ছোকরা! দ্রুত সামলে উঠে কর্মর্দনের জন্যে হাত বড়িয়ে দিলো কায়েসের দিকে।
"আমি কায়েস," ডান হাত অকেজ তাই বেকায়দা ভঙ্গিতে বাম হাত দিয়ে হাতটা ধরল কায়েস এবং সাথে সাথেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর, বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত অনেকটা তবে অত জোরাল না। অন্য সময় হলে এর কারণ চিন্তা করতে বসে যেত সে, কিন্তু এখন আরও জরুরী অনেক কাজ আছে। "অবলাল, একে নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।" ইশারায় রাশেদুনকে দেখাল সে, "আবার হামলা আসতে পারে তাছাড়া যা বুঝতে পারছি," আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে যোগ করল, "আমারা এখানে রেখে গেলে নিজেই পালানোর চেষ্টা করবে ও, প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে বেচারা!"
বাস্তবিকই তাই! কায়েসের পেশাই হচ্ছে মানুষকে জেরা করা, ওকে ফাঁকি দিতে পারেনি রাশেদুন, খুব সহজেই ছেলেটার মনের কথা পড়ে ফেলেছে কায়েস। এক মূহুর্ত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল অবলাল, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো। "সাদিব তুই নিচে গিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দে, আমরা আসছি।" ও বেরিয়ে যেতে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অবলাল। "রবিউল ভাইকে বলেছি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে, কিন্তু আমদের আগেভাগেই কেটে পড়া উচিৎ হবে কারণ বলা যায় না, ডাক্তাররা আটকে দিতে পারে।"
উত্তর দিলো না অবলাল, বরং উঠে বসার চেষ্টারত রাশেদুনেকে ঠেলে আবার শুইয়ে দিলো সে, তারপর মা যেমন অবলীলাক্রমে ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নেয় সেই ভঙ্গিতে পাঁজাকোলা করে খাট থেকে তুলে নিলো ওকে। কায়েসের দিকে ফিরে বলল, "চল!"
এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল কায়েস। যতই চেষ্টা করিনা কেন, এই লোককে বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে! দ্রুত বেরিয়ে এলো ওরা, গেটের কাছে তখনো যথেষ্ট ভিড় রয়েছে। অবলাল এগিয়ে যেতে কোন প্রশ্ন না করেই ওকে পথ ছেড়ে দিলো সবাই। গাড়ির কাছে এসে কায়েসকে পেছনের দরজাটা খুলতে বলল অবলাল, তারপর রাশেদুনকে ভেতরে বসিয়ে দিয়ে সাদিবের দিকে ফিরল, "তোরা এক নম্বরে চলে যা, আমার জন্যে অপেক্ষা করিস। আর হ্যাঁ, আমাকে একটা সেটা দিয়ে যা, যোগাযোগ করতে পারবি তাহলে।"
"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" জানতে চাইল সাদিব।
"তুই জানিস কোথায়!"

ডেস্কের পেছনে বসে ঘামছেন রবিউল আলম - ওসি মোহম্মদপুর থানা। ঘটনার শুরু থেকেই কেসটা তাঁর মোটেও সুবিধার মনে হয়নি, কাল রাতে হাসপাতালের ঘটনা আর ভোরে কায়েসের রিপোর্ট এবং সবশেষে বর্তমান পরিস্থিতি তাঁকে পুরো নাজেহাল করে ছেড়েছে। একটু আগে ফোন করে রাশেদুনের রিলিজের বিষয়টা নিস্পত্তি করেছেন তিনি, ডাক্তাররা বিরক্ত হলেও উচ্চবাচ্চ করেনি, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা এমনি যে পুলিশের ফরমায়েস নিয়ে কেউ সাধারণত প্রশ্ন তোলে না, অন্ততপক্ষে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক কোন স্বার্থ জড়িত না থাকলে।

কায়েসকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন রবিউল, ওর যোগ্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই তাঁর মনে, কিন্তু অতিপ্রাকৃত সমস্যার যে চেহারা কয়েক বছর আগে দেখেছেন তা তাঁর মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে দিয়েছে। আর এবারের কেসটা আরও অনেক বেশি ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে, কায়েসও সেরকমই আভাষ দিয়েছে। আর ওই অবলাল লোকটাকে ঠিক সহজ ভাবে নিতে পারেন না তিনি। জানেন কায়েসের কথাই ঠিক, ওই লোক জনসাধারণের কোন ক্ষতি করে না, বরং উপকারেই আসে কিন্তু তবু; ওই রকম বিপজ্জনক একটা চরিত্রকে বিশ্বাস করতে বাধে। আবার একথাও ঠিক যে এধরনের সমস্যার মুখে ওই লোকই একমাত্র ভরসা। আর এই ব্যাপারটাই মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল ফোন। এমনিতে ধরতে একটু সময় নেন কিন্তু এখন বিন্দু মাত্র দেরী না করে ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। "হ্যালো!"
ওপাশে কথা শুরু হতেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেলো তাঁর, নিরবে শুনে গেলেন। শেষে, "আচ্ছা আমি দেখছি" বলে নামিয়ে রাখলেন ফোনটা, কুঁচকে গেছে ভুরু জোড়া। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে দুই হাতের তালু ঘষলেন তিনি কিছুক্ষণ, তারপর আবার তুলে নিলেন রিসিভার। ডায়াল করে অপক্ষায় রইলেন উত্তরের।

"ইন্সপেক্টর কায়েস বলছি," দুইবার রিং হবার পরই অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেলো।
"কায়েস, তুমি এখন কোথায়?" কন্ঠের উত্তেজনা চাপা দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন রবিউল আলম।
"আমি একটু ঝামেলায় আছি রবিউল ভাই, রাতে রিপোর্ট করব। কেন, নতুন কিছু কি ঘটেছে?"
"হ্যাঁ, মাত্র একটা ফোন পেলাম," ষড়যন্ত্রীদের মত গলা নামিয়ে বললেন তিনি, "ওই যে গাড়িটা থেকে ঘটনার সূত্রপাত, মনে আছে?"
"কি ভাবেন আপনি আমাকে?" কায়েসের কন্ঠে বিরক্তি, "আপনার মত গাঁজায় দম দিয়ে চলি নাকি যে ভুলে যাব?"

টিটকারিটা গায়ে মাখলেন না রবিউল, "যে লোক গাড়িটা থানায় পৌছে দিয়েছে সে ফোন করেছিল। বলল যে গাড়িতে নাকি অদ্ভুত একটা জিনিস ছিল, যেটা সে সাথে করে নিয়ে গেছে। আমাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়নি, শুধু বলল তাঁর পরিচিত একলোক আজ বিকেলের ঢাকায় ল্যান্ড করবে এবং সে নাকি আমাদেরকে ওই জিনিসটার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য দিতে পারবে।"
"ওই লোকের নাম ঠিকানা রেখেছেন?" কায়েসও এখন বেশ উত্তজিত।
"নাম বলেছে নাজিম, আর এও বলেছে যে সন্ধ্যার পর গুলশানে একটা রেস্তরাঁয় দেখা করতে। কথা শুনে মনে হলো যে ওই জিনিসটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কেসে হয়ত কাজে লাগতে পারে।"

“তা তো পারেই, আচ্ছা আমি সন্ধ্যার পর জায়গা মত চলে যাব, আপনিও এসে পরেন।”
এক মূহুর্ত ইতস্তত করলেন রবিউল, “ইয়ে কায়েস, তোমার ওই অবলাল লোকটাকেও নিয়ে এসো, কোন বিপদ আপদ দেখা দিলে কাজে আসবে।”
“সেটা আমাকে বলতে হবে না, আপনি সাবধানে এসেন। আমি বিকেলে ফোন করে বিস্তারিত জেনে নেব, এখন একটু ব্যস্ত, ছাড়ছি।” কেটে গেলো লাইন।
“কোন সমস্যা স্যার?” চমকে মুখ তুলে তাকালেন রবিউল, তারপর কাঁপা একটা শ্বাস ছেড়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন ক্রেডেলে। কোন ফাঁকে যেন কামরায় এসে ঢুকেছে শৌমিক ভট্টাচার্য্য, তরুণ এই ইন্সপেক্টর এই মূহুর্তে সেকেন্ড অফিসারের দায়িত্ব পালন করছে।
“ওহ তুমি! না কোন সমস্যা না। ওই একটা কেস নিয়ে আলাপ করছিলাম, তা কোন দরকার?”
এই বিশেষ কেসটার ব্যাপারে আলোচনা করার ইচ্ছে নেই তাই আগ বাড়িয়ে কিছু বললেন না রবিউল। অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন, এটা জানাজানি হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি তো পড়বেই, পাবনার টিকেটও জুটে যেতে পারে!”
“না স্যার, এমনিই। শুধু কয়েকটা ফাইল জমে গেছে, একটু যদি সই করে দিতেন?”
“নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!” কি কেস সে প্রসঙ্গ উঠল না বলে একটা স্বস্থির নিশ্বাস গোপন করলেন তিনি। তারপর ঝুঁকে পড়লেন শৌমিকের এগিয়ে দেয়া ফাইলগুলির ওপর। মুখ তুলে তাকালে লক্ষ্য করতেন যে তরুণ ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের কোণে ফুটেছে এক চিলতে নিষ্ঠুর হাসি, কিন্তু কাজে ডুবে যাওয়ায় তা তাঁর চোখ এড়িয়ে গেলো।

বিশ

জ্ঞান ফেরার অনুভূতিটা বরাবরই নতুন, অনেকটা ঘুম থেকে জাগার মত, কিন্তু তীব্রতর। আর তার সাথে যদি যোগ হয় বহুবার দেখা একটা স্বপ্ন, তাহলে ব্যাপারটা ঠিক সুখকর থাকে না। সেই বুড়ো, সেই ছোট ছোট চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সেই একই ঢিমেতেতলা ঢঙে বলা কথা – বিষয়বস্তুও এক, 'রক্ত, সঠিক রক্ত, সময়ের মূল্য!' – একই হাবিজাবি। চোখ খুলল অরণী, এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভয়ঙ্কর লোক ওই ডমিনিক বায়রান, রিপোর্টে ভুল আছে, সবুজ স্তরের কারো পক্ষে ওই রকম শক্তিশালী মানা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ফিল্ড এজেন্ট হিসেবে বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে অরণীর, তা থেকে আন্দাজ করতে পারছে নিদেন পক্ষে কালো হবে ওই যাদুকরের থ্রেট লেভেল। কি করে বেঁচে গেছে ভেবে পেলো না ও, নিশ্চয়ই কেউ সময় মত হস্তক্ষেপ করেছিল। কিন্তু কে?

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়েই উত্তরটা পেয়ে গেলো অরণী, অবশ্য আগেই অনুমান করতে পেরেছিল কিন্তু মেনে নিতে চায়নি। শত হলেও ওই লোককে মনে প্রাণে ঘৃণা করে ও। ওই তো বসে আছে সে, ঋজু ভঙ্গিতে, পিঠ সোজা, ঈষৎ কুঁচকে আছে ভ্রু জোড়া। হাতে একটা বই, গভীর মনযোগের সাথে পড়ছে ওটা।

বারো বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু খুব একটা বদলায়নি সে, একটু কি মোটা হয়েছে? না ঠিক মোটা না, তবে স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে বলা যায়, আগের চাইতে পেশিবহুল দেখাচ্ছে। মুখে একটা কঠোর ভাব এসেছে আর চোখের কোণে সুক্ষ দুয়েকটা ভাজ – ব্যস। এর বেশি কিছু না! একই সঙ্গে নিজের কথা ভাবতে গিয়ে বেশ একটা ধাক্কা খেলো অরণী। বারো বছর আগে ও ছিল ক্ষীণ দেহী এক চপলা কিশোরী, পুরুষের পোশাক পড়লে যাকে আর মেয়ে বলে চেনার যো থাকত না। আর এখন? কারণ ছাড়াই গাল লাল হয়ে গেলো ওর। তবে পরক্ষণেই সামলে নিলো, হ্যাঁ এটা নিশ্চিত যে ওর জীবন বাঁচিয়েছে সে, আবার! কততম বার? কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কিচ্ছু না! সে যা করেছে তা ভুলে যাওয়া অন্য কারো পক্ষে হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু অরণী অত মহৎ না। আর তাও যদি সে ক্ষমা চাইত তবে একটা কথা ছিল! আরও লাল হয়ে গেলো অরণী, তবে এবার আর লজ্জায় না, বরং রাগে।

হঠাৎ হাতের বইটা বন্ধ করল সে, তারপর ফিরে তাকাল অরণীর বিছানাটার দিকে। চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে অরণী, তবে পাতা দুটো সামান্য ফাঁক করে তার মুখটা দেখতে ভুলল না। এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে চোখ দুটো। কিন্তু সে চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। নাকি যাচ্ছে, কিন্তু মানতে পারছে ও? মনে হচ্ছে গভীর বিষাদ আর পবিত্র প্রেমময় তার দৃষ্টি, কিন্তু তা কি করে হয়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা, তারপর আবার মেলে ধরল বইটা। চার্লস ডিকেন্সের গ্রেট এক্সপেক্টেশনস, প্রচ্ছদটা পড়তে পারছে এখন অরণী। এই বই সে আগেও পড়েছে – জানে ও, ডিকেন্স তার প্রিয় লেখকদের একজন। অরণীকে এক রকম জোর করেই অ্যা টেল অফ টু সিটিজ আর ব্লিক হাউজ পড়িয়েছিল সে। ওদের পরিচয়ের শুরুতে। এরপর অবশ্য আর বলতে হয়নি, ডিকেন্সের অন্যান্য বইগুলো নিজেই গিলেছে অরণী। আসলেই অসাধারণ লিখত লোকটা। অনেক স্মৃতি উঠে আসতে চাচ্ছে মনের গহীন থেকে, বেশি ভাগই আনন্দময়। কিন্তু একটা কালো ছায়াই যে সব সোনালী রশ্মিকে ঢেকে দিতে যথেষ্ট! সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অরণী, যতদ্রুত সম্ভব এখান থেকে সরে পড়া দরকার। তার উপস্তিতি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না ও। তাই গুঙিয়ে উঠল, যেন মাত্র জ্ঞান ফিরেছে।

ঝট করে ঘুরে তাকালো অবলাল, বিছানাটার পাশে ঠায় বসে আছে ও প্রায় দু'ঘন্টা হতে চলল। কায়েসদের রওনা করিয়ে দিয়েই ফিরে এসেছিল ও ক্লিনিকটাতে, ডাক্তারদের সাথে কথা বলে জানতে পারে যে শারীরিক ভাবে তেমন কোন ক্ষতি হয়নি অরণীর। ঘটেনি অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, ভাঙ্গেনি কোন হাড়; শুধু প্রচণ্ড চাপের ফলে মাংসপেশি থেঁতলে গেছে কয়েক জায়গায়।

এমনিতে রোগীর পাশে এইভাবে বসে থাকার নিয়ম নেই, কিন্তু নিয়মকে কি করে পাশ কাটাতে হয় তা ভালোই জানা আছে অবলালের। ও অপেক্ষায় ছিল কখন অরণীর জ্ঞান ফেরে, একবার অবশ্য ভেবেছিল অজ্ঞান অবস্থাতেই সরিয়ে নেবে কিন্তু পরে মত বদল করে। এটা ঠিক যে আবারও হামলা হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু অরণীর সাথে সম্পর্কটা আরও তিক্ত করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই ওর।

শীতল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, বুকটা টনটন করে উঠল অবলালের। একটা সময় ছিল যখন ওই চোখ দুটো অন্য দৃষ্টিতে দেখত ওকে, তার মাঝে থাকত মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশ্রণ! সে সবই এখন ধুসর অতীত! এখন অরণীর চোখে নিরলিপ্ততা আর ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেলো না ও।
"আমি কোথায়?" নিরবতা ভাঙ্গল অরণী।
"হাসপাতালে, যেখানে ঝামেলায় পড়েছিলে ওই বিল্ডিঙয়েরই অন্য পাশে।" একটু বিরতি দিলো অবলাল, "কেমন আছো তুমি, অরণী?"
প্রশ্নটা যেন শোনেইনি, অন্য কথায় চলে গেলো মেয়েটা, "মনে হচ্ছে আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। আমাকে যতদ্রুত সম্ভব হেড অফিসে যোগাযোগ করতে হবে, আপনার সাথে ফোন আছে?"

আপনি! এতটা আশা করেনি অবলাল। হ্যাঁ, এটা ও খুব ভালো করেই জানে যে ওকে অপছন্দ বা সোজা কথায় ঘৃণা করার সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে অরণীর, কিন্তু তাই বলে সম্বোধন পালটে ফেলার কি দরকার তা ওর মাথায় ঢুকল না। অবশ্য আপাতত এনিয়ে কথা বলার ইচ্ছেও নেই। সত্যি বলতে কি, অতীত নিয়ে অরণীর সাথে কথা বলতে বেশ ভয় পায় ও এবং এটা খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার; কারণ অবলাল ভয় করে এমন জিনিস নেই বললেই চলে। গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে একটু আগে সাদিবের কাছ থেকে নেয়া ফোনটা অরণীর দিকে এগিয়ে দিলো ও। মনে মনে অবশ্য খুব এক চোট হেসে নিচ্ছে, কারণ ফোন করলে পর অরণীকে কি বলা হবে তা বেশ জানা আছে ওর। বস্তুত ও নিজেই আগে থেকে হেড অফিসে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে ওপাশের কথা শুনতে শুনতে চেহারা থমথমে হয়ে গেলো অরণীর, "প্লিজ স্যার, আই আস্ক ইউ টু রিকনসিডার, আই ক্যান নট পসিবলি ওয়ার্ক উইথ হিম, লেট অ্যালোন আন্ডার হিম!" বলল সে। জবাবে ওপাশ থেকে কি বলা হচ্ছে আন্দাজ করে অনেক কষ্টে হাসি চাপল অবলাল।
"ওকে স্যার, আন্ডারস্টুড!" লাইন কেটে দিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে ফোনটা অবলালের দিকে এগিয়ে দিলো অরণী, "আমাকে আপনার হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এবং বলা হয়েছে আপনার সব ফরমায়েস যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।" তার গলায় ব্যঙ্গের সুর। "তা কি করতে হবে এখন?" তিক্ত কণ্ঠে যোগ করল সে।
উত্তরে মৃদু হাসল শুধু অবলাল, "তুমি হাঁটতে পারবে?"

###

সাদিব 'এক নম্বর' নামের যে জায়গাটাতে ওদেরকে নিয়ে এসেছে সেটা রামপুরা এলাকার একটা পুরানো ধাঁচের তেতলা বাড়ি। তবে গ্যারেজের পেছেনের একটা দরজা দিয়ে মাটির নিচে আরেকটা ফ্লোরে যাওয়া যায়। বেশ কায়দা করে বানানো, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে এখানে এত বড় একটা পরিসর রয়েছে। হলিউড সিনেমাতে সেফ হাউজগুলো যেমন হয় অনেকটা তেমন। চিকিৎসা এবং যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন নানা ধরনের অত্যাআধুনিক সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর আছে বেশ কিছু অস্ত্র। অবলালের সাথে সাধারণত যেখানে দেখা করে কায়েস, সেই জায়গাটাও অনেকটা এমনই তবে এত বড় নয়। সাদিবের কাছ থেকে জানতে পারল ওটা নাকি 'দুই নম্বর'।
রাশেদুনকে গাড়ি থেকে এখানে আনা অবশ্য সহজ হয়নি, কায়েসের নিজের হাত ভাঙ্গা আর সাদিবের একার পক্ষে ওকে বয়ে আনা সম্ভব না। সবার গায়ে তো আর অবলালের মত মোষের জোর নেই!

তবে সুখের বিষয়, বেশ সামলে নিয়েছে রাশেদুন, তাই কোনমতে ধরাধরি করে ওকে একটা বিছানা পর্যন্ত নেয়া গেল। এরপর খাবার তৈরি করতে লাগোয়া ছোট্ট রান্নাঘরে চলে গেলো সাদিব। কায়েস ফোন করল রবিউল আলমকে। কোথায় দেখা করতে হবে এবং ঠিক কখন তা জেনে নেবার পর আজকের ঘটনা ও নিজে যতটুকু জানে এবং রাশেদুনের বক্তব্য সংক্ষেপে জানাল তাঁকে। ফোনটা কেবল ছেড়েছে এই সময় ফিরে এলো সাদিব, "চলুন কায়েস ভাই, খেয়ে নেয়া যাক," বিছানায় শোয়া রাশেদুনের দিকে একটা মগ এগিয়ে দিতে দিতে বলল ছেলেটা।

"এটা কি?" দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল রাশেদুন।

"সুপ! খেয়ে নিন, শক্তি পাবেন। ভারী কিছু মনে হয় এখনই খাওয়া ঠিক হবে না আপনার।"

কাঁপা হাতে মগটা নিলো রাশেদুন, "ভারী কিছু এখন আমাকে খাওয়াতে পারবেনও না! খাওয়ার কথা ভাবলেই বমি আসছে।"

"আচ্ছা আপনি থাকুন তাহলে, আমরা আসছি, কোন দরকার হলে ডাকবেন।"

রান্নাঘরটা অনেকটা বিদেশি কায়দায় সাজানো – একপাশে টেবিল রয়েছে, ওখানেই খেতে বসল ওরা। আয়োজন সাধারণ, খিচুড়ি আর চিকেন ফ্রাই। খুব সম্ভব ফ্রিজে ছিল, সাদিব শুধু গরম করেছে।

"আচ্ছা, অবলাল কি আসলেই তোমার ভাই?" খেতে খেতে প্রশ্ন করল কায়েস, ওর কাছে ছেলেটাকে আলাপি মনে হয়েছে, এই সুযোগে যদি রহস্যপুরুষের ব্যাপারে কিছু জানা যায়!

"হ্যাঁ, ও আমার বাবার বড় বোনের ছেলে, মানে ফুপাত ভাই।" বলল সাদিব, "তবে এই কথা এমনিতে কারো কাছে বলে না, এমনকি জনসম্মুখে আমাদের দেখা করাও নিষেধ। সেজন্যেই যখন আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো এত অবাক হয়েছিলাম।"

"আর আমি অবাক হয়েছিলাম ওর কোন আত্মীয় আছে তা দেখে," বলল কায়েস, "সত্যি বলতে কি, অবলালের যে চাল চলন ওকে ঠিক, ইয়ে মানে অন্যভাবে নিয়ো না কথাটা, রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয় না আর কি!"

হাসল সাদিব, "তা খুব একটা ভুল বলেননি মনে হয়। আমারা এতদিন ধরে একসাথে কাজ করছি, তারওপর ছোট বেলা থেকে চিনি, কিন্তু এখনও প্রায় সময়ই ওর কাজকর্ম ঠিক হজম করতে পারিনা!"

"আচ্ছা ঠিক কি কাজ কর তোমরা?" কৌতুহল দেখাল কায়েস, "মানে আমি জানি অবলাল অতিপ্রাকৃত জগতের পুলিশ টাইপ কিছু কিন্তু আরেকটু বিস্তারিত জানতে পারলে ভালো হত।"

"সেটা আসলে রু... ইয়ে মানে অবলাল ভাইয়ের কাছ থেকে জানলেই ভাল হয়, আমাকে কিছু বলতে বারণ করেছে কিনা।" ভদ্রভাবে কিন্তু সরাসরি না করে দিলো সাদিব।

মনে মনে ছোকরার প্রশংসা করতে বাধ্য হলো কায়েস, এমনিতে এইভাবে কথা শুরু করলে লোকে সাধারণত এড়িয়ে যেতে পারে না। "বুঝলাম, আচ্ছা ওর সাথে কথা বলা দরকার, সন্ধ্যায় একলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে তা তো শুনেছই? ওখানে হয়ত ঝামেলা হতে

পারে। পুরোদস্তুর পুলিশি ভাবে কিছু করার মত কোন তথ্য প্রমাণ হাতে নেই তাই নিজেদেরই প্রস্তুত থাকা দরকার। তাছাড়া অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপারে এক প্লাটুন সৈন্যের চেয়েও অবলাল বেশি নির্ভরযোগ্য।"
"দাঁড়ান, নাম্বারটা দিচ্ছি," বলে পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করল সাদিব।

###

সন্ধ্যা সাতটা, গুলশান এলাকার একটা অভিজাত রেস্তরাঁর সামনে অপেক্ষা করছে কায়েস। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, জলের ধারা নামছে ওর বর্ষাতি বেয়ে, বিরক্তিকর একটা অবস্থা। অবলাল জানিয়েছে ও হাজির থাকবে, তবে সামনে নয় এবং ওকে খোঁজার দরকার নেই। তাই রবিউল আলমকে পেলেই ভেতরে ঢুকবে কায়েস।

সাড়ে সাতটায় নাজিম নামের ওই লোকের আসার কথা তার সঙ্গিকে নিয়ে। নিজেরা আগে ভাগে একটু আলাপ সেড়ে নিতে চাচ্ছে কায়েস, তাই রবিউলকে বলেছে সাতটার সময় উপস্থিত থাকতে।

হুঁশ করে এসে ওর সামনে থামল একটা ট্যাক্সি, পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রবিউল আলম। সাদা পোশাকে আছেন, তাঁকে দেখতে পুলিশের বদলে একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ব্যবসায়ীর মত লাগছে। ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এদিক সেদিক তাকালেন ওসি সাহেব, তারপর গলা নামিয়ে কায়েসকে বললেন, "আমাদের বডিগার্ড কই?"
হেসে ফেলল কায়েস, "আছে আসেপাশেই, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।"
"আচ্ছা চল।"
"স্যার, আমার ভাড়া?" ডেকে উঠল ট্যাক্সিওয়ালা।
চমকে গেলেন রবিউল, ফিরে তাকালেন হতবিহব্বল দৃষ্টিতে। তারপর পকেটে হাত দিলেন মানিব্যাগ বের করতে।
হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কায়েস, "এত নার্ভাস হলে চলে? পুলিশে চাকরি করেন, একটা ভাবসাব তো থাকবে!"

একটু পরে প্রবেশ করল ওরা রেস্তরাঁটাতে। দামী জায়গা, এদের হাচভাবই আলাদা। এককোণে আগেই দুটো টেবিল রিজার্ভ করে রেখেছেন রবিউল।
একটু আলো কম ওইদিকটাতে, মানুষজনের কৌতুহলি দৃষ্টি থেকে কিছুটা আড়াল পেতে ইচ্ছা করেই অমনটা বেছে নিয়েছেন। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে গা এলিয়ে দিলেন তিনি, কায়েসও বসল অন্য একটাতে।

“তোমার হাতের কি অবস্থা?” ওর সিলিঙে ঝোলানো বাহুর দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলেন রবিউল।
“ভালোর দিকে, মনে হয় কাল বা পরশু থেকে ব্যবহার করতে পারব, তবে পুরোপুরি সাড়তে সপ্তাহ খানেক লেগে যাবে।”

গত দুইদিনের ঘটনাবলি নিয়ে আলাপ করল ওরা, ঠিক কি কি ঘটে গেছে রবিউলকে তা বিস্তারিত ভেঙ্গে বলল কায়েস। শুনতে শুনতে তাঁর পাংশু মুখখানা আরও ছোট হয়ে এলো, বার কয়েক অবিশ্বাসের ঢঙে মাথাও নাড়লেন। কায়েস এদিকে খেয়াল করছে যে ওদের থেকে টেবিল তিনেক তফাতে বসে আছে অবলাল, একটা চ্যাপ্টা কানাওয়ালা টুপির নিচে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে ওর চেহারা। একই টেবিলে ওর মুখোমুখি বসে আছে একটা মেয়ে, কিন্তু মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে রাখায় তার চেহারাও বোঝা যাচ্ছে না। একটু অবাক হলেও কিছু বলেনি কায়েস, অবলালের বিবেচনার ওপর ওর আস্থা আছে।

দামী জায়গা বলেই বোধহয় ভিড় কম, হাতে গোনা কয়েকজন খদ্দের আনাগোনা করছে। খালি পড়ে আছে বেশিরভাগ টেবিলই। অবশ্য এর জন্যে আবহাওয়াও দায়ী হয়ে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য ধরে এলেও প্রায় সারাদিনই ঝড়ে চলেছে বৃষ্টি। কখনো মুসুলধারায় আবার কখনো বা গুড়ি গুড়ি।

ঠিক সাড়ে সাতটায় ঝটকা দিয়ে খুলে গেলো রেস্তরাঁর দরজাটা। গটমট করে ভেতরে ঢুকল দু’জন লোক। একজনকে দেখে সাধারণ বাঙালি যুবকই মনে হয়, একটু বেঁটে, গাট্টাগোট্টা দেহ। বেমানান গোফ রয়েছে, পরনে কমপ্লিট সুট। অন্যজন নজর কাড়ার মত এক চরিত্র। গায়ের রঙ দেখেই বোঝা যায় - এদেশি নয়। অস্বাভাবিক লম্বা – কমপক্ষে ছ’ফুট তিন ইঞ্চি হবে – আন্দাজ করল কায়েস। পেশিবহুল দেহ, নিখুঁত ভাবে ছাঁটা ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি রয়েছে থুতনিতে। ভারী বুট আর অত্যাধিক ঢোলা একটা রেইন কোট পরে আছে লোকটা।
“মনে হয় আমাদের পার্টি হাজির,” নিচু স্বরে বললেন রবিউল আলম। জবাবে মাথা ঝাঁকাল কায়েস।

এদিক সেদিক তাকাচ্ছে লম্বা লোকটা, ওদের ওপর তার চোখ পড়তে ভাল হাতটা নেড়ে ইশারা করল কায়েস। নিচু গলায় সঙ্গিকে কিছু বলল লম্বু, তারপর এগিয়ে এলো দু’জনে।
“আরে, আরে! এযে দেখছি ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রিয়াস স্বয়ং!” হঠাতই বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল অবলাল, কায়েস দেখল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও।

পই করে ঘুরল লম্বা লোকটা, একই সাথে ঝটকা দিয়ে নিজের বেঢপ কোটের নিচ থেকে টেনে বের করল বিরাট একটা পিস্তল।

কায়েস ভেবেছিল শুধু অবলালই বোধহয় অস্বাভাবিক ভারী হ্যান্ডগান ব্যবহার করে, কিন্তু এই লোকেরটার তুলনায় ওর স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন .৫০০ কিছুই না! আগে কখনো সরাসরি দেখেনি কায়েস, তবে পাইফার জেলিস্কা ওর অপরিচিত নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বিধ্বংসী রিভলবার ওটা। লোকটা ড্রও করেছে খুবই দ্রুত, কিন্তু তবু সে তাক করার আগেই অবলালের পিস্তলের লক্ষ্য লম্বুর বুকের ওপর স্থির হলো।

"কে ভাবতে পেরেছিল, আবার আমাদের দেখা হবে? তাও এরকম একটা জায়গায়?" থমথমে গলায় বলল সে।

বাঁকা একটা হাসি খেলে গেলো লম্বুর ঠোঁটের কোণে, "আসলেই, দুনিয়াটা বড্ড বেশি ছোট, বিশেষ করে তোমার আমার মত লোকদের জন্যে তো বটেই! কি বল রাজবীর?" কোন রকম টান ছাড়া পরিষ্কার বাংলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল লোকটা।

একুশ

বিহব্বল দৃষ্টিতে একবার অবলাল, একবার ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রিয়াস নামক লম্বা লোকটা এবং শেষে কায়েসের দিকে তাকালেন রবিউল। তাঁকে দেখে সত্যি বলতে কি, বড্ড মায়া লাগল কায়েসের। বেচারা দুর্বল চিত্তের সাদাসিদে লোক, পুলিশ হিসেবে তাঁকে মোটেও মানায় না। আর এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছেন, তল পাচ্ছেন না মোটেও। ও নিজেও বুঝে উঠছে না কি করা উচিৎ। অবলালের সাথে যে এই লম্বুর পুর্ব পরিচয় আছে তা বিলকুল বোঝা যাচ্ছে। এবং যে ভঙ্গিতে কথা বলছে তাতে মনে হচ্ছে অবলালকে এক হাত দেখে নেবার ক্ষমতা রাখে সে। তাই যদি হয় তবে কায়েসের পক্ষে কিই বা করা সম্ভব? দুই সিংহের লড়াইয়ের মাঝে বিড়ালের মত মত অবস্থা হবে ওর।

কয়েক টেবিল দূরে বসা এক মহিলা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তার দেখা দেখি উত্তেজিত গুঞ্জন উঠল অন্যান্য খদ্দেরদের মাঝেও, বয় বেয়ারারাও গলা মেলালো তাদের সঙ্গে। ভাগ্যিস ভিড় কম, নাহলে এতক্ষণে নিরঘাত ছুটোছুটি শুরু হয়ে যেত। কিন্তু অবলাল বা দীর্ঘদেহী আগন্তুকের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। নিস্কম্প হাতে পিস্তল তাক করে আছে অবলাল, থমথম করছে ওর মুখ। অন্যদিকে অ্যান্ড্রিয়াস নামের লোকটার পিস্তল ধরা হাতটা শিথিল ভাবে ঝুলছে দেহের পাশে, কিন্তু তার চেহারাতে দুশ্চিন্তার লেশ মাত্র নেই, ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি খেলা করছে।

মুখ খুলল আবার অবলাল, এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল কায়েস যে আবারও অবলাল কথা শুরু করতেই শান্ত হয়ে গেছে জনতা। হ্যাঁ মৃদু একটা গুঞ্জন এখনো শোনা যাচ্ছে বটে তাঁদের মাঝ থেকে কিন্তু একটু আগের সেই অরাজকতা বিদায় নিয়েছে। "আমাকে একটা কারণ দেও যেজন্যে তোমাকে গুলি করব না?" অবলালের কণ্ঠ বরফের মত শীতল।
উচ্চস্বরে হেসে উঠল লম্বা লোকটা, "মাত্র একটা? তুমি খুব ভালো করেই জানো কেন, রাজবীর!" আবার ওই নতুন নামে অবলালকে সম্বোধন করল সে। দুপুরে সাদিব বলেছিল রুদ্র, এখন এ ব্যাটা বলছে রাজবীর! ঘটনাটা কি? অবাক হয়ে ভাবল কায়েস। ওদিকে চুপ করে নেই আগন্তুক, "প্রথমত, এখানে আমারা লড়লে তার ফল কি হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। তাছাড়া, এতগুলো বছর যখন পরস্পরকে এড়িয়ে চলেছি আমাদের কাজের স্বার্থে। তখন হঠাৎ দেখা হয়ে গেলেই লেগে যাবার পেছনে কোন যুক্তি নেই।" কাঁধ ঝাঁকাল সে, "আর সবচেয়ে বড় কথা," দেতো হাসিটা আরও চওড়া হলো তার, "তোমার কি মনে হয় ওই খেলনার গুলিকে আমি ভয় পাই?!"
এক মূহুর্ত দ্বিধা করল অবলাল, "তা ঠিকই বলেছ," অ্যান্ড্রিয়াসকে নয়, বরং নিজেকেই যেন শোনাল ও কথাটা, "ঠিক আছে, তবে এখানে আর থাকা যাচ্ছে না – নিরিবিলি কোথাও যাওয়া দরকার।"

বলতে বলতে হাতের মিনি কামানটা - যেটাকে কিনা অ্যান্ড্রিয়াস খেলনা বলেছে – পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল সে। তারপর তাকালো আসেপাশের কৌতুহলি লোকজনের দিকে তাকিয়ে নরম কিন্তু উঁচু গলায় বলল, "আমরা একটা সিনেমার সুটিং করছি। একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারছিলাম না, আপনাদের ভয়ের কিছু নেই!" বরবরের মতই ওর কথায় কাজ হলো, চরম রকমের হাস্যকর যুক্তিটাও বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলো উপস্থিত জনতা। ফিরে গেলো যার যার কাজে। কি করে এটা করে ও শিখে রাখতে পারলে কাজে দিত! ভাবল কায়েস।

ওদিকে অ্যান্ড্রিয়াসেও তার অস্ত্রটা ফেরত পাঠিয়েছে ঢোলা রেইনকোটে ভেতরে। কায়েসের দিকে ইশারা করল অবলাল, তারপর নিচু গলায় কিছু বলল ওর সঙ্গের মেয়েটাকে। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। কায়েসও অনুসরণ করল, রবিউলও আসছেন, তবে একটু পেছেনে। বের হবার পথে ক্যাশ কাউন্টারে দ্রুত কিছু কথা বললেন তিনি, রিজার্ভেশনের টাকাও মিটিয়ে দিলেন। সব মিলিয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা ছ'জন।

অ্যান্ড্রিয়াস আর তার সঙ্গের লোকটা, টেলিফোনে যার নাম বলেছিল নাজিম - সামনে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কি যেন আলাপ করছে ওরা, লম্বুর কথা শুনতে শুনতে নাজিমের মুখে যে একই সঙ্গে বিস্ময় এবং ভয় ফুটে উঠেছে তা কায়েসের চোখ এড়াল না। অন্যদিকে অবলাল আর ওর অবগুন্ঠন পরিহিতা সঙ্গিনী ও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল, দ্রুত হেঁটে ওদের ধরে ফেলল কায়েস, পেছনে হাঁসফাঁস করতে করতে এলেন রবিউল আলম। "মাথা মুন্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না!" কাছা কাছি এসে তিক্ত সুরে অভিযোগ করল করলেন তিনি।
"আমারও একই কথা।" কায়েসের গলায় অবশ্য অভিযোগ অপেক্ষা অসন্তোষ বেশি।
"একটু সময় দেও, সব খুলে বলছি।" অবলালের সংক্ষিপ্ত উত্তর।
"তোমার খুলে বলা যে কেমন তা আমার বেশ বোঝা হয়ে গেছে!" ক্ষেপে উঠল কায়েস, "তোমার মত লোকদের রিমান্ডে নেয়া উচিৎ!"
ওর কথার উত্তর দিলো না অবলাল, "ক্যাপ্টেন!" ডেকে উঠল সে, ঘুরে ওর দিকে তাকালো লম্বু, চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।
"এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা তো সম্ভব না, আবার তোমার সাথে কোথাও যাওয়ার আগে বরং এক বোতল বিষ দিয়ে নাশতা করব আমি! তাই একটাই উপায় আছে, তুমি আমার সঙ্গে চল।" সামান্য বিরতি দিয়ে যোগ করল, "মানে যদি তোমার কাছে আসলেই কোন কাজের তথ্য থেকে থাকে আর কি।"

"হাহ! আমার কাছে তথ্য আছে তো বটেই, তবে তোমাকে দেব কিনা সেটাই চিন্তা করে দেখছি।" নাজিমের দিকে ফিরে ফিসফিস করে আবার কি যেন বলল সে, জবাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো নাজিম। "ঠিক আছে," আগের থেকে কিছুটা নরম শোনাল অ্যান্ড্রিয়াসের কন্ঠ,

“আমরা যাব তোমাদের সঙ্গে, তবে আগেই বলে রাখছি, কোন চালাকি করার চেষ্টা করলে পস্তাবে তুমি রাজবীর! আমি কতটা কি করতে পারি সে ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ধারনা আছে তোমার, তাই সাবধান।” শেষের দিকে আবার চড়ে গেলো ওর গলা।
“তুমি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছো?” অবলালও পিছিয়ে যাবার বান্দা নয়, “আর চালাকি টালাকি করা তোমার কাজ আমার না!” কায়েসের দিকে ফিরল সে, “ট্যাক্সি ডাকো একটা।”
“তার দরকার নেই,” এই প্রথম জোর গলায় কথা বলল নাজিম, তার কণ্ঠস্বরটা একটু যেন ভীতসন্ত্রস্ত শোনালো কায়সের কানে। “আমাদের সাথে জীপ আছে। ওতেই সবাই যেতে পারব, তা কোথায় যেতে হবে?”
কিছুক্ষণ পর, আশুলিয়ার দিকে চলছে গাড়িটা। বড় আকারের পুরানো মডেলের ল্যান্ড ক্রুজার। একেবারে পেছনের সিটে বসে আছে কায়েস আর রবিউল, ওদের মুখোমুখি বসেছে অবলাল আর মেয়েটা। মাঝের সিটগুলো ফাঁকা। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে অ্যান্ড্রিয়াস আর নাজিম চালাচ্ছে। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি অবলাল, সামনের দু’জন অবশ্য নিজেদের মাঝে নিচু গলায় আলাপ চালাচ্ছে কিন্তু পেছনেরদের সাথে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা তারাও করেনি। রবিউল একবার মুখ খুলেছিলেন, কিন্তু অবলাল ইশারায় তাঁকে কথা বলতে মানা করেছে। হঠাৎ নিরবতা ভাঙ্গল, “সামনের মোরের কাছে গাড়ি রাখবেন।” নাজিমকে লক্ষ্য করে বলে উঠেছে অবলাল। জবাবে ঘোত জাতিয় একটা উত্তর পাওয়া গেলো, তারপর আবার চুপচাপ।
“আমার বেশ খিদে পেয়েছে, ভেবেছিলাম কথা বার্তার ফাঁকে জম্পেশ একটা খাওয়া দেব, কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে বাকি রাতটা উপোষ করেই কাটাতে হবে!” ফিস ফিস করে কায়েসের কানের কাছে বললেন রবিউল।
বিরক্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো কায়েস, “আপনি কাজের মাঝেও খানাপিনার কথাটা ঠিকই খেয়াল রেখেছেন যা হোক!” মৃদু তিরস্কার করল ও, “এত ক্যাজুয়াল হলে কি চলে?”

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। একে একে নেমে এলো ওরা সবাই। হাইওয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা মেঠো পথ, বৃষ্টিতে কাঁদা হয়ে আছে, সেদিকে ইঙ্গিত করল অবলাল, “তুমি আগে ক্যাপ্টেন!” ওর দিকে তাকিয়ে একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসল আন্ড্রিয়াস, তারপর এগিয়ে গিয়ে নেমে পড়ল কাঁচা রাস্তায়।
ওরা যেখানে রয়েছে সেখানটা গাড়ির হেড লাইটের আলোয় আলকিত, কিন্তু সামনে ঘুরঘুটি অন্ধকার। তারওপর কাঁদাপানি, কিন্তু এর মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতেও অ্যান্ড্রিয়াসের কোন সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হলো না। তবে সঙ্গির পিছু নেবার আগে নাজিম পকেট থেকে ফোন বের করে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে নিলো। পকেট টর্চ বের করল কায়েস, গত দু’দিনের ঘটনাপ্রবাহের ফলে সে নিজেকে যেকোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত রেখেছে, ওর পকেটে টর্চ ছাড়াও রয়েছে একটা সার্ভাইভাল নাইফ, নাইলনের কর্ড এবং একটা মিনি ফার্স্ট এইড কিট।

বেশি দূর হাঁটতে হল না, শ'খানেক গজ পেরোতে একটা গাছপালার জটলা পড়ল, তার পেছনেই একটা ছোট্ট টিনের ঘর। এগিয়ে গিয়ে ওটার তালা খুলল অবলাল। একে একে সবাই ভেতরে ঢুকতে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে। ঘরের ভেতরটা বেশ বড়, বাইরে থেকে এতটা মনে হয় না, তবে তেমন কোন আসবাবপত্র নেই। এক কোণে ছোট একটা চৌকি, মাঝে একটা টেবিল ঘিরে খান কতক চেয়ার আর দেয়ালে লাগানো কয়েকটা তাক। একটা তাকের ওপর পুরানো ধাঁচের কেরোসিন কুকার রয়েছে। এছাড়া অন্য তাকগুলোয় বেশ কয়েকটা বাক্স, টিন এবং বোতল সাজানো, ব্যস। টেবিলের ওপর দুটো হারিকেন রাখা, ওগুলো জ্বেলে দিলো অবলাল, তারপর নিজে একটা চেয়ারে বসে অন্যদেরকেও বসতে ইশারা করল। দেখা গেলো সাকুল্যে মোট চারটা চেয়ার রয়েছে, লোক ওরা ছ'জন। শেষে ঠেলে চৌকিটাকে টাবিলের কাছে নিয়ে আসা হলো। চোকিতেই বসল কায়েস, পাশে রবিউল আলম। অন্যরা চেয়ারে জায়াগা করে নিয়েছে। হারিকেনের আলোতে ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি, বাইরে আবার ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সব মিলে একটা গা ছমছমে পরিবেশ।

গলা খাঁকারি দিয়ে নিরবতা ভাঙ্গলেন রবিউল, "কাজের কথায় আসার আগে পরিচয়টা সেরে নেয়া যাক। আমি ইন্সপেক্টর রবিউল আলম, ওসি – মোহম্মদপুর থানা। এ হচ্ছে কায়েস হায়দার, ইন্সপেক্টর - স্পেসাল ব্র্যাঞ্চ।" মাথা হেলিয়ে কায়েসকে দেখালেন তিনি।
"আমার মনে হয় ফর্মালিটির দরকার নেই," বাঁধা দিলো অবলাল, "তারচেয়ে তথ্য আদান প্রদান করে যার যার পথে চলে যাওয়াটাই ভালো হবে।"
আপত্তি করতে যাচ্ছিল কায়েস, কে এই ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রিয়াস আর অবলালের সাথে তার কি সম্পর্ক সেটা জানা ওর জন্যে নেহাত ফর্মালিটির চেয়ে বেশি কিছু। তাছাড়া অবলালের এই সার্বক্ষণিক রহস্যময়তা আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নাজিম, এবং অ্যান্ড্রিয়াসও বেশ জোর গলায় সায় দিলো। "হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে!" বলল সে, "আমি আসলে ভাবিনি তোমাকে এখানে দেখব রাজবীর, তবে হয়ত আসতামই না, বা এলেও ভাবসাব অন্য রকম থাকত!"
"আমি কি করি তা যখন জানো, না ভাবাটা তোমার বোকামিই বলতে হবে!" অবলালের চাঁছাছোলা উত্তর।
হাসল অ্যান্ড্রিয়াস, "তা অবশ্য ঠিকই বলেছ, আসলে এখন মনে হচ্ছে আবার আগের মত সব কিছু হলে খারাপ হত না..."
"কিন্তু তুমি আর আমি দু'জনেই জানি তা হবার নয়! তাই ওই প্যাঁচাল বাদ!" থামিয়ে দিলো ওকে অবলাল। "কাজের কথা বলো, কি জানো তুমি আমাদের কেসের ব্যাপারে?"
মুখ খুলল নাজিম, "আপনার কোন কেস বা তার আদপান্ত নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই রাজবীর সাহেব..."
"নামটা অবলাল," সুধরে দিলো নামের মালিক, অ্যান্ড্রিয়াসের দিকে ফিরে যোগ করল, "আশা করি তুমিও তাই ডাকবে।"

“ধ্যাত্তরি!” বিরক্ত হয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল কায়েস, “বাচ্চা ছেলেপুলের মত ঝগড়া না করে কাজের কথায় আস তো!”
“আচ্ছা অবলাল সাহেব, ইন্সপেক্টর কায়েস,” রবিউলকে উপেক্ষা করে গেলো নাজিম, এতক্ষণে বেশ বুঝতে পেরেছে যে সিনিয়র অফিসারটি আসলে কাগুজে বাঘ! কাজের বেলায় ঠনঠনাঠন! “আমার কাছে একটা জিনিস আছে যেটা মনে হয় আপনাদের এই কেসের বেলায় বেশ তাৎপর্যপূর্ন।” নাটকীয় ঢঙে পকেট থেকে কালো পাথরের ছোট একটা টুকরো বের করে টেবিলের ওপর, যেখানটায় হারিকেনের আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল, সেখানে রাখল সে।

অদ্ভুত আকৃতিতে কাটা পাথরটা, খুব সম্ভব কষ্টি পাথর, অনুমান করল কায়েস। আকারে একটা টেনিস বলের অর্ধেক হবে। দেখতে অনেকটা মূর্তির মত, তবে নির্দিষ্ট কোন ফিনিশিং দেয়া হয়নি, যেন কাজ শুরু করার পর মাঝপথে থেমে গিয়েছিল কারিগর। কিন্তু বস্তুত ঘটনা তা নয়, কারণ পাথরটার গায়ে সুক্ষ অনেকগুলো চিহ্ন আকা আছে, যা উঁচুদরের শৈল্পকর্ম বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। কেটে সম্পূর্ন আকার দেবার আগে এমন খুঁটিনাটি কাজ কেউ করবে না। জিনিসটা এক কথায় অদ্ভুত, কিন্তু এটা ওদের কেসে কি কাজে লাগবে তা কায়েসের বোধগম্য হলো না। উত্তরের আশায় অবলালের মুখের দিকে তাকাল সে।
ভ্রু কুঁচকে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে অবলাল, আনমনে হাত বোলাচ্ছে নিজের শ্মশ্রুমন্ডিত থুতনিতে।
“কি ওটা?” রবিউলের প্রশ্ন।
“এক প্রকারের মাদুলি।” এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা, গলার স্বরটা মিস্টি তবে তাতে এক ধরনের দৃঢ়তা রয়েছে। এখনো মুখ ঢেকে রেখেছে সে, কে এই মেয়ে? কোথেকে একে যোগার করেছে অবলাল? ভেবে কুল পেলো না কায়েস।
“মাদুলি?” ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না রবিউল, “একটু খুলে বলবেন ম্যাডাম? আর আপনার নামটা জানলে সুবিধা হত।”
“আমি বলছি,” হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলো অবলাল, “এটা হচ্ছে সেই জিনিস, যা গাড়িতে ছিল বলে ওই রাশেদুন ছেলেটা ভয় পেয়েছে!” কায়েসকে লক্ষ্য করে বলল ও। “এটা কি করে পেলেন?” প্রশ্নটা নাজিমের উদ্দেশ্য করা।
“আমি আদাবর এলাকাতে থাকি,” শুরু করল নাজিম, “গত পরশু রাতে একটা ছোট রিচুয়াল করছিলাম। আচ্ছা, বলা হয়নি, আমি একজন সৌখিন অকাল্টিস্ট। প্ল্যাঞ্চেট, ছোট খাট অতিপ্রাকৃত তলব, ইত্যাদি নিয়ে কাজ করি। সেই সুত্র ধরেই ক্যাপ্টেনের সাথে পরিচয়। বছর কয়েক আগে আমেরিকাতে ছিলাম, ভুল করে এক ওয়্যার উলফের সাথে টক্কর লেগে যায়, উনি তখন আমায় বাচিয়েছিলেন।”
“ও-ওয়্যার উলফ?!” তোতলে উঠলেন রবিউল, কিন্তু টেবিলের নিচ দিয়ে লাথি মেরে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলো কায়েস।

“আমি আবার অতিপ্রাকৃত আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করে থাকি, আর ক্যাপ্টেনের প্রায়ই ওসব কাজে লাগে। তাই আমাদের মাঝে ভালো একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।”
“আরে বেশি বক বক না করে পরশুর ঘটনাটা বল!” ধমকের সুরে বাঁধা দিলো অ্যান্ড্রিয়াস, “তোমার আমার ইতিহাস ওদের জানার দরকার নেই!”

চুপসে গেলো নাজিম, বোঝা যাচ্ছে বন্ধু না বলে অ্যান্ড্রিয়াসের ভক্ত বললেই বেশি মানাবে তাকে। “যাই হোক, পরশু রাতে, ঠিক বারোটার সময় আমি একটা রিচুয়ালটা করতে যাই, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আমার ডাকে কোন সাড়া পাইনি! যেন গোটা তল্লাটে কোন অতিপ্রাকৃতই হয় ছিল না, নয়ত চুপ মেরে গিয়েছিল। এমনটা আগে কখনো হয়নি, তাই কৌতহলি হয়ে আমার ক্রিস্টাল বলটা কাজে লাগাই।”
“ক্রিস্টাল বল? ও জিনিস পেলেন কোথায়?” অবলালের কণ্ঠে সন্দেহের ছোঁয়া।
“জিনিসটা আসলে কি?” কায়েসের প্রশ্ন, “সিনেমাতে যেমন দেখায় যাদু করে দূরের জিনিস দেখা যায়, ওই রকম কিছু?”
“তেমনও আছে বৈকি,” বলল নাজিম, “তবে আমারটা শুধু আসেপাশের সব অতিপ্রাকৃতদের অবস্থান দেখায়। আর কোথায় পেলাম? বলেছিই তো, আমি অতিপ্রাকৃত আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করি,” অবলালের দিকে ফিরে যোগ করল সে, “আমার কালেকশন বেশ ভালো।”
“হুঁ, বুঝলাম – তারপর?”
“তো ওটাতে দেখতে পাই, যে আমার বাসার আসেপাশে বাস্তবিকই কোন অতিপ্রাকৃত নেই – একেবারে শুনশান। অথচ এমনটা কখনো হয় না, ছোটখাট কিছু সবসময়ই কোথাও না কোথাও থাকে।
ভাবলাম, ব্যাপারটা কি? তারপর হঠাৎ করেই চোখে পড়ল যে প্রায় মাইল খানেক দূরে বিশাল কিছু একটা রয়েছে! সত্যি বলতে কি, আমি নিজে তো আর মানা টের পাই না, তাই ক্রিস্টাল বলই ভরসা, কিন্তু এত বড় তো দূরে থাক, এর ধারে কাছে লাগে এমন কিছুও আগে কখনো দেখিনি। প্রথমে তো চোখের ভুলই ভেবে বসেছিলাম।
তখন আর কিছু করলাম না, কিন্তু উত্তেজনায় সারারাত ঘুম হয়নি। কাক ডাকা ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি একটা গাড়ি, দরজা খোলা, চাবি তখনো ইগ্নিশনে! একবার ভাবলাম আমার কি? পরে মনে হলো দুষ্ট লোকের নজরে পড়লে তো সমস্যা তাই ওটা থানায় দিয়ে এসেছি।”
“ওই রকম বড় একটা অতিপ্রাকৃতের উপস্থিতি টের পাবার পরও ওখানে গেলেন কোন আক্কেলে?” জানতে চাইল অবলাল।
“ইয়ে মানে, সকালে আবার ক্রিস্টাল বলটা ব্যবহার করেছিলাম, তখন আর কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। তাই কৌতুহল মেটাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখে যা বুঝেছি – কোন কিছু হয়ে থাকলে ওই পুরানো বাড়িটার মধ্যে হয়েছে। আর ভেতরে ঢুকে সেটা ঘুরে দেখা তো আর আমার পক্ষে সম্ভব না।”

“ভালো কথা,” নাজিমকে থামিয়ে দিলো কায়েস, “এই জিনিসটা পেলেন কোথায়?” ইঙ্গিতে মাদুলিটা দেখালো কায়েস, “আর সাথে করে নিয়ে গেলেনই বা কেন?”
“এটা ব্যাক ভিউ মিররের পাশে ঝুলানো ছিল,” আর নিয়ে গেছি কারণ আমি জানি যে সাধারণ পুলিশের হাতে এর সঠিক মূল্যায়ন হবে না। “এর একটা ছবি তুলে গতকালই পাঠিয়েছি ক্যাপ্টেনকে, উনি বললেন এটা নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ – তাই মনে হলো নিয়ে এসে ঠিক কাজটাই করেছি।”
“তাহলে আবার পুলিশকে ফোন করে এটার কথা বলতেই বা গেলেন কেন?”
“আমি বলেছি যোগাযোগ করতে।” উত্তর দিলো অ্যান্ড্রিয়াস। “এই বস্তু আমি চিনি। কি করে বোঝাই, ভয়কে – উম বলা যায় ভয়কে জমাট বাঁধানোর জন্যে এটা খুব কাজের জিনিস! ডমিনিক বায়রান নামের এক ধুরন্ধর যাদুকর এগুলো ব্যবহার করে থাকে, তারই ডিজাইন। ভেবেছিলাম স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কছে তার কোন খোঁজ হয়ত পাওয়া যেতে পারে।”
“ডমিনিক বায়রান!” চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে মেয়েটা। সবগুলো চোখ ঘুরে গেলো ওর দিকে, শুধু অবলাল নির্বিকার।
“হ্যাঁ, ডমিনিক বায়রান, আমরা গ্রে ব্রাদারহুডের লোকেরা বহুদিন ধরে খুঁজজি হারামিটাকে। বড্ড পিছলা লোক, আর নিষ্ঠুরও বটে। বেশ ক্ষমতাধরও বটে, গত বছর ইন্ডিয়াতে আমাদের একজন এজেন্টকে খুন করেছে। থ্রেট লেভেল কম পক্ষে ধুসুর হবে!”
“ধুসর না, কালো।” একই সঙ্গে বলে উঠল মেয়েটা আর অবলাল, এবং ওদের দু’জনের গলাতেই তিক্ততাটা চাপা থাকল না।

একটা ভুরু উঁচু করল অ্যান্ড্রিয়াস, “কালো? একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? হুট করে কাউকে এতটা শক্তিশালী ভাবার কি কোন কারণ আছে? আমি তো জানতাম তোমারা সাদা হাতের লোকেরা বরং কম কম রেটিং দিয়ে থাকো।”
“হ্যাঁ, অফিসিয়ালি আমরা ওকে সবুজে রেখেছিলাম,” বলল মেয়েটা, “কিন্তু আজ সকালে ওর সঙ্গে লড়তে গিয়ে টের পেয়েছি কতটা ভুল ছিল আমাদের হিসেবে!”

সকালে লড়াই! তারমানে কি এ সেই মেয়ে যাকে সকালে মৃত প্রায় অবস্থাতে পড়ে থাকতে দেখেছে হাসপাতালের মেঝেতে? তাজ্জব বনে গেলো কায়েস।

“ভাই আপনারা কি দয়া করে সবাই বুঝতে পারে এমন কোন ভাষায় কথা বার্তা চালাবেন?” গলায় কর্তিত্ব ফোটানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালালেন রবিউল আলম। কিন্তু বরাবরের মতই তাঁকে অবজ্ঞা করা হলো।
“ধুসর হোক বা কালো, ওকে ধরতেই হবে,” দৃঢ় স্বরে ঘোষণা বলল অ্যান্ড্রিয়াস।
“ও একা নয়,” চিন্তিত অবলালের কণ্ঠ, “সকালে আমি ওকে কাবু করে ফেলেছিলাম, কিন্তু অন্য কেউ এসে ওকে নিয়ে পালিয়েছে। এবং সেই লোক তার কাজ বোঝে।"

“তোমার হাত থেকে পালিয়েছে?” অ্যান্ড্রিয়াসের গলায় অবিশ্বাসের সুর, কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্রুপ করে উঠল সে, “সাদা হাতের সাথে থাকতে থাকতে তুমিও ভেড়া বনে গেছো হে রাজবীর!”
“ওই নামে ডাকতে নিষেধ করেছি!”
“তাহলে এই জিনিস দিয়ে ভয় জমাট বাধায়?” ওদের জল্পনা কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটালো কায়েস, আল্লাহ্ জানেন এর মানে কি? ভাবল সে, “কিন্তু তাতে কি ফায়দা?”
“যক্ষ যখন নামানো হয়, মানে অ্যাস্ট্রাল থেকে আমাদের জগতে তলব করা হয়, তখন তার একটা দেহের প্রয়োজন পড়ে।” ব্যাখ্যা করল অবলাল, “কিন্তু যে সে দেহ হলে হবে না, হতে হবে খুব ভীত একজন মানুষের দেহ। যে বেচারাকে ব্যবহার করা হয় তাকে বলে ‘বলি’। বলি যত বেশি ভীত হবে, তত শক্তিশালী যক্ষ আসবে।”
“তবে এখানে চুলচেরা কিছু হিসেব আছে,” কথা চালিয়ে গেলো সে, একই সঙ্গে পকেট হাতরে পাইপটা বের করে তামাক চুষতে শুরু করেছে, “ভয় অনেক রকম হয়, যেমন আচমকা চমকের মত ভয়। যাকে বলে পিলে চমকে যাওয়া! এই রকম ভয়ের ওপর নির্ভর করে যক্ষ কতটা শক্তিশালী হবে। আবার আরেক ধরনের হচ্ছে শীতল ভয়, যা ধীরে ধীরে বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এই জাতিয় ভয়ের ওপর নির্ভর করে যক্ষ কতক্ষণ থাকতে পারবে।”

পাইপটা মুখে তুলে দিয়াশলাই দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল সে, “এমনিতে কাউকে দুই ধরনের ভয় একই সাথে পাওয়ানো কঠিন। তাই এই জিনিসটার সাহায্যে, ক্যাপ্টেন যেমন বলল,” তর্জনি দিয়ে অ্যান্ড্রিয়াসকে দেখাল সে, “ভয়কে জমাট বাঁধানো হয়। সবাই অবশ্য বলি হতে পারে না। ভয় ছাড়াও মানার অ্যাফিনিটির একটা ব্যাপার আছে, তবে সেসব খুঁটিনাটি আমি নিজেও ভালো বুঝি না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারছি, ওই কারণেই রাশেদুনকে মারার জন্যে এত উদগ্রিব হয়ে উঠেছে এই নাটকের নেপথ্যের লোকজন। কিন্তু যক্ষ দিয়ে ওরা কি করতে চায়?”
আরও কিছু বোধহয় বলতে যাচ্ছিল অবলাল, কিন্তু টেবিল চাপরে ওকে থামিয়ে দিল অ্যান্ড্রিয়াস, “কি ঘটছে এখানে খুলে বলো তো।” এই প্রথম কোন রকম টিপ্পনি না কেটে বা ব্যঙ্গাত্মক সুর না তুলে কিছু বলল সে অবলালকে, “মনে তো হচ্ছে খুব বাজে ধরনের কোন ঝামেলা? যক্ষ নামিয়ে ফেলেছে নাকি? ওইদিন কি নাজিম তাহলে ক্রিস্টাল বলে যক্ষই দেখেছিল?”
নাজিমের মুখটা নিউজ প্রিন্ট কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, “যক্ষ?” যেন গলার মাঝে ব্যাঙ আটকেছে তার, “যক্ষ, ক্যাপ্টেন?”
লম্বা করে শ্বাস টানল অবলাল, এক মূহুর্ত ভাবল কি যেন, তারপর বলল, “হুঁ, আসলেই বেশ বড় একটা সমস্যাই বটে – কি যে ঘটছে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু সকালে যা দেখলাম তাতে বোঝা যাচ্ছে কালো স্তরের থ্রেট সম্পন্য কম পক্ষে দুইজন শত্রু রয়েছে আমাদের। তার থেকেও বড় কথা ওরা কি চায় কিছুই জানি না আমরা। মনে হচ্ছে এমতাবস্থায় সাদা হাত আর

গ্রে ব্রাদারহুডের একটা অলিখিত সমোঝোতায় আসা উচিৎ। কি বল অরণী?" পাশে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল ও।
"অসম্ভব!" অরণী মুখ খোলার আগেই চড়া গলায় প্রতিবাদ করে উঠেছে অ্যান্ড্রিয়াস। "সাদা হাতের সাথে কাজ করব আমি? তাও তোমার সাথে? ভাবলে কি করে? ছোঁ!"
"আমিও এর বিপক্ষে, তেমন দরকার পড়লে হেড অফিস থেকে অন্য এজেন্টদের ডেকে আনা যাবে, কিন্তু তাই বলে গ্রে ব্রাদারহুডের সাথে হাত মেলানো? কোনমতেই না!" মুখ থেকে অবগুন্ঠন সরাতে সরাতে নিজের মত জানিয়ে দিল অরণী।
বিরক্ত ভঙ্গিতে দুম করে টেবিলের ওপর একটা কিল মারল অবলাল, এতটাই জোরে যে কায়েসের ভয় হলো টেবিলটা ভেঙ্গে না যায়। "তোমাদের কি মনে হয় যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমি, হ্যাঁ এই আমি! গ্রে বাদারহুডের সাথে মিলে কাজ করতে চাইতাম? তুমি তো আমাকে চেন ক্যাপ্টেন, নাকি? তোমার কি মনে হয় অহংকার তোমার থেকে কিছু কম আছে আমার? নাকি মনে কর আমি তোমাকে ভয় পাই?"
"শোন তাহলে," পাইপে শেষ একটা লম্বা টান দিয়ে ওটা টেবিলে আছড়ে ফেলল অবলাল, "আজ সকালে আমি কি দেখিছি জানো?" ওর ভারী গলা গমগম করছে, কি যেন একটা আছে কথাগুলোর মধ্যে।
আবারও অনুভব করল কায়েস, যেন বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবনের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে ও। আড়চোখে লক্ষ করল, একমাত্র অ্যান্ড্রিয়াস ছাড়া আর সবার চেহারাতেই কেমন একটা বিমুগ্ধ ভাব চলে এসেছে।

"দেখেছি যে একটা বেষ্টনী তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে! বুঝেছ? সামান্য একটা বেষ্টনী! কিন্তু তার জন্যে ওরা যক্ষ নামিয়েছিল। কপালগুনে বলি ছেলেটার ভাইও ওই ঘরে ঘুমাচ্ছিল। এবং যেহেতু যক্ষ মানুষ চেনে রক্তধারার মাধ্যমে, দু'ভাইয়ের মধ্যে তফাত করতে পারেনি। ফলে ভুল লোকের প্রাণ যায়। আর যেহতু ওই ছেলের মনে ভয় ছিলনা তাই যক্ষ বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি!" বলে চলল অবলাল, "কিন্তু ব্যাপার সেটা না, ব্যাপার হচ্ছে, একটা বেষ্টনীর জন্যে যক্ষ কেন লাগতে পারে? এত মশা মারতে কামান না, একেবারে মিসাইল!" ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, "কি, ক্যাপ্টেন? কি মনে হয় তোমার?"
থম মেরে গেছে অ্যান্ড্রিয়াস, দৃঢ় হয়ে গেছে তার চোয়াল, ভ্রু কুঞ্চিত। প্রায় আধ মিনিট পর মুখ খুলল সে, "যক্ষের মত শক্তিশালী কিছু দিয়ে বেষ্টনী দেবার একটাই কারণ থাকতে পারে, গোপনে বড় কোন রিচুয়াল করতে চাইছে ওরা। কিন্তু, রক্তের রঙ! গোপন করতে যক্ষ লাগে, ওরা কি অপদেবতা ডেকে আনার চেষ্টা করছে নাকি?!" নিজের হাতের তালুর ওপর এত জোরে ঘুষি মারল সে যে মনে হলো পিস্তল ফুটিয়েছে, "তুমি ঠিকই বলেছ রাজবীর, এই অবস্থাতে একসাথেই কাজ করতে হবে আমাদের, ধরে নেও এটা একটা সাময়িক শান্তি চুক্তি!" এবার আর ওকে নামের ব্যাপারে সাবধান করল না অবলাল, বরং অরণীর দিকে তাকালো, "কি, তোমার আপত্তি আছে?"

“থাকলেও কি কোন লাভ হবে?” ঠাণ্ডা সুরে বলল অরণী, কিন্তু চাপা সঙ্কার ছোঁয়াটা পুরোপুরি গোপন করতে পারল না কণ্ঠ থেকে।

“তাহলে ওই কথাই থাকছে, এই সমস্যার নিস্পত্তি হবার আগ পর্যন্ত একসাথে কাজ করছি আমরা, তাই বলে ভেবো না সব চুকে গেছে!” অবলালকে উদ্দেশ্য করে বলল অ্যান্ড্রিয়াস। “এবার এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে খুলে বল আমাকে।”

“সেটা মনে হয় তুমিই ভালো পারবে,” কায়েসের দিকে তাকালো অবলাল।

মাথা ঝাঁকাল কায়েস, “শুনুন তাহলে, ক্যাপ্টেন...”

“ওহ প্লিজ, আমাকে অ্যান্ড্রিয়াস ডাকলেই চলবে, ইন্সপেক্টর।”

“আচ্ছা, তাহলে আমাকে শুধু কায়েস বলবেন।”

বাইশ

"যংকসুরকে কি বিশ্বাস করা যায়?" প্রশ্নটা করেছে বায়রান, সকালের তুলনায় তাকে এখন বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে, আগে যে বদ্ধ ঘরটায় সুস্ময় ভট্টাচার্য্য আবস্থান করছিল সেখানে আবার ফিরে এসেছে ওরা। সুস্ময়, বায়রান আর তরন্দিদেব।

"বিশ্বাস?!" খনখনে গলায় হেসে উঠল সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, "আমাদের লাইনে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, এটাও কি জানো না?"

"না আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি," অপ্রস্তুত বোধ করল বায়রান। সকালে নিজে ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর আরেকজনের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা সুস্ময় কি ভাবে নেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে, আর সেজন্যেই কথা ঘোরাচ্ছে, "আসলে জানতে চাচ্ছিলাম দায়িত্বটা সে ঠিক মত পালন করতে পারবে কিনা? ওরা কিন্তু সহজ চীজ না, সুস্ময়দা!"

"যংকসুরকে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে!" ধমকে উঠল সুস্ময়, "আর নাচতে না জানলে সবাই উঠানের দোষ দেয়!" একটু থেমে যোগ করল, "আর তার কাজটা তো কঠিন কিছু না, তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা! কিছু জানতে পারলে ভালো, না পারলেও ক্ষতি নেই। এমনিতেও তো ওটা ওরা পেতোই!"

"কিন্তু ধরা পড়ে যায় যদি?"

"যংকসুরকে ধরবে?" মুখ বাঁকালো সুস্ময়, "তোমার মাথা ঠিক আছে তো?"

"ওদেরকে হেলাফেলা করা ঠিক হচ্ছে না সুস্ময়দা, আমি ওই লোকটার সঙ্গে লড়েছি - আমি জানি! এমন ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হইনি আগে কখনো আর মেয়েটারও মানার ব্যবহার বেশ ভালোই জানা আছে।" আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নিলো বায়রান।

"ডমিনিক ঠিকই বলছে। যে আঘাতটা ওকে ধরাসয়ি করে সেটা আসলেই মারাত্মক ছিল। আর আমার মনে হয়না লোকটা ওর বিরিদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।" বন্ধুর পক্ষে সাফাই গাইলো তরন্দিদেব।

"দেখুন," শান্ত ভঙ্গিতে শুরু করল সুস্ময়, সাধারণত যে বদমেজাজি ভাবটা থাকে তা বিদায় নিয়েছে তার কণ্ঠ থেকে, "অনেক খোঁজ খবর করেই আপনাকে বাছাই করেছি আমি। আপনার যে নামডাক বাস্তবে যদি তার অর্ধেক ক্ষমতাও থেকে থাকে তাহলে বলতে হবে নিজের কাজ ভালোই বোঝেন আপনি। তাছাড়া বায়রানকে উদ্ধার করেও আমাদের ঝামেলা কমিয়েছেন। ওকে হারাতে হলে পুরো কাজটাই থেমে যেত।" তরন্দিদেবের উদ্দেশ্য বেশ সম্মানের সঙ্গে কথাগুলো বলল বুড়ো, "কিন্তু তাই বলে হুট করে কোন মন্তব্য করবেন না, আশা করি আপনার সাথে যে কায়দায় যোগাযোগ করেছি তার থেকে আমার বিষয়ে একটা ধারনা পেয়েছেন?"

"তা পেয়েছি বটে," বলল তরন্দিদেব, "তবে আরেকটু বিস্তারিত জানতে পারলে খুশি হতাম। না না, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়। বরং যে কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছেন সে বিষয়ে।"

"আসছি সে কথায়। কিন্তু তার আগে এটা বুঝুন, আমি এই কাজের উদ্যোগতা নই।"

তরন্দিদেবের ওপর তেমন প্রভাব না ফেললেও বায়রান খুবই অবাক হলো কথাটা শুনে। আহত নাহলে হয়ত লাফিয়ে উঠেই দাঁড়াত। "কি বলছেন আপনি সুস্ময়দা?!" উত্তেজিত ভঙ্গিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

"কথার মাঝে বাহাত দেবে না!" সুস্ময়ের মেজাজ আবার চড়ে গেছে, "যা বলছিলাম, কাজটা আমি করছি আরেকজনের হয়ে। এতদিন ভেঙ্গে বলিনি কারণ প্রয়োজন পড়েনি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ছিল। কিন্তু তোমার নির্বাচন করা লোকের ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে বিরাট প্যাঁচ লেগে গেছে, যেটা কিনা এমনকি তুমি নিজে চেষ্টা করেও ছাড়াতে ব্যর্থ হয়েছ। আর আমার কাছে ব্যর্থতার শাস্তি একটাই – মৃত্যু দন্ড! আমি তো আর ভালো মানুষ নই যে দয়া দেখাব, তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি, সেই সুবাদে ছেড়ে দেব এমনটা নিশ্চয়ই ভাবনি?"

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বায়রান, বুড়োর যুক্তি মেনে নিয়েছে।

"যাক তাও ভালো নিজের অবস্থানটা বুঝতে পারছ। এই মূহুর্তে তোমাদের ছাড়া আমার চলবেনা আর লোকবল আমাদের এমনিতেই যথেষ্ট নেই, শুধু সেকারণেই কাউকেই কিছু বলিনি। নাহলে সবকটাকে নিজ হাতে খুন করতাম!" তরন্দিদেব লক্ষ্য করল খুন করার কথা বলার সময় চোখ চকচক করছে বুড়োর, যেন অতিসয় আনন্দদায়ক কোন বিনোদনের কথা আলাপ করছে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল সে, এই বুড়োকে যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে এখন।

"এখন আমাদের হাতে উঠকো বেশ কিছু কাজ জমে গেছে, আর সময়ও খুব বেশি সময় নেই, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেলে আফসোস ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সেজন্যেই যংকসুর সামনে এসেছেন। এমনিতে আমার এবং তাঁর মাঝে যোগাযোগ রক্ষাই ছিল ওনার কাজ। কিন্তু বারবার আমাদের ব্যর্থতার ফলে ধৈর্য হারিয়ে এখন নিজেই মাঠে নেমে গেছেন। আর তুমি বলছ তাঁকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে?"

"তাঁর সাথে যোগযোগ মানে কি? সে কে?" জানতে চাইল তরন্দিদেব।

"সম্মানের সঙ্গে কথা বলুন, তিনি আপনার বা আমার মত কেউ নন!" সুস্ময়ের কন্ঠ থেকে ভক্তি উপচে পড়ছে, "তিনি দয়া পরবস করে কাজটা দিয়েছেন আমাদের। এমন সুযোগ জীবনে একবারই আসে। সফল হলে যা চাইব তাই পাব!"

"তা তো বুঝলাম," সন্তুষ্ট হতে পারল না তরন্দিদেব, "কিন্তু তাঁর পরিচয়টা কি? আর ঠিক কি কাজই বা করতে যাচ্ছি আমরা?"

"অযথা ফাও প্রশ্ন করবেন না," মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সুস্ময়, "আগেই তো কথা হয়েছে, আপনার কাজ আপনি করবেন, বারতি কিছু জানতে চাইবেন না। আমি সেধে যতটুকু বলব তার বেশি কৌতুহল দেখাবেন না!"

"হুঁ!" উঠে দাঁড়াল তরন্দিদেব, "দুঃখিত, ভট্টাচার্য্য বাবু, আপনার প্রস্তাবটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্ধকারে থেকে কাজ করতে পছন্দ করি না আমি।" কাট কাট গলায় বলল সে, "সাক্ষাতে আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হবে, বলেছিলেন আপনি। কিন্তু সরেজমিনে যা দেখছি,

পরিস্তিতি আমাদের স্বপ্ন সাক্ষাতে যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন তেমনটা নয় মোটেও। অন্যদের হয়ত গোজামিল দিয়ে বোঝাতে পেরেছেন, কিন্তু সাদা হাত কি তা ভালো করেই জানি আমি। ওদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে জানাজানি হবেই। নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা না রেখে এমন ঝুঁকি নিতে পারব না। কারণ ওপরের স্তরের কারো কাছে জবাবদিহি করার সময় – মানে ততটুকু সুযোগ যদি তাঁরা দয়া করে দেয়ও - আপনি আমায় বাঁচাবেন না; আর আপনার ওই 'তিনি'ও আমার পক্ষ নেবেন না! আর নিলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং, হয় সবকিছু খুলে বলুন, একেবারে গোড়া থেকে সঅঅব কিছু, নাহলে বিদায়!"

দেখেই বোঝা যাচ্ছে – ভীষণ রেগে গেছে সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, চোখ দুটো অমানুষিক রকম লাল হয়ে গেছে তার। জ্বলছে রীতিমত। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষুধার্থ, মানুষ খেকো বাঘের কথা মনে পড়ে গেলো তরন্দিদেবের।

অনেক আগে, সাধনার শুরুতে, ওর গুরুর আস্তানায় ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। প্রাচীন এক তান্ত্রিক এসেছিল কি একটা প্রস্তাব নিয়ে, রাজি হয়নি তরন্দিদেবের গুরু। দুই পিশাচ সাধকের মাঝে বেঁধে যায় কলহ। এক পর্যায় হঠাৎ করেই ঘটে যায় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। চোখের সামনে মানুষ থেকে বাঘে রূপান্তরিত হয় সেই তান্ত্রিক এবং ঝাপিয়ে পড়ে তরন্দিদেবের গুরুর ওপর।

তারা দু'জন আলাপ করছিল ভর সন্ধ্যা বেলা, বনের পাশে একটা বড় বট গাছের নিচে বসে। সাধারণ কোন লোক হলে বাঘের আক্রমণে মূহুর্তেই তার মৃত্যু ঘটত, কিন্তু তরন্দিদেবের গুরু সাধারণ কেউ ছিল না। নিজের অশুভ ক্ষমতা দ্বারা বাঘরূপি সেই পিশাচকে হত্যা করে সে। তরন্দিদেব তখন নতুন দীক্ষা নিয়েছে। এবং ঘটনাচক্রে একদম কাছ থেকে লড়াইটা দেখার সৌভাগ্য হয় তার। ব্যাপারটা ওর মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল। এরপর অনেককেই রূপ পরিবর্তন করতে দেখেছে – কিন্তু ওই তান্ত্রিকের মত অতটা সাবলীল আর কেউ ছিল না। এই মূহুর্তে সুস্ময় ভট্টাচার্য্যকে দেখতে অনেকটা সেই তান্ত্রিকের মত লাগছে। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো তরন্দিদেব, যদি আক্রমণ আসে প্রতিহত করবে, শুধু মাত্র রূপ পরিবর্তন মারাত্মক হলেও ওর বিপক্ষে লড়ার মত শক্তিশালী বিদ্যা না। কিন্তু সুস্ময়কে যতটুকু বুঝেছে, ওটা তার অনেক কৌশলের একটা হবে মাত্র।
কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিলো সুস্ময় ভট্টাচার্য্য, যদিও মোটেও খুশি মনে হলো না তাকে, "ঠিক আছে, যদিও অন্য যেকোন পরিস্তিতিতে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম!" চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, সম্বোধনও পালটে ফেলেছে, "কিন্তু আগেই বলেছি এখন তোমাদের সবাইকেই দরকার কাজের স্বার্থে। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করছি, মন দিয়ে শোন।" শেষদিকে স্বাভাবিক হয়ে এলো তার কন্ঠস্বর, "আর তুমিও শোন, বায়রান।"

“আমরা যা করতে যাচ্ছি,” লম্বা দম নিয়ে শুরু করল বুড়ো, “প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আরেকবার সেই রিচুয়াল পালনের চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। যদিও খুব অল্পের জন্যে প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয়ে যায়, কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিনের মত পালটে গেছে! সেবার কাজটা যে করেছিলন, ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রয়েছে – আটিলা দ্যা হান! অনেকে যাকে দ্যা স্কার্য অফ গড (The Scourge of God) নামে চেনে...”

###

“তাহলে ওই কথাই রইলো, আপাতত আমরা একসাথে কাজ করব, এখন পরবর্তি কর্মপন্থা কি হতে পারে?” উপসংহার টানার ভঙ্গিতে বললেন রবিউল আলম, বারবার কোন পাত্তা না পেয়ে যথেষ্টই খাপ্পা তিনি, নিজের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন।
“হ্যাঁ” ওপরওয়ালাকে সমর্থন দেবার চেষ্টা করল কায়েস, “ভেবে চিনতে একটা পথ ধরে আগাতে হবে আমাদের, যা বুঝছি – অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। এবং এটা এখন আর শুধু একটা খুনের তদন্ত না বরং আরও অনেক বড় কোন ব্যাপার।”
“ঠিক কত বড় বুঝতে পারলে ভালো হত!” স্বাগতক্তির ঢঙ্গে মন্তব্য করল অরণী, আর সবার মত ওর চেহারাও গম্ভীর।
“আপাতত তাহলে এক নম্বরে যাওয়া যাক,” অবলাল আবার শান্ত হয়ে গেছে, চিরাচরিত নির্লিপ্ত ভাবটা ফিরে এসেছে ওর কন্ঠে, তারপর এই মাদুলিটা দিয়ে ওদের অবস্থান বের করা যায় নাকি সে চেষ্টা করা যাবে।
“দুঃখিত,” বলে উঠল নাজিম, “আমি এর মাঝে নেই, আমি সখের বসে অতিপ্রাকৃত নিয়ে গবেষণা করি। কিন্তু ছোটখাট আত্তা-প্রেতাত্তা বা লোককথার উৎস বের করা বা কোন আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা এক জিনিস আর এইসব যক্ষ বা অপদেবতার সাথে টক্কর লাগানো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এতক্ষণ যে আপনাদের সাথে ছিলাম তাতেই হয়ত ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু বিষয়টার গুরুত্ব আগে বুঝিনি। তাছাড়া ক্যাপ্টেনের কাছে আমি ঋণী, তাঁর উপকারে আসতে পারব ভেবেই এসেছিলাম। কিন্তু এই রকম পরিস্থিতি জানলে ধারে কাছেও ঘেঁষতাম না! ইশ!কোন কুক্ষণেই না সেদিন ভোরে গিয়েছিলাম ওই গাড়ির কাছে! কথায় বলে বিরাল মরে কৌতুহলে! সে অবস্থাই হয়েছে আমার।”
“আমাদেরকে শহরে পৌছে দিয়ে তারপর নাহয় যাবেন,” বলল কায়েস।
“মাফ করবেন, ইন্সপেক্টর। আমি এখনই যাব, দয়া করে আটকাবেন না, আমার প্রাণের মায়া আছে।”
“বুঝলাম!” ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অবলাল, বেচারা মনে হয় স্বপ্নেও ভাবনি এমন গ্যাঁড়াকলে পড়বে। ওর দোষ দেয়া যায় না, সাধারণ একজন অকাল্টিস্ট, তার তো কোন দায় পড়েনি এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ নেবার! “ঠিক আছে যান তাহলে, সাবধানে থাকবেন। কোন সমস্যা হলে ক্যাপ্টেনের সাথে যোগাযোগ করবেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।” বলল সে।

উঠে পড়ল নাজিম, ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।
"আমরা তাহলে শহরে ফিরব কি করে?" জানতে চাইল অরণী।
"সাদিবকে ফোন করে গাড়ি নিয়ে আসতে বলছি।" অবলালের উত্তর।
"তার থেকে বরং আমি থানায় ফোন করে জহিরকে আসতে বলি," বাঁধা দিলো কায়েস, "অসুস্থ রাশেদুনকে একা ফেলে সাদিবের আসাটা ঠিক হবে না।"
"আচ্ছা বল।"
"দাঁড়াও, আমি বলছি!" বললেন রবিউল, মোবাইল বের করতে হাত দিলেন পকেটে। পর মূহুর্তে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে আমার পিস্তলটা গেলো কোথায়?"
আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোন পকেটেই ওটা পেলেন না, "মনে হয় গাড়িতে ফেলে এসেছি ভুলে!" তিক্ত গলায় গজগজ করে উঠলেন তিনি।
ওদিকে দরজার কাছ থেকে তখন নাজিমকে বিদায় দিচ্ছে অ্যান্ড্রিয়াস, সেদিকে তাকালো কায়েস, "আচ্ছা আপনি ফোন করুন, আমি নাজিম সাহেবের সাথে গিয়ে দেখে আসছি গাড়িতে আছে নাকি ওটা।" উঠে পড়ল সেও।
বাইরে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি, তার মাঝ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগলো ওরা দু'জন। নাজিম তাড়াহুড়া করছে, সম্ভবত যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়ার ইচ্ছা তার। কাঁচা রাস্তা ভেঙ্গে গাড়ির কাছে পৌছতে পৌছতে কাঁদাপানিতে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেলো ওরা।
"দেখুন তো ব্যাক সিটে আছে নাকি ওটা, আমি আর উঠতে চাচ্ছি না।" নাজিমকে বলল কায়েস, স্বল্প পরিসরে ভাঙ্গা হাত নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে মোটেও ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।
"ঠিক আছে," বলে গাড়িতে উঠে পড়ল নাজিম, খুট করে জ্বেলে দিলো ভেতরের আলো।
কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে কায়েস। ঘটনা শুরু হবার পর থেকে যতবার এই 'কেমন যেন' অনুভূতিটা হয়েছে, ততবারই বিপদে পড়েছে সে, হয়ত অবলালের কথা অনুযায়ী ও একজন 'সেন্সর' বলেই একটু আগেভাগে বিপদ টের পেয়ে থাকে। সতর্ক দৃস্টিতে এদিক সেদিক তাকালো সে।
"পেয়েছি, ইন্সপেক্টর সাহেব!" নাজিমের গলা শোনা গেলো। গাড়ির পেছন থেকে নেমে এলো সে, তারপর পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরল কায়েসের দিকে।
বাম হাত বাড়িয়ে ওটা ধরল কায়েস, "আচ্ছা, যান তাহলে, সাবধানে থাকবেন..."
হঠাতই বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়ল একদম কাছেই কোথাও। কেঁপে উঠল কায়েস, ওর হাতের ছোঁয়া লাগল নাজিমের হাতে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, সকালে সাদিবের হাত ধরার সময়ও অনেকটা এমন বোধ করেছে সে, কিন্তু দুই এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাদিবের সময় বোধটা যদি ঝিরঝিরে বৃষ্টি ধারা হয়ে থাকে, তাহলে নাজিমের হাতের স্পর্শে যে অনুভূতিটা হলো তা দু'কুল ছাপানো প্লাবন। এবং শুধু তাই নয়, মারাত্মক অশুভ কি যেন একটা আছে এর মাঝে। সাদিবের হাত ধরার অনুভূতিটা এক প্রকার আরমাদায়কই ছিল, কিন্তু এইবেলা ওর সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠল। যেন নরকের গভীর থেকে উঠে আসা কোন পঙ্কিল বস্তু স্পর্শ করেছে!

চমকে পিছিয়ে গেলো কায়েস, নাজিমের অবশ্য ভাবান্তর নেই। এক মূহুর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল কায়েস, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছে, কোন একটা কিন্তু যে আছে তা বেশ বুঝতে পারছে ও, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় একা তার মোকাবেলা করতে যাওয়া বোকামি হবে। হয়ত বা ষষ্ট ইন্দ্রিয়, বা ওর ওই সেন্সর হবার গুণ, কে বলতে পারে? ফিরতি পথে দুই পা এগোতেই একটা সর্বগ্রাসী ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে, অবলাল ওর ঘোর কাটিয়ে দেবার পর চুড়েলটার স্বরূপ দেখেও মনে হয় এতটা ভয় পায়নি, আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদ থেকেই ঝট করে একপাশে লাফ দিলো ও, এবং সেজন্যেই বেঁচে গেলো এযাত্রা! এক মূহুর্ত আগে ও যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাজিম, ঠিক কি সে করেছে বুঝে উঠতে পারছে না কায়েস তবে ওকে মারা চেষ্টা যে নিয়েছিল তা নিশ্চিত। রবিউলের পিস্তলটা ওর হাতেই ছিল, বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে সেফটি ক্যাচ অফ করে ওটা নাজিমের বুকে তাক করল সে।

কেমন যেন অপার্থিব একটা হাসি খেলে গেলো নাজিমের ঠোঁটের কোণে, "নাহ, ভেবেছিলাম ফাঁকতালে একটা সমস্যার জের উপড়ে ফেলব, কিন্তু কপাল খারাপ!" কণ্ঠস্বর বেমালুম বদলে গেছে লোকটার, কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে, যেন গলায় ফুটো আছে এমন শোনাচ্ছে। কায়েসের দিকে এক পা এগলো নাজিম, বা সে যাই হয়ে থাকুক।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না কায়েস, টেনে দিলো ট্রিগার। সার্ভিস আর্মস হিসেবে ওর মতই ব্রাউনিং নাইন মিলিমিটার ব্যবহার করেন রবিউল, অভ্যস্ত হাতে লক্ষস্থির করেছে কায়েস। এত কাছ থেকে কোন আনাড়িরও ফস্কাবে না, আর ওর তো মিস করার প্রশ্নই আসে না। একের পর এক গুলি করে চলল ও, লক্ষভেদও করছে ওগুলো কিন্তু সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ নেই নাজিম রুপী জিনিসটার। এমন ভাবে আগাচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। এমনকি গাজীপুরের সেই বিশাল পিশাচটাও এর চেয়ে বেশি প্রতিকৃয়া দেখিয়েছিল। পরপর চারটা গুলি করার পর নিস্ফল বুঝে ঘুরে ঝেড়ে দৌড় দিল কায়েস।
তিন কি চার পা গিয়েছে মাত্র, হুঁশ করে শব্দ হল বাতাস কেটে কিছু ছোটার, পরক্ষণে ওর সামনে এসে দাঁড়াল নাজিম। রদ্দা মারার ভঙ্গিতে কায়েসের ঘাড় লক্ষ করে হাত চালাল সে। কাদার ভেতর দৌড় থামাতে গিয়ে ভারসম্য হারিয়ে ফেলেছিল কায়েস, নাজিমকে নড়তে দেখে টলমল অবস্থাতেই পেছাতে চেষ্টা করল, এবং পরে গেলো পা পিছলে। প্রাণে বেঁচে গেলো সেকারণেই। নাজিমের বেশে ওটা যাই হয়ে থাকুক, যে গতিতে হাতটা চালিয়েছিল, লাগলে ওর ঘাড় তো ভাঙ্গতই, ধড় থেকে মাথা আলাদাও হয়ে যেতে পারত।
মাটিতে বসা অবস্থাতেই আবার গুলি করল সে, একবার, দু'বার, তিনবার! পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে করা গুলির আঘাতে ছিটকে উঠছে রক্ত মাংস, গাড়ির ভেতর থেকে আসা ম্লান আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কায়েস। কিন্তু কোনই প্রতিকৃয়া নেই ওটার, কায়েসের বুক লক্ষ্য করে একটা পা তুলল সে, নামিয়ে আনতে যাবে এমন সময় ঝলসে উঠল তলোয়ার!

বরাবরের মতই, ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে অবলাল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আক্রমণরত পাটা। ধীরে, অনেকটা দম দেয়া পুতুলের মত করে বামে ঘুরল নাজিমের মাথা, ওই দিক থেকেই আঘাত হেনেছে অবলাল। নাজিম আবার কিছু করার আগেই আবার তলোয়ার চালালো সে।

অবলালের তলোয়ারটা জাপানি জিনিস। সামুরাইরা এগুলো ব্যবহার করত, ছাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখার সুবিধার জন্যে ফলাটা কিছুটা ছোট – এর সঠিক নাম 'চিসা কাতানা'। সাংঘাতিক ধারাল, ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র। এক কোপে নাজিমের মাথাটা নামিয়ে দিলো অবলাল, কিন্তু তা করেই ক্ষান্ত হলো না, সাই সাই করে কুপিয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল হাত দুটো, তারপর এগিয়ে গিয়ে লাথি মেরে ফেলে দিল একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা রক্তাক্ত ধরটাকে।

হাচড়ে পাচড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছে কায়সে, "তুমি ঠিক আছো তো?" ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অবলাল। মাথা ঝাঁকাল কায়েস, বিহব্বল বোধ করছে। বিমুঢ়ের মত একবার নাজিমের দেহের খণ্ড বিখণ্ড অংশগুলির দিকে আরকেবার অবলালের মুখের দিকে তাকালো সে। কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলে অবলাল, চলো আগে ঘরে যাই তার শুনব কি হয়েছিল।

"ঘরে যাবে? কেন, এখানেই তো বেশ ভালো! খেলাটা আগে শেষ করি, তারপর নাহয় যেও! অবশ্য যদি তখনো বেঁচে থাক আর কি!" সেই ঘড়ঘড়ে গলা! একটু আগে যে গলায় কথা বলেছে নাজিম। অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল কায়েস, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া লাশটা যেন টগবগ করে ফুটছে! কিলবিল করছে মাংসপেশিগুলি!

সময় বেশিক্ষণ পার হয়নি, কিন্তু এর মাঝেই কখন যেন থেমে গেছে বৃষ্টি, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে শুক্লপক্ষের চাঁদ। গাড়ির ভেতর থেকে আসা আবছা রস্মি আর চাঁদের হলদেটে আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে চরাচর। কিন্তু কায়েসের মনে হলো না গেলেই ভালো ছিল! টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অংশগুলো প্রতিটি যেন আলাদা আলাদা ভাবে জীবন্ত! অস্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে এসে একটার সাথে আরেকটা জোড়া লেগে গেলো ওগুলো। তারপর শুরু করল বদলাতে। আকারে বাড়ল না বটে কিন্তু আকৃতি পালটে গেলো অনেকটাই। বীভৎস, কুৎসিত একটা রূপ দেখা দিলো। নগ্ন, মানুষের মতই আকৃতি, দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালচে, পিচ্ছিল ওটার চামড়া। মুখটা বাদুরের মত; তীক্ষ্ণ, সূচালো কান। হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা এবং চোখা নখযুক্ত। দেহটা হাড় জিরজিরে। পিঠের কাছে রয়েছে বাদুরের মতই এক জোরা চামড়ার পাখা। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর ওটার চোখ দুটো, হলুদ, জ্বলজ্বলে চোখে রাজ্যের কুটিলতা। যেন জানান দিচ্ছেঃ জগৎ সংসারের হেন কুকর্ম ওই চোখের মালিকের করতে একবিন্দু বাধবে না! সমস্ত অবায়বটার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যে আকারে ছোট হলেও ওটাকে একটা দানব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না কায়েস।

“চোখের দিকে তাকিও না!” অবলালের কণ্ঠে সতর্কতার ছোঁয়া।
“তুমি চালাক আছো, সাদা হাতের অবলাল!” খনখনে গলায় বলে উঠল পৈশাচিক মূর্তিটা, আবার বদলে গেছে ওটার কণ্ঠ, এখন শোনাচ্ছে অনেকটা বুড়ো মানুষের মত। “কিন্তু লাভ নেই, তোমাদের দিন ফুরিয়েছে!”
এতই দ্রুত নড়ে উঠল ওটা যে কোথা দিয়ে কি হলো বুঝতেই পারল না কায়েস। একটা ধাতব শব্দ, তারপর দেখল ছিটকে, প্রায় উড়ে গিয়ে কাদায় আছড়ে পড়েছে অবলাল। এই প্রথম ওকে কোন আঘাত হজম করতে দেখল কায়েস। জানে লাভ নেই, তবু অভ্যেস বসে পিস্তল তুলল ও। দেখতে পেলো ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে অবলাল, ওর হাতের তলোয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। অবশ্য সেটা কি নাজিমের আগের দেহের রক্ত নাকি এই নতুন মূর্তিমান বিভীষিকার তা বুঝতে পারল না।
ওদের থেকে খানিকটা দূরে এখন কুজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা; জান্তব স্বরে গড়গড় করছে, কায়েস দেখতে পেলো একটা থাবা থেকে ঝরে পড়ছে কালচে তরল। তাহলে অবলাল আঘাত করতে পেরেছে!
আবার নড়ে উঠল ওটা, ঝাপসা ভাবে দেখতে পেলে কায়েস, মরিয়া হয়ে তলোয়ার চালাচ্ছে অবলাল, ডানে বামে সরে ওটার তীক্ষ্ণ নখর যুক্ত থাবা এড়িয়ে যাচ্ছে। অমানুষিক গতিতে প্রতিহত করছে আঘাত গুলো, কিন্তু যত ক্ষীপ্রই হোক অবলাল, দানবটার গতি আরও বেশি। তারওপর আছে ওই ভয়ঙ্কর পাখা দুটো। ওগুলো যে ধারাল তা আগে বুঝতে পারেনি কায়েস কিন্তু বেশ কয়েকবার অবলালের তলোয়ারের কোপ প্রতিহত করল পৈশাচিক মূর্তিটা ওগুলোর সাহ্যায্যে।
এতটা অসহায় জীবনে কখনো বোধ করেনি কায়েস। গুলি করার অবস্থা নেই, যেভাবে লড়ছে ওরা, গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে অবলালের গায়ে লাগতে পারে। আক্ষেপে চুল ছেড়া ছাড়া আর কিছুই যেন করার নেই ওর।
পেটে প্রচন্ড এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল অবলাল, নখের আঁচরে ওর বুকের কাছে কেটে গেছে ঝরছে রক্ত। প্রচন্ড বেগে ওর ভূপতিত দেহের দিকে ধেয়ে গেলো দানবটা।
সামান্য ফাঁক পাওয়া গেছে – গুলি করল কায়েস। এবং প্রায় একই সময় কানে এলো আরেকটা পিস্তলের আওয়াজ, শব্দটা অনেক বেশি জোরাল।
কোন গুলিটা লেগেছে, নাকি দুটাই লক্ষ্য ভেদ করেছে, বুঝে উঠতে পারল না কায়েস। তবে দেখতে পেলো যে থেমে দাঁড়িয়েছে দানবটা। ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকলো এবার, চোখ দুটো এখন আর হলুদ নেই, লাল হয়ে গেছে। ধক ধক করে জ্বলছে – দু’টুকরো রুবি যেন!
“আগেই সন্দেহ হয়েছিল, নাজিমকে কখনোই অত ভীতু মনে হয়নি আমার। কিন্তু কোনভাবেই কোন উপস্থিতি টের না পেয়ে ভেবেছিলাম ওর ব্যাপারে আমার ধারনা ভুল ছিল।” এগিয়ে এসে কায়েসের পাশে দাঁড়াল অ্যান্ড্রিয়াস। “তা রাজবীর, এভাবে মার খেয়ে যাচ্ছো কি মনে করে?”
উঠে দাঁড়াল অবলাল, মুখ থমথম করছে, অ্যান্ড্রিয়াসের কথার উত্তর দিলো না সে। কিন্তু দানবটা দিলো, “মনে হয় তোমারই আগে মরার সখ জেগেছে?”

“মরব?” হা হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল আন্দ্রিয়াস, “আমি মরব? তাও কিনা তোমার মত একটা বৈতালের হাতে!”
চোখ সরু হয়ে গেলো দানবটার, “নাম জান দেখছি! তবে তাতে লাভ হবে না!”
“রাজবীর, তুমি নাক গলিও না!” বৈতালটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল অ্যান্দ্রিয়াস, “এই উপদ্রবকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে দিতে হবে দেখছি! ইন্সপেক্টর এটা রাখো তোমার কাছে – দেখ যেন ময়লা না লাগে! সতের হাজার ডলার দিয়ে কিনেছি!” বলতে বলতে হাতের মিনি কামানটা কায়েসের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।
ওইদিকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে বৈতালটার, পৈশাচিক এক গর্জন ছেড়ে ওদের দিকে ধেয়ে এলো ওটা। পিস্তলটা নিয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় কায়েস। তাকালো অবলালের দিকে। নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও, বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হচ্ছে না। আন্দ্রিয়াসের দিকে নজর ফেরাল। ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে বৈতালটা।
সরে যাবার বা প্রতিহত করার বিন্দু মাত্র চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন অ্যান্দ্রিয়াস। বরং বিশাল দুই হাত মেলে জড়িয়ে ধরল প্রতিপক্ষকে, স্পষ্ট দেখতে পেলো কায়েসে, ওর শরীরে ঢুকে যাচ্ছে বৈতালের তীক্ষ্ণধার নখগুলো। কিন্তু আক্রমণের প্রচন্ডতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে কাজটা সে করল, দেখে এত কিছুর পরও শিউড়ে উঠল কায়েসের সর্বাঙ্গ।

বৈতালটাকে জাপটে ধরেছে অ্যান্দ্রিয়াস। ছাড়া পাবার লক্ষ্যে ছটফট করছে ওটা। একটু আগে অবলালের সাথে ওটাকে লড়তে দেখেছে কায়েস, জানে দানবটার গায়ে অমানুষিক শক্তি কিন্তু ক্যাপ্টেনের আলিঙ্গনকে এক চুল শিথিল হলো না।
তারপর কায়েসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নকে পানসে প্রমাণ করে ওটার ঘাড় কামড়ে ধরল আন্দ্রিয়াস! পিচ্ছিল চামড়া কেটে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো কালচে রক্ত। চড়া স্বরে আর্তনাদ করে উঠল ওটা। কিন্তু অ্যান্দ্রিয়াসের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হাত দিয়ে ওটার মাথার পেছেনে ধরল সে, তার পর পুতুলের মাথা ছেড়ার মত অবলীলাক্রমে ধর থেকে আলাদা করে ফেলল মুন্ডটা! ঝটকা মেরে দিখন্ডিত লাশটাকে ছুঁড়ে ফেলল দূরে, অবলালের পায়ের কাছে। “নেও, বিশ্বাস হয়েছে?”

###

মিনিট দশেক পর, টিনের ঘরটাতে ফিরে এসেছে ওরা, অবলালের বুকের ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখছে কায়েস, তেমন মারাত্মক না। পকেটের মিনি ফার্স্ট এডিড কিট থেকে অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো সে। তারপর জানতে চাইলো, “কি ছিলো ওটা?”
“বৈতাল,” উত্তরটা দিলো ক্যাপ্টেন আন্দ্রিয়াস।
“তাতো আগেই শুনেছি, কিন্তু এই বৈতাল জিনিসটা কি?” কায়েস লক্ষ্য করল, অ্যান্দ্রিয়াসের শরীরে এখন কোন ক্ষত চোখে পড়ছে না।

“ভারতীয় ভ্যাম্পায়ার,” বলল অরণী, “মৃতদেহের অধিকার নিতে পারে ওরা। খুবই হিংস্র, আর চালাক। নানা রকম যাদুকরি শক্তির অধিকারী। থ্রেট লেভেল কমপক্ষে লাল!”
“এবার তুমি বলো ওটার কাছে মার খাচ্ছিলে কেন?” অবলালকে ছেড়ে দিতে নারাজ কায়েস।
“কারণ ও দেখতে চাইছিল প্রয়োজনে আমি এগিয়ে আসি নাকি।” এবারও অ্যান্ড্রিয়াসই দিলো প্রশ্নটার জবাব। “নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল আমি প্রতিস্রুতি রক্ষা করব কিনা, তাই না, রাজবীর?”
“হ্যাঁ, বিশেষ করে নাজিম যখন একটা বৈতাল প্রমাণিত হলো, তখন একটু সতর্ক হবার দরকার ছিল বৈকি।” অবলাল গম্ভীর, “নাজিমকে কখন মেরেছে বলে মনে কর?”
“আমি ধারনা করছি আজকে দিনের কোন সময়ে, কিন্তু নিশ্চিত হবার উপার নেই। এমনও হতে পারে আগেই মেরে রেখেছিল, ও মাদুলিটা পাবার পরপরই বা তারও আগে। কারো দেহ অধিকার করলে তার স্মৃতিও ব্যবহার করতে পারে বৈতালরা, তাই ঠিক কখন যে মেরেছে বলতে পারব না।”
“আর আপনার ব্যাপারটা কি?” ওকে থামিয়ে দিলো কায়েস, “দেখলাম আপনার গায়ে নখ বিধিয়ে দিচ্ছে ওটা, মারাত্মক জখম হবার কথা, কিন্তু এখন তো দেখছি কিছুই হয়নি!”
“হয়েছিল,” কাঁধ ঝাঁকাল অ্যান্ড্রীয়াস, “সেরে গেছে।”
“মানে?”
“মানে ক্ষত শুকিয়ে গেছে! এত অবাক হচ্ছেন কেন? আমি তো আর আপনাদের মত সাধারণ মানুষ নই!”
“ওর বাবা একজন রয়্যাল ভাম্পায়ার।” বলল অবলাল, “তার ক্ষমতার কিছুটা পেয়েছে ক্যাপ্টেন।”
“খুবই সামান্য কিছু!” বিনয়ের সাথে মাথা নোয়াল অ্যান্ড্রিয়াস।
“ব্যস যথেষ্ট হয়েছে!” হঠাৎ চেচিয়ে উঠলেন রবিউল, “আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে! দেখুন, এইভাবে অন্ধকারে রাখবেন না দয়া করে। আপনারা কে কি সব খুলে বলুন! শত্রুদের ব্যাপারে কিছুই জানি না। অন্তত মিত্রদেরকে তো ভালো মত চেনা থাকা দরকার!”
“আমার কথা তো বললামই,” অ্যান্ড্রিয়াসের গলায় কৌতুক, আসল রহস্য মানব তো আপনাদের পূর্ব পরিচিত। লম্বা একটা তর্জনি অবলালের দিকে তাক করল সে, “তবে ও নিজে না বললে আমি মুখ খুলছি না।”
“দেখো অবলাল,” বেশ জোরের সাথে বলল কায়েস, “অনেক ধানাই পানাই করেছ, এইবার ঝেড়ে কাস! কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? আর কেনই বা এই রহস্যের বেড়াজাল তুলে রাখো নিজের চারপাশে? এসব না জেনে তোমাকে বিশ্বাস করে জীবনের ঝুঁকি কেন নেব আমরা?” অবশ্য আমরা না থাকলেও ওর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না! ভাবল সে।
দীর্ঘ একটা মূহুর্ত চুপ করে রইল অবলাল, চেয়ে আছে অরণীর দিকে, “কখনো ভাবিনি এই কথা গুলো বলব আমি,” অবশেষে নিরবতা ভাঙ্গল সে, “তবে এখন মনে হচ্ছে গোপন করাটা খুব বেশি জরুরী ছিল না।”

“মনে হচ্ছে,” পাইপ জ্বালিয়ে খেই ধরল সে, “যে বারো বছর আগেই কথাগুলো তোমাকে বলা উচিৎ ছিল আমার, অরণী।”

জিজ্ঞেসু দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকালো অরণী, কিন্তু কিছু বলল না।

“আসলে এমন অনেক সময় আসে মানুষের জীবনে, যখন অহমিকা বোধটা অন্যসব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এমনকি ভালবাসা বা জীবনের চেয়েও! আমার আসল পরিচয়, বা বলা ভালো সম্পূর্ণ পরিচয় আমি নিজেও জানি না!” নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ও, দেখল নাক কুঁচকে ফেলেছে অরণী, মুচকি হাসল, “তবে যতটুকুও জানি তাও কাউকে বলি না।”

“এমন না যে নিষেধ আছে, বা বললে বিরাট কোন ক্ষতি হয়ে যাবে, কিন্তু আমার মনে হয় আসল পরিচয় দিলে, আমি বারতি কিছু অনৈতিক সুবিধা পাব। যা নিতে মন ঠিক সায় দেয় না, সেই অহমিকা বোধ। তবে হ্যাঁ, গত বারোটা বছর ধরে এমন কোন দিন যায়নি যেদিন আমি তোমাকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার কথা ভাবিনি।

কিন্তু হয়ে ওঠেনি, আর যেহেতু তোমার কাছে গোপন করে গিয়েছিলাম – তাই অন্য কাউকেও বলিনি।” অরণীকে ছেড়ে এবার কায়েসের দিকে ফিরল সে, “লম্বা গল্প, ধৈর্য আছে তো?”

“আলবত! প্রয়োজনে সারারাত বসে থাকতে রাজি আছি!” কায়েস অবিচল।

“ইয়ে মানে একটু খাবার হলে ভালো হতো অবশ্য!” লাজুক গলায় বললেন রবিউল।

“ওই টিনগুলোতে কিছু ড্রাই ফুড আছে,” ইশারায় দেয়ালে লাগানো তাকে রাখা কয়েকটা টিন দেখাল অবলাল, “ক্যাপ্টেন, তুমি তো সব জানোই, ওইদিকটা দেখবে একটু?”

“ঠিক আছে।” উঠে গেলো অ্যান্ড্রিয়াস, কেরোসিন কুকারটা ধরিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল টিনগুলো নিয়ে।

“যা বলছিলাম,” আবার শুরু করল অবলাল, “ঠিক কোথাথেকে শুরু করব আসলে বুঝতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় গোড়া থেকে বলাই ভালো। আমার নাম রাজবীর চৌধুরী রুদ্র! অবলাল শব্দটা আসলে একটা টাইটেল। কি করে এটা পেলাম সেইখান থেকেই কাহিনী শুরু... আসা করি ভারতবর্সের ইতিহাস কম বেশি জানা আছে সবার...?”